
মাসুদ রানা
বুশ পাইলট
কাজী আনোয়ার হোসেন

বুশ পাইলট

প্রথম প্রকাশ: ২০০৮

এক

সামনে ডাঙা দেখা যেতে সাগরের তিন হাজার ফুট উপরে প্লেন নামিয়ে আনল রানা। চাঁদের উজ্জ্বল সাদা আলোয় গ্রীনল্যাণ্ড আইস-ক্যাপ মুক্তোর মালার মত জ্বলছে।

কেপ ডেজোলেশনের পুবদিকে জুলিয়ান বাইট ধোঁয়াটে কুয়াশায় ঢাকা পড়ে ঘোষণা করছে বাতাসের জোর একেবারেই নেই, বড়জোর পাঁচ নট। ভালই হলো ওর জন্য। আর কিছু না হোক, অন্তত একটা সুবিধে হবে, ফিয়র্ডের মাথার কাছে উপত্যকায় নামার সুযোগ পাবে।

ভাঙা উইণ্ডস্ক্রিন দিয়ে হিমশীতল বাতাস চুইয়ে ঢুকে কেবিনটাকেও ঠাণ্ডা করে ফেলেছে। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের অসংখ্য আলো দৃষ্টিকে কেমন বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে আলোগুলো সব মিলেমিশে একাকার, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

দূরে, কুয়াশার ওপাশে জ্যোৎস্নায় ঝলমল করে উঠল রূপালী-সাদা ফিয়র্ড। তার ওপাশে আইস-ক্যাপের প্রতিটি আদল তীক্ষ্ণ করে তুলেছে চাঁদের আলো।

সময় হয়েছে। গতি কমাল রানা। প্লেনের নিয়ন্ত্রণ অটোপাইলটে ছেড়ে দিয়ে সেফটি বেল্ট খুলল। পরিচিত দৃশ্যটা লাফ দিয়ে উঠে এল আবার চোখের সামনে। অসীম শূন্যের দিকে স্থির নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা দেহটা কো-পাইলটের সিটে অলস ভঙ্গিতে পড়ে আছে। ইন্সট্রুমেন্টস প্যানেলের আলোর কারসাজিতে মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যাচ্ছে মুণ্ডুটা।

কেবিনের অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেল রানা। হোঁচট খেতে খেতে এসে এক হাঁটুতে ভর দিয়ে বসল অন্য দেহটার পাশে। হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখল বরফ-কঠিন ঠাণ্ডা মুখটা। নাহ্, মরে গেছে, কোনও সন্দেহ নেই। উঠে দাঁড়িয়ে এগোল আবার অন্ধকারের দিকে। হাতড়ে খুঁজে বের করল এগ্‌জিট্ হ্যাচের কুইক রিলিজ হ্যাণ্ডেলটা।

র‍্যাতের আকাশে উড়ে চলেছে প্লেন। নির্দ্বিধায় শূন্যে ঝাঁপ দিল ও। তীব্র ঠাণ্ডা যেন গিলে নিল ওকে। ডিগবাজি খেয়ে পড়তে পড়তে মাথার উপ্পর দিয়ে পুবদিকে উড়ে যেতে দেখল প্লেনটাকে, চাঁদের আলোয় ভূতুড়ে লাগছে ওটাকে।

প্যারাশুট খোলার রিঙের দিকে হাত বাড়াল ও। জায়গামত পেল না জিনিসটা। চমকে উঠল। নেই নাকি! সর্বনাশ!

ঘুম ভেঙে গেল। দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত চিত হয়ে ছাতের দিকে তাকিয়ে রইল রানা। তারপর একটানে গায়ের উপর থেকে চাদরটা সরালো।

মাথা ধরেছে। বিছানা থেকে নামতে গিয়ে টের পেল আড়ষ্ট লাগছে শরীরটা। জানালার কাছে এসে দাঁড়াল ও। হাত দিয়ে ডলে কাঁচে লেগে থাকা বাষ্পকণা

সরাতেই সকালটা যেন উজ্জ্বল হেসে অভিনন্দন জানাল ওকে। মন জুড়ে থাকা দুঃস্বপ্নের রেশ মুহূর্তে কেটে গেল সে-হাসিতে।

ফ্রেডেরিকসবর্গে রয়েছে এখন ও। রাজধানী ন্যুক ওখান থেকে বেশি দূরে না। উত্তর-পশ্চিম উপকূলে, আর্কটিক সার্কেলের প্রায় দুশো গজ নীচে এই জায়গাটা। জনসংখ্যা খুবই কম—বড়জোর পনেরোশো, তা-ও বাইরে থেকে আসা তিন-চারশো মানুষকে নিয়ে। বাইরে থেকে যারা এসেছে, তাদের মধ্যে তিনশো জন আছে নির্মাণ শ্রমিক, ডেনমার্ক সরকার সাময়িকভাবে নিয়োগ দিয়েছে ওদের, শুধু গ্রীষ্মকালে কাজ করার জন্য।

গ্রীনল্যাণ্ড উপকূলের আর দশটা পুরানো শহরের মতই অনুন্নত শহর ফ্রেডেরিকসবর্গ। এখানকার মানুষের আয়ের প্রধান উৎস সমুদ্রে মাছ ধরা। কিছু কিছু ভেড়ার খামারও আছে। মেইন রোডটা এখনও আস্তরবিহীন। ঘরবাড়িগুলো বেশির ভাগই কাঠ দিয়ে তৈরি; লাল, হলুদ, আর সবুজ রঙ করা; টেলিফোন লাইন ও বিদ্যুতের তার জড়াজড়ি করে রয়েছে অসংখ্য থামের গায়ে।

বন্দরটা রয়েছে শহরের কেন্দ্রবিন্দু থেকে আধ মাইল দূরে, পাথরে তৈরি মেইন রোডের শেষ মাথায়, নতুন গড়ে ওঠা একটা ক্যানিং ফ্যাক্টরির ধারে। তাতে নোঙর করা আধ ডজন ফিশিং বোট আর উপকূলে টহল দেয়ার জন্য ঈস্ট ক্যানাডা এয়ারওয়েজের একটা ক্যাটালিনা ফ্লাইং বোট। ক্যানিং ফ্যাক্টরি থেকে দুশো গজ দূরে কাঁটাতারে ঘেরা একটা ছয়তলা পাকা বাড়ি, তৈরি হয়েছে বছর কয়েক হলো, গেটে কড়া প্রহরা। ওখানে পাহারার বহর দেখলে মনে হয়, পারমাণবিক বোমা বানানোর কারখানা বুঝি। আসলে অত্যাধুনিক একটা গবেষণাগার ওটা। আর্কটিক অঞ্চলের সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করা হয়। ওটার ডিরেক্টর একজন আমেরিকান, আর অ্যাসিসট্যান্ট ডিরেক্টর বাংলাদেশী বিজ্ঞানী, ডক্টর সৈয়দ আবেদুর রহমান। মেরিন সায়েন্টিস্ট হিসেবে খুব নাম করেছেন।

এই অঞ্চলের সামুদ্রিক উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এক অত্যাশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করেছেন তিনি। অনেকটা তাঁর উত্তরসূরি প্রফেসর আদনান মনসুরের মতই যুগান্তকারী আবিষ্কার। দুজন দুই পথে এগিয়ে প্রায় একই জায়গায় পৌঁছেছেন। জলরাক্ষস বা কিলার ওয়েইলের আক্রমণে নিহত হওয়ার আগে প্রফেসর মনসুর রানাকে দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর গবেষণার ফসল। কিন্তু বাংলাদেশে এনে দেখা গেল ওটা এমনই এক সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা যে তিনি ছাড়া আর কারও পক্ষে তার অর্থোদ্ধার করা সম্ভব নয়। অনেক চেষ্টার পর তাঁর বিদুষী কন্যা মনিকাও হার মেনেছেন।

সৈয়দ আবেদুর রহমানও মেরু অঞ্চলের শৈবাল নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন, যার প্রয়োগে কেবল ধান, গম বা ভুট্টা নয়, যে-কোনও ধরনের ফল-মূল ও তরি-তরকারির ফলন হবে চার থেকে ছয়গুণ। পৃথিবীতে খাদ্যাভাব বলে কিছুই থাকবে না।

ড. আবেদ আমেরিকান গবেষণাগারে যে-কাজ করছেন, তার সঙ্গে এই আবিষ্কারের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু তাঁর বস, ওই রিসার্চ সেন্টারের চিফ, কী করে যেন আন্দাজ করে ফেলেছেন এই আবিষ্কারের কথা। বাকি কাজ শেষ করে

ফর্মুলাটা তাঁর হাতে তুলে দেবার জন্য চাপ দিচ্ছেন। ড. আবেদ জানেন, বসের হাতে ওটা পড়ার অর্থ চিরকালের জন্য আমেরিকানদের হাতে চলে যাওয়া। এই ফর্মুলাকে নিজেদের দেশে কাজে লাগিয়ে খাদ্যের উৎপাদন কয়েক গুণ বাড়িয়ে নিয়ে গোটা বিশ্বকে চাপের মধ্যে রাখতে পারবে আমেরিকা, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে। চাল-গম দেয়ার নাম করে তাদের উপর ছড়ি ঘোরাতে পারবে।

গোপনে নিজের আবিষ্কারের খবর বাংলাদেশের খাদ্য মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছেন সৈয়দ আবেদুর রহমান। গবেষণার কপি বাংলাদেশকে দিতে চেয়েছেন। ব্যাপারটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এদেশের সরকার। কয়েক ধাপে ফর্মুলাটা দেশে নিয়ে আসার ভার পড়েছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের উপর। চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান দায়িত্বটা চাপিয়েছেন রানার উপর। তাই গ্রীষ্মকালে দেড়-দুই মাস ফ্রেডেরিকসবর্গে থাকতে হচ্ছে রানাকে। গত দুই বছর এসেছিল। এবারও এসেছে। বুশ পাইলট সেজে এয়ারট্যাক্সি চালানোর ছুতোয় এখানে থাকে, ড. আবেদের নিরাপত্তার দিকে নজর রাখে। সুযোগমত মিনি-সিডিতে করে ফর্মুলার একেকটা অংশ গোপনে রানার হাতে দেন তিনি। লণ্ডনের রানা এজেন্সির মাধ্যমে রানা সেটা দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

ফ্রেডেরিকসবর্গে প্লেন আছে মোট দুটো। একটা রানার অটার অ্যামফিবিয়ান। পার্ক করা আছে কংক্রিটে তৈরি স্লিপওয়েের মাথায়। অন্যটা স্কি লাগানো একটা এয়ারমাখি।

সকাল প্রায় দশটা বাজে। রাতে দেরি করে শোয়ায় ঘুম ভাঙতেই দেরি হয়ে গেছে। বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার ছেড়ে দিল রানা।

কিছুক্ষণ পর ঘরের দরজায় জোরে জোরে থাবা পড়ল।

কোমরে একটা তোয়ালে জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেডরুমে বেরিয়ে এল ও।

দরজা খুলে উঁকি দিল ডিটা জুনো। মেয়েটা এস্কিমো হলেও ডেনিশ ভাষায় জিজ্ঞেস করল, 'কফি, মিস্টার রানা?'

মেয়েটার বয়েস পঁচিশ, গ্রীনল্যাণ্ডেই জন্ম ও বেড়ে ওঠা, বিনুনি করা সুন্দর চুল, ঠেলে বেরোনো চোয়াল—এস্কিমোদের যেমন থাকে, আর এস্কিমোদের মতই পটলচেরা চোখ। বছরের বেশির ভাগ সময় দাদা ডট জুনো সিনিয়রের ভেড়ার খামারে ঘর সামলানোর কাজ করে। উপকূল ধরে প্রায় একশো মাইল গেলে স্যাণ্ডভিগ ভিলেজ, ওখানেই ওর দাদার খামার। গরমকালে একঘেয়েমি কাটাতে শহরে চলে আসে ও, হোটেলে চেম্বারমেইডের কাজ করে।

'না, আজ চা-ই দাও, ডিটা,' রানা বলল। 'কফি খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'হুঁ, চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, শরীর খারাপ,' তিরস্কারের সুরে বলল ডিটা। 'এত খাটেন কেন? অ্যাঁ? শরীরকে মাঝে-মধ্যে বিশ্রাম দেয়া জরুরি।'

হাসল রানা। 'পুরোদস্তুর গিন্নি। দাদাকেও সারাক্ষণ ধমকাও নাকি?'

'ধমক না খেলে পুরুষমানুষ ঠিক থাকে?' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল ডিটা। 'কিন্তু আপনার চেহারাটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে। আয়নায় দেখুন।' ওর বড় ভাই ডট জুনোর বন্ধু এই মানুষটাকে ভীষণ পছন্দ করে ও। আর সে-জন্যেই একেবারে

বোনের মত খবরদারি করে।

রানা আর কিছু বলার আগেই একটা প্লেনের শব্দ সকালের নীরবতা ভেঙে দিল। জানালা দিয়ে পলকের জন্য দেখা গেল এয়ারমাখি প্লেনটাকে। ক্যানিং ফ্যাক্টরির ওপাশে ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপে নামতে যাচ্ছে।

'ওই যে, তোমার বয়ফ্রেণ্ড এলো।'

'ডেভ?' ডিটার গালে রঙ লাগল। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

রানাও এগিয়ে এসেছে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্লেনটার দিকে তাকিয়ে আছে দুজনে। এয়ারমাখির নীচে লাগানো স্কি-র তলা দিয়ে চাকাগুলো বেরিয়ে আসছে।

'আমি ভেবেছিলাম,' রানা বলল, 'গরমকাল এসে গেছে, স্কি খুলে নিয়ে আবার ফ্লোট লাগাবে ডেভ।'

শ্রাগ করল ডিটা। 'ও, আপনি জানেন না? আমেরিকান মাইনিং কোম্পানির সঙ্গে ওর চুক্তির মেয়াদ বেড়েছে।'

'তাই নাকি? ভাল।'

রানা জানে, ম্যালামাস্ক-এ সোনা-রূপার খনি খুঁজে বেড়াচ্ছে আমেরিকান একটা কোম্পানি। আইস-ক্যাপের কিনারের স্নোফিল্ড ছাড়া ল্যাণ্ড করার আর জায়গা নেই। আর সমতল বরফে ল্যাণ্ড করতে হলে স্কি দরকার।

ভালভাবেই ল্যাণ্ড করল এয়ারমাখি। দক্ষ পাইলট ডেভ। এয়ারস্ট্রিপ ধরে ছুটে গেল।

গর্বিত হাসিতে উজ্জ্বল হলো ডিটার মুখ। রানাকে বলল, 'আপনি শাওয়ার শেষ করুন, আমি আপনার চা নিয়ে আসি। তারপর নাস্তা দিতে বলব। বিছানাটা পরে সাট করব।' ঘরের দরজা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল ও।

আবার বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের নীচে দাঁড়াল রানা। আরামদায়ক উষ্ণ পানি ওর উত্তেজিত স্নায়ুকে শিথিল করে আনছে, মাথাব্যথাও কমে যাচ্ছে। ভালই হলো। একটু পর আড়াই ঘণ্টার একটা ফ্লাইট আছে।

সিল্কের পুরনো ড্রেসিং গাউনটা পরে বেডরুমে ফিরে এল ও। তোয়ালে দিয়ে জোরে জোরে ঘষে চুল মুছছে।

ও বাথরুমে থাকতেই ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম রেখে গেছে ডিটা।

কাপে ফুটন্ত পানি ঢালল রানা। এক কাপ শেষ করে আরেক কাপ ঢালছে, এ সময় হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল ডেভিড গোল্ডবার্গ ওরফে ডেভ।

উচ্চতা প্রায় রানার সমান, একআধ ইঞ্চি এদিক ওদিক হতে পারে। চুলের রঙ ফ্যাকাসে সাদা, তা-ই বলে বুড়ো হয়নি, রংই এমন। কপালে বলিরেখা নেই, একেবারে শিশুর মত সমান। ডেভের মত মেয়েপাগল পুরুষ কমই দেখেছে রানা। এত দ্রুত প্রেমে পড়ে, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বেরিয়ে আসে—পারে কী করে, ভেবে অবাক হয় ও।

ফার-লাইন্‌ড্ বুট আর পুরনো ফ্লাইং জ্যাকেট পরা দেহটাকে নাটকীয় ভঙ্গিতে ঝুঁকিয়ে হাতের ক্যানভাসের হোল্ড'অলটাকে এক কোণে ছুঁড়ে দিয়ে টেবিলের দিকে এগোল ডেভ।

'আমি তো ভয়ই পাচ্ছিলাম তোমাকে ধরতে পারব কি না ভেবে। মনে

করেছিলাম এতক্ষণে বেরিয়ে গেছ,' রানাকে বলল ও। 'সন্ড্রে স্টর্মফোর্ড থেকে এখানে আসার সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করেছি আমি আজ তোমার জন্যে।'

'আমার জন্যে?'

রানার কাপে চা ঢালা আছে, সেটাই তুলে নিয়ে চুমুক দিল ও। 'আজ তো তোমার সাপ্লাই নিয়ে যাবার দিন, ওই আমেরিকান অভিনেতাটার কাছে, তাই না?'

আমেরিকান অভিনেতা, মানে, গ্লেন রিভোল্টার। জুনের গোড়ার দিকে হঠাৎ করেই নিজের মোটর ইয়ট নিয়ে হাজির হয়েছেন গ্রীনল্যাণ্ডে। উদ্দেশ্য, মাছ ধরা আর শিকার করা। ইয়টটার নাম 'আইসবার্গ'। রানা নিয়মিত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, খাবার, ইত্যাদি পৌঁছে দিয়ে আসে ইয়টে।

ডেভের প্রশ্নের জবাবে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ, যাব। কেন?'

'তোমার সঙ্গে আরও একজন যেতে চায়। কোপেনহেগেন থেকে এসেছে সুন্দরী, রাত দুপুরে নেমেছে সন্ড্রে এয়ারপোর্টে। সোজা গ্লেনের কাছে নিয়ে যেতে বলছিল আমাকে। রাজি হইনি। দুপুরের মধ্যে ম্যালামাস্কে যেতে হবে আমাকে, কিছু স্পেয়ার পার্টস নিয়ে, জরুরি ভিত্তিতে আমেরিকা থেকে আনানো হয়েছে ওগুলো। তা, গ্লেন এখন কোথায়?'

'শেষ খবর পেয়েছি ডিস্কোর উত্তরে নারকুয়াসিটের কোনখানে আছেন, শ্বেত ভালুকের খোঁজ করছেন।'

বিস্ময় ফুটল ডেভের চেহারায়। 'বছরের এই সময়ে ভালুক! রসিকতা করছ না তো?'

'না। ভাগ্য ভাল হলে পেয়েও যেতে পারেন একআধটা। শুনেছি, আগস্ট মাসেও মাঝে মাঝে ভালুক আসে ওদিকে।'

'তা ঠিক, মাঝেসাঝে আসে, তবে সব বছর না।'

'কী নাম তোমার সুন্দরীর?' মেয়েটার প্রসঙ্গে ফিরে এল রানা।

'আমার সুন্দরী নয়, গ্লেনের। রুথ। রুথ ম্যাককেইন।'

ভুরু উঁচু করল রানা। 'ইজরায়েলি?'

'চেহারা-সুরতে তো ইংরেজ মনে হলো।' হাসল ডেভ। 'তবে তাতে কী যায় আসে বলো? জাত আর ভাষা যা-ই হোক, মেয়েমানুষ সব দেশেরই এক। তাই না?'

'দেখতে নিশ্চয় ভাল?'

মাথা ঝাঁকাল ডেভ।

ভুরু নাচাল রানা। 'কোথায় ও?'

'নীচে নাস্তা খাচ্ছে।'

দরজা খুলে ঘরে ঢুকল ডিটা। ও আসবে, জানত রানা। এখানে ঢোকার কৈফিয়ত হিসেবে ডিটা হাতে করে নিয়ে এসেছে একটা পরিষ্কার বিছানার চাদর।

পাক খেয়ে ঘুরে গিয়ে ওর দিকে এগোল ডেভ। 'ডিটা, সুইটহার্ট।'

পাশ কেটে সরে গেল ডিটা। চাদরটা ফেলল বিছানায়। 'আহ্, বিরক্ত কোরো না তো।'

ফ্লাইং জ্যাকেটের এক পাশের পকেটের জিপার খুলল ডেভ। 'দেখো, তোমার জন্যে কী নিয়ে এসেছি।' একতাড়া নোট বের করল ও। 'টাকা পেয়েছি, এইঞ্জেল।

পুরো দু'হাজার ডলার। ওই আমেরিকানগুলো না থাকলে কী যে করতাম!'

মুখ বাঁকাল ডিটা। 'ফ্রেডেরিকসকোস্ট রেস্টুরেন্টে জুয়ো খেলে কত উড়িয়েছ?'

তাড়া থেকে দুটো একশো ডলারের নোট বের করে নিয়ে বাকি টাকাগুলো বাড়িয়ে দিল ডেভ। 'নাও, রাখো, তোমার কাছে রেখে দাও।'

'লাভ কী? কালই তো আবার চাইবে।'

হাসল ডেভ। 'তা হলে ব্যাংকে তোমার অ্যাকাউন্টে রাখো। তা হলে আর সহজে হাতে পাব না। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।'

এই এক কথাতেই গলে গেল ডিটা। 'সত্যি রাখব?'

'রাখবেই তো।' ডিটার পিঠে আলতো চাপড় দিল ডেভ। 'চলো, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। এত টাকা নিয়ে রাস্তায় একা বের হওয়া উচিত না তোমার।'

রানার দিকে ফিরে চোখ টিপল ও। কোথায় যাচ্ছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। হয় নিজের ঘরে, নয়তো ডিটার। বেচারা ডিটা, ভাবল রানা। ডেভ যে ওকে ঠকাচ্ছে বুঝেও বোঝে না। সারাক্ষণ ডেভের প্রেমে বুঁদ। তবে ডেভের হাতে এখনও যে দু'চার টাকা থাকে, সেটা ডিটারই কারণে।

বেরিয়ে গেল দুজনে।

কাপড় পরে নীচে রওনা হলো রানা।

সকালের এই সময়টায় রেস্টুরেন্ট প্রায় খালিই থাকে। রাস্তার দিকে মুখ করা বড় জানালার ধারে বসে কফি খেতে দেখল রানা মেয়েটাকে। খুবই সুন্দরী।

ইহুদি না ইউরোপিয়ান, চেহারা দেখে বোঝা যায় না। টুকটুকে লাল ঠোঁট, ধারাল চিবুক, ধোঁয়াটে চোখ, কাঁধে নেমে যাওয়া কালো চুল; সব মিলিয়ে কোনও দেশের রানী না হলেও ছবির নায়িকা হওয়ার উপযুক্ত, তাতে সন্দেহ নেই।

ওর দিকে এগোল রানা। সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তাকাল মেয়েটা। শান্ত ভঙ্গি। কালো চোখের তারায় কোনরকম উত্তেজনা নেই।

টেবিলের কাছে দাঁড়াল রানা। দুই হাত পকেটে ঢোকানো। 'মিস ম্যাককেইন? আমি মাসুদ রানা। শুনলাম, গ্লেন রিভোল্টারের খোঁজ করছেন। কেন, জানতে পারি?'

শান্ত ভঙ্গিটা আর শান্ত থাকল না, সামান্য অবাক মনে হলো মেয়েটাকে। 'দরকার আছে?'

'ওঁর দরকার থাকতে পারে।'

টেবিলের উল্টো দিকে চেয়ার টেনে বসল রানা। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়ানো ওয়েইটারের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল। হটপ্লেট থেকে তিমির মাংসের কাবাব বের করে এনে রানার সামনে টেবিলে রাখল ও।

'আপনি মনে হচ্ছে ওর গার্জেন?'

'দেখুন,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল রানা, 'ব্যাপারটা খুলেই বলি। গ্লেন চান না, কেউ ওঁকে বিরক্ত করুক। সপ্তাহে একবার করে সাপ্লাই নিয়ে যাই আমি ওঁর ইয়টে। আমার যা ভাড়া, তার দ্বিগুণ দেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে, নগদ ডলারে। কোন বোকামি করে এ ধরনের একজন কাস্টোমারকে হারানোর আগে দশবার চিন্তা করব আমি।'

'যদি বলি গ্লেন আমার পুরনো বন্ধু?'

'কী করে বুঝব?'

'জানতাম এই জবাবই দেবেন,' হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে একটা ওয়ালেট বের করল মেয়েটা। 'আমি যদি যাই, আপনাকে প্লেন ভাড়া কত দিতে হবে?'

'পাঁচশো ক্রোন।'

'আমেরিকান ডলারে কত হয়?'

'প্রায় দেড়শো ডলার।'

তিনটে নোট বের করে টেবিলের উপর দিয়ে ঠেলে দিল মেয়েটা। 'তিনশো দিলাম। আসা-যাওয়ার ভাড়া। ফিরতি ভাড়াটাও দিয়ে রাখলাম, কোন কারণে যদি গ্লেন আমাকে পছন্দ না করে, বিরক্ত হয়ে ফেরত পাঠায়, সেজন্যে। কী, ঠিক আছে? তাতে আশা করি আপনার কাস্টোমার নষ্ট হবে না?'

'এখনও বলতে পারি না। সব কিছুই নির্ভর করে গ্লেনের মেজাজ-মর্জির ওপর,' টাকাগুলো নিজের ওয়ালেটে ভরল রানা। 'চল্লিশ মিনিটের মধ্যে রওনা হচ্ছি আমরা। আবহাওয়া ঠিক থাকলে দু'ঘণ্টা লাগবে যেতে।'

'আমার কোন অসুবিধে নেই।'

উঠে দাঁড়াল রুথ। ইটালিয়ান মেয়েদের মত লম্বা নয়, পাঁচ ফুট তিন কি চার। পরনে দামি টুইডের সুট, পায়ে নাইলনের মোজা, আর পিগস্কিনের তৈরি ফ্ল্যাট-হিল জুতো।

'আরেকটা কথা,' রানা বলল, 'উইকএণ্ডে বেড়ানোর জন্যে এ পোশাক ঠিক আছে, কিন্তু যেখানে যাচ্ছি আমরা, তার জন্যে আলাদা পোশাক লাগবে।'

'বেশি ঠাণ্ডা?' জবাবের অপেক্ষা না করে মেয়েটা বলল, 'বেশ, কাপড় বদলে নেব। তবে একটা কথা না বলে পারছি না, গ্রীনল্যাণ্ড দেখে আমি হতাশই হয়েছি।'

'আপনি কী আশা করেছিলেন? সিলের চামড়ার পোশাক পরা মানুষ? আধুনিক আরামদায়ক পোশাক থাকতে ওগুলো পরতে যাবে কেন লোকে?' রানা বলল। 'তা ছাড়া উত্তাল সাগরে কাইয়াকের চেয়ে ডিজেল-মোটর লাগানো ওয়েইলবোট চালানোও অনেক সহজ, অনেক বেশি নির্ভর করা যায় ওগুলোর ওপর। তবে আপনি যা চাইছেন—রাফ আউটডোর—ডিস্কোতে গেলে আশা করি সেটা পাবেন।'

'দেরি করে লাভ নেই,' শুকনো গলায় বলল রুথ। 'কাপড় বদলাব কোথায়?'

'আমার ঘরেই চলে যান। দোতলায়, একুশ নম্বর। আমি নাস্তা সেরে নিই। আরও দু'চারটা টুকিটাকি কাজ আছে। আধঘণ্টার মধ্যেই আপনাকে তুলে নেব আমি।'

বেরিয়ে গেল রুথ। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পোর্টারের সঙ্গে কথা বলল। তাড়াহুড়ো করে গিয়ে দেয়ালের পাশে রাখা সুটকেসটা তুলে নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল পোর্টার। পিছন পিছন চলল রুথ। তাকিয়ে আছে রানা। মেয়েটাকে চেনা চেনা লাগছে ওর। কোথাও দেখেছে। কিন্তু কোথায়, মনে করতে পারছে না।

মেপে মেপে পা ফেলে রুথ, সারা দেহ দুলিয়ে, বিশেষ একটা ছন্দে।

এতক্ষণে প্লেটের দিকে তাকানোর সুযোগ পেল রানা। কাবাব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এ আর খাওয়া যাবে না। প্লেটটা ঠেলে সরিয়ে কফির কাপ তুলে নিল। চুমুক দিতে

দিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, চওড়া রাস্তা ছাড়িয়ে বন্দরের দিকে, যেখানে রোদে চকচক করছে ওর অটার প্লেনটা; টকটকে লাল আর রূপালী রঙ করা। চোখ অন্যদিকে থাকলেও মন জুড়ে রয়েছে রুথ। কোথায় দেখেছে ওকে? কেন পরিচিত লাগল?

হোটেলের ল্যাণ্ড-রোভারটা ধার নিয়ে বন্দরে চলল রানা। মূল কাজ, হার্বার-মাস্টারের অফিস থেকে আবহাওয়ার রিপোর্ট সংগ্রহ করা। আগের রাতেই প্লেনে তেল ভরে রেখেছে, কাজেই ওই ঝামেলাটা শেষ। আর রয়্যাল গ্রীনল্যাণ্ড ট্রেডিং কোম্পানির কাছে এতটাই দামি কাস্টোমার হয়ে উঠেছে গ্রেন রিভোল্টার, ওর স্কচের বাক্স থেকে শুরু করে সমস্ত রসদপত্র প্লেনে তুলে দেয়া ও তদারকির ভার কোম্পানির লোকই নিয়েছে, তাই ওই কাজটা নিয়েও মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন হয় না রানার।

হোটেলে ফিরে উপরতলায় উঠে এল ও। বেডরুমে ঢুকে রুথকে দেখল না। বাথরুম থেকে শাওয়ারের শব্দ আসছে। ড্রেসিং রুমে এসে কাপড় বদলাতে শুরু করল রানা।

ফ্লাইং বুট পরছে, এ সময় বাইরের দরজা খোলার শব্দ হলো। কেউ ঢুকেছে। সোজা হলো রানা। ওর নাম ধরে ডাকতে শুনল ডেভকে। বেডরুমে ঢুকে বাধা দিতে দেরি করে ফেলল রানা। বাথরুমের দরজা খুলে ফেলেছে ডেভ। ভিতরে তাকিয়ে ধাক্কা খেয়ে যেন পিছিয়ে এল। মুহূর্ত পরেই দরজায় দেখা দিল রুথ, বড় একটা সাদা বাথ টাওয়েলে গা ঢাকা।

'কী ব্যাপার?' আগুন ঝরছে ওর চোখ থেকে। রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দয়া করে এই ভদ্রলোকটাকে আরেকটু ভদ্র হতে বলবেন?'

হাঁ করে তাকিয়ে আছে ডেভ। ওর মুখের উপর দরজাটা লাগিয়ে দিল রুথ।

ডেভের কাঁধে টোকা দিল রানা। 'কেটে পড়ো, ডেভ।'

'কী শরীর, আহা!' ফিসফিস করে বলল ডেভ। 'এত নিখুঁত! এত সুন্দর আমি জীবনেও দেখিনি!'

'দেখেছ,' রানা বলল। 'তিন হাজার সাতচল্লিশ বার।' ডেভকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে করিডরে বের করে দরজা লাগিয়ে দিল ও।

ড্রেসিং রুমে ফিরে একটা সোয়েটার গায়ে দিল। তার উপর চড়াল একটা তুলোভরা, ফারলাইন হুডওয়ালা, সবুজ রঙের পুরনো পারকা। আবার যখন বেডরুমে ফিরল, রুথ তখন ড্রেসিং রুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। স্কি প্যাণ্ট, কসাক বুট আর ভারী নরউইজিয়ান সোয়েটার পরেছে।

'আসলে ডেভের কোন দোষ নেই,' রানা বলল। 'ও ভেবেছিল বাথরুমে আমি। কোন কুমতলব ছিল না ওর।'

'সে-তো কারোরই থাকে না!'

খোলা সুটকেসের পাশে বিছানায় একটা ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেট পড়ে রয়েছে। তুলে নিল রুথ। পরতে শুরু করল। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার ভাবল রানা—পরিচিত লাগছে কেন ওকে?

'আগে আপনাকে কোথায় দেখেছি, বলুন তো?' জবাবটা না জেনে স্বস্তি পাচ্ছে না রানা। 'ছবিতে নয় তো?'

জ্যাকেটের বোতাম লাগানো শেষ করল রুথ। আয়নায় ভালমত দেখল নিজেকে। আবার চিরুনি চালাল চুলে। 'সিনেমায়?'

'গ্লেনের সঙ্গে...' বলতে বলতেই মনে পড়ে গেল ওর। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার চিনেছি। ওর শেষ ছবিটায় একটা অ্যালজিরিয়ান মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। মারদাঙ্গা ছবি।'

'মারদাঙ্গা হলেও ভাল চলেছিল ছবিটা,' অতীতের কথা ভেবেই বোধহয় উজ্জ্বল হলো রুথের মুখ। সুটকেসের জিপার লাগাল। 'কেমন লেগেছিল?'

'দারুণ,' রানা বলল। 'সাংঘাতিক। গ্লেনের তো ফাটাফাটি অভিনয়।'

'আর আমার?'

'খুব ভাল।'

'যাহ্, মিছে কথা বলছেন।' রুথের মুখ দেখেই বোঝা গেল রানার প্রশংসায় খুশি হয়েছে ও।

'না না, সত্যিই ভাল হয়েছে।'

'থ্যাংক ইউ।' সুটকেসটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোল রুথ।

পিছনে চলল রানা।

দুই

ফিয়র্ডের মুখ দিয়ে গর্জন তুলে বেরিয়ে এল প্লেন। ঝলমলে রোদে প্রজাপতির মত ডানা মেলে উপরে উঠতে লাগল ক্রমশ। ডান রাডারটা ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে প্লেনের মুখ ঘোরাল রানা। উদ্ধত পর্বতচূড়ার একপাশে থেকে উপকূল ধরে উড়ে চলল উত্তরে।

দূরে সকালের রোদে জ্বলছে আইস-ক্যাপ। রুথ বলল, 'ছোটবেলায় স্কুলের মর্নিং অ্যাসেম্বলিতে ঈশ্বরবন্দনায়—ফ্রম গ্রীনল্যাণ্ডস আইসি মাউনন্টেইনস...এই একটা লাইন ছাড়া গ্রীনল্যাণ্ড সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। আইসপ্যাকটা দেখে এখন ওই লাইনটার কথা মনে পড়ছে। ফ্রেডেরিকসবর্গে তো রীতিমত হতাশ হয়েছি।'

'আসলে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার মতই ফ্রেডেরিকসবর্গেও উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে,' রানা বলল। 'জনসংখ্যা বাড়ছে। উন্নয়নের কাজে প্রচুর টাকা ব্যয় করছে ডেনিশ সরকার।'

'কিন্তু কোনখানেই কি আগের সেই আসল পৃথিবীটাকে থাকতে দেবে না মানুষ?' এক মুহূর্ত চুপ থেকে রুথ বলল, 'আরেকটা জিনিস, যতটা ঠাণ্ডা হবে মনে করেছিলাম, ততটা নয়।'

'এখন গ্রীষ্মকাল তো, তাই; বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিমে। তবে আর্কটিক

সার্কেলের উত্তরে প্রকৃতি সেই আগের মতই বুনো রয়ে গেছে। ডিস্কোতে গে অনেক এস্কিমোও দেখতে পাবেন, বাপ-দাদাদের মত আদিম জীবনযাপন করে।'

'গ্লেন তা হলে ওখানেই আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'শেষ খবর পেয়েছি, নারকোয়াসিট নামে একটা গ্রামে কাছে। গত দু'সপ্তা ধরে মেরু ভালুকের খোঁজ করছেন।'

'কতখানি চিনেছেন ওকে? সপ্তায় মাত্র একবার করে গিয়ে কাউকে ততো চেনার কথা নয়।'

'কিন্তু চিনেছি। অনেকখানি।'

হাসল রুথ। 'আপনাকে দেখেও কিন্তু ওর মতই মনে হচ্ছে আমার। হয়তো সেজন্যেই—মানে, এক চরিত্রের বলেই নিজেকে এত তাড়াতাড়ি আপনার কাছে মেলে ধরেছে।'

'কী ধরনের চরিত্র?'

'বেপরোয়া, খামখেয়ালি, যখন যা ইচ্ছে হয় করে।'

'আমি কি তাই?'

'এখন পর্যন্ত তো সে-রকমই মনে হচ্ছে।' সিটে হেলান দিল রুথ। 'গ্লেন বলে পৃথিবীতে সবাই অভিনয় করে। কেউ ক্যামেরার সামনে, কেউ বাস্তবে। আমি ও সঙ্গে একমত নই। আসলে স্ক্রিপ্টের বাইরে কিছু দেখতে পায় না গ্লেনের মত মানুষেরা।'

'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন,' রানা বলল, 'দীর্ঘদিন ফ্যান্টাসির জগতে বাস করে করে বাস্তবটাই এখন ওঁর কাছে অবাস্তব?'

'অনেকটা তাই।'

পাঁচ মিনিট পর মেঘের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এল প্লেন। চেঁচিয়ে উঠল রুথ 'আরি! দেখুন দেখুন!'

সিকি মাইল দূরে আধডজন তিন-মাস্তুলের স্কুনার পাল তুলে এক সারিতে এগিয়ে চলেছে।

'ওরা পর্তুগিজ,' রানা বলল। 'কলম্বাসের আগে থেকেই আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আসছে ওদের পূর্ব-পুরুষরা। মে-জুনে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের কাছে গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্কে মা ধরতে যায়, জুলাইয়ের শেষে এদিকে চলে আসে।'

'দৃশ্যটা কিন্তু দারুণ,' রুথ বলল। 'বর্তমান নয়, অন্য কোনও সময়ের ছবি দেখছি মনে হচ্ছে। সিনেমার দৃশ্য বলেও চালিয়ে দেয়া যায়।'

এ-সময় ঘটল আবহাওয়ার আচমকা বিস্ময়কর পরিবর্তন। গ্রীনল্যাণ্ডে উপকূলে পাইলটদের আতঙ্ক। এই দেখা গেল ঝকঝকে মেঘমুক্ত আকাশ, দৃষ্টি চলে পরিষ্কার, পরক্ষণেই পুরোপুরি বদলে গিয়ে আইস-ক্যাপ থেকে উড়ে আসে সুচ ফুটানো বৃষ্টি আর ভারী কুয়াশা।

এখনও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। ধূসর দেয়ালের মত উড়ে এল বৃষ্টি মেশানো কুয়াশা। থ্রটল টেনে দ্রুত প্লেন নীচে নামাল রানা।

'খুব খারাপ?' শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রুথ।

'ভাল নয়, এটুকু বলতে পারি।' নিরাপদ জায়গা খুঁজে বের করে তাড়াতাড়ি

গিয়ে সেখানে আশ্রয় নেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল রানা।

পর্বতের কাঁধ পেরিয়ে এসে ফিয়র্ডের অন্যপাশে প্লেন নিয়ে ঝাঁপ দিল ও। ধূসর কুয়াশার কয়েকটা বাঁকা ফিতে সবে এসে পৌঁছেছে এখানটায়। প্লেনের ডানা ছুঁয়ে যাচ্ছে সেগুলো।

নীচে নামাল রানা। ঝপাৎ করে শান্ত পানিতে যেন খসে পড়ল প্লেন। ঘিরে ফেলেছে কুয়াশা। ট্যাক্সিইং করে সামনে এগোনোর সময় পাশের জানালা খুলে বাইরে উঁকি দিল ও।

হঠাৎ কুয়াশার ভিতর থেকে যেন ঠেলে বেরোল একটা পুরানো পাথুরে পিয়ারের মাথা। সাবধানে ঘুরে ওটাকে ডান পাশে রেখে এগোল রানা।

একটু পরেই পিয়ারের অন্য মাথা, সেইসঙ্গে ডাঙা দেখা গেল। ফ্লোটের পাশে চাকা নামিয়ে দিয়ে ট্যাক্সিইং করে এক চিলতে পাথুরে সৈকতে উঠে গেল ও। ইঞ্জিন বন্ধ করতেই নীরবতা যেন চেপে ধরল।

'কোথায় এলাম?' রুথ জিজ্ঞেস করল।

'পরিত্যক্ত একটা পুরানো ওয়েইলিং স্টেশনে, জায়গাটার নাম অ্যারগামাস্ক। ঘুরে দেখতে চান?'

'হ্যাঁ। কতক্ষণ এখানে থাকতে হবে আমাদের?'

'সেটা নির্ভর করে আবহাওয়ার মতিগতির ওপর। এক ঘণ্টা—দু'ঘণ্টাও লাগতে পারে। হঠাৎ করে যেভাবে এসেছে, তেমনিভাবেই চলে যাবে কুয়াশা।'

দরজা খুলে লাফিয়ে নামল রানা। রুথও নেমে এল, রানার সাহায্য ছাড়াই। ফ্রেডেরিকসবর্গের চেয়ে ঠাণ্ডা বেশি এখানে, কিন্তু আর্কটিক সার্কেলের বিশ মাইলের ভিতর ঢুকে যাওয়ার তুলনায় কম। কৌতূহলী হয়ে চারপাশে তাকাচ্ছে রুথ।

'ঘুরে দেখাবেন বললেন?'

'হ্যাঁ, আসুন।'

সৈকত ধরে এগিয়ে, কংক্রিটের তৈরি একটা ঢালু পথ বেয়ে উপরে উঠে এল ওরা, পিয়ারের শেষ প্রান্তে। ওদের উপর মাথা তুলে দাঁড়ানো পর্বতমালা কুয়াশায় ঘেরা। পর্বতের গোড়ায় যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে পুরনো আমলের তিমির তেল প্রসেসিং কারখানার খোসাটা, আর চল্লিশ-পঞ্চাশটা কটেজের ধ্বংসস্তূপ।

এককালের প্রধান রাস্তাটা ধরে যখন হাঁটতে আরম্ভ করল ওরা, ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে রেখেছে রুথ। হাসল। কথা বলল অদ্ভুত উত্তেজনা মেশানো কণ্ঠে, 'হ্যাঁ, এ জায়গাটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। এ রকম বৃষ্টি আর কুয়াশার মধ্যে হাঁটতে আমার চিরকালই ভাল লাগে, ছোটবেলা থেকেই।'

'মনে হয়, দুনিয়ার কোথাও আর কেউ নেই!'

হেসে উঠল রুথ। অদ্ভুতভাবে বদলে গেছে ও। যেন খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে এখন ওর আসল রূপটা। 'আপনি বললেন এককালে এটা ওয়েইলিং স্টেশন ছিল?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আঠারো শতকের শেষ দিকে তিমি শিকারিরা এ-জায়গাটা চিরকালের জন্যে ছেড়ে গেছে।'

'কেন?'

'শিকার ফুরিয়ে গিয়েছিল, তিমি,' শ্রাগ করল রানা। 'প্রতি বছর তিমি শিকারের জন্যে চার-পাঁচশো জাহাজ এসে ভিড় করত এই এলাকায়। অতিরিক্ত মেরে মেরে শেষ করে দিয়েছিল, প্রায় বিলুপ্ত, উত্তর আমেরিকার বুনো মোষের মত।'

রাস্তার শেষ মাথায় ছোট একটা গির্জার ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল। তার পিছনে গোরস্থান। ভাঙা দেয়াল। ভিতরে ঢুকল ওরা। শ্যাওলায় ঢাকা প্রথম কবরফলকটার কাছে দাঁড়াল।

'অ্যাঙ্গাস ম্যাকক্লারেন, মৃত্যু ১৮৩০,' জোরে জোরে পড়ল রুথ। 'স্কটল্যাণ্ডের লোক।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তিমি শিকারের ইতিহাসে খুবই খারাপ একটা বছর ছিল ওটা। প্যাকের বরফ গলতে দেরি হয়েছিল। ওখানে আটকা পড়েছিল উনিশ জন ইংরেজ ওয়েইলার। শোনা যায়, একবারে হাজারেরও বেশি লোক গিয়ে ঠাঁই নিয়েছিল ওই বরফের স্তূপে।'

অর্ধেক মুছে যাওয়া নামফলক পড়তে পড়তে কবরগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে চলল রুথ। একটা কবরের পাশে থেমে গেল। সামান্য কুঁচকে গেছে ভুরু। এক হাঁটু ভাঁজ করে বসল। দস্তানা পরা হাতে কবরফলক থেকে ডলে সরাল সবুজ শ্যাওলা।

খুব যত্ন করে একটা স্টার অভ ডেভিড খোদাই করা রয়েছে পাথরের গায়ে, তার নীচের লেখাটা বিড়বিড় করে পড়ল রুথ, 'অ্যারন আইজাক, মৃত্যু ২৭শে জুলাই, ১৮৬৩।'

ফলকে আরও যা লেখা রয়েছে, তাতে বোঝা যায় লিভারপুল থেকে আসা 'সি কুইন' নামে একটা জাহাজের পেটি অফিসার ছিল অ্যারন আইজাক।

হাঁটু গেড়ে বসে খোদাই করা অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে ও, একটা হাত কবরফলকে রাখা, চেহারায় বিষণ্ণতা। পাশে দাঁড়ানো রানার দিকে মুখ তুলে তাকাল। প্রথম থেকে যে রকম দেখে আসছিল—রুক্ষ-কঠিন একটা মেয়ে—ওর এই পরিবর্তন বিস্মিত করল রানাকে। এখন আর বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, বাইরের লৌহকঠিন আবরণের আড়ালে নরম আবেগপ্রবণ একটা মন আছে মেয়েটার।

উঠে দাঁড়াল রুথ। পাথরে বাঁধাই চারকোনা একটা উঁচু কবরের উপর পা দুলিয়ে বসল। 'আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো। দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে গ্রীনল্যাণ্ডে কেন আপনি?'

এই প্রশ্নটারই আশঙ্কা করছিল রানা। তবে তৈরি রয়েছে ও। ফ্রেডেরিকসবর্গের সবাইকেই যে কৈফিয়তটা দেয়, সেটাই দিল। 'খুব সোজা—শুধু গ্রীষ্ম মৌসুমের দুই মাসেই অন্য জায়গায় বারো মাসে যা কামাতাম তার দ্বিগুণ কামাই আমি এখানে।'

'টাকার খুব দরকার আপনার, তাই না?'

'হ্যাঁ, দরকার। আরও দুটো প্লেন কেনার ইচ্ছে আছে আমার।'

'শুনে তো উচ্চাভিলাষী লোক মনে হচ্ছে আপনাকে। তারপর?'

'লাব্রাডর আর নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে নিজের কোম্পানি খুলতে পারলে পাঁচ-ছয় বছরেই বড়লোক হয়ে যাব।'

'খুব আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে।'

'না হওয়ার কোন কারণ নেই। আমার যা বয়েস, এটাই তো খাটার সময়।'

'হুঁ' এমন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রুথ, যেন রানার কথায় সন্তুষ্ট হতে পারছে না, কিছু একটা সন্দেহ করছে। কথা আদায়ের জন্য অন্য পথ ধরল ও, 'নিশ্চয় খুব ভাল, সুন্দরী একটা মেয়ে কোথাও অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে?'

'তাই নাকি? জানি না তো! কী নাম ওর?'

'তারমানে ওরকম কেউ নেই আপনার?'

হাসল রানা। 'বুঝতে পারছি, আপনি আমার সম্পর্কে সব জানতে চাচ্ছেন। বেশ, আপনাকে মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিচ্ছি। আমার নাম মাসুদ রানা—জন্ম বাংলাদেশে, ইংল্যাণ্ডের নাগরিক। লণ্ডনের স্কুল অভ ইকোনোমিকস থেকে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ডিগ্রি নিয়েছি, ইউনিভার্সিটি এয়ার স্কোয়াড্রনে ফ্লাইং শিখেছি। পড়াশোনা শেষ করে দুই বছর ন্যাশনাল সার্ভিসে বাধ্যতামূলক কাজ করতে হয়েছে। ভাবলাম, এত কষ্ট করে শিখলামই যখন, শিক্ষাটাকে কাজে লাগাই। তাই পুরানো ফ্লিট এয়ার আর্মে একটা শর্ট সার্ভিস কমিশন নিলাম। সার্ভিস থেকে বেরিয়ে এসে পাবলিক রিলেশন অফিসে একটা চাকরি নিলাম।'

'সুবিধে করতে পারেননি?'

'ভালই ছিল চাকরিটা,' সাবধানে জবাব দিল রানা। এই মেয়েটা বোকা নয়, কতটা বিশ্বাসযোগ্য করে ওর কাছে মিথ্যে কথাগুলো বলতে পারবে ভাবছে। 'কিন্তু সারাক্ষণ ডেস্কে বসে ফাইল ঘাঁটা আর টেলিফোনে কথা বলা সহ্য করতে পারলাম না। এক সকালে অফিসে ঢুকে ডেস্কের ওপর জমা হওয়া চিঠির স্তূপের দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে বেরিয়ে চলে এলাম। জমানো টাকার শেষ হাজার পাউণ্ড খরচ করলাম কনভারশন কোর্সের পিছনে। একটা কমার্শিয়াল পাইলটের লাইসেন্স জোগাড় করলাম।'

'তারপর এখানে চলে এলেন। মুক্ত মাসুদ রানা—যেখানে খুশি উড়ে যেতে পারে—যা ইচ্ছে করতে পারে। অবৈধ কাজকারবারে জড়িয়ে পড়লেও বাধা দেয়ার কেউ নেই।' আনমনে বিড়বিড় করল রুথ।

'আশা করি কৌতূহল মিটেছে আপনার,' রানা বলল। 'এবার রুথ ম্যাককেইনের জীবনের কিছু কথা শোনা যাক। যতদূর মনে পড়ে রুথ নামটা হিব্রু নাম। তারমানে, আপনি ইহুদি।'

'কোন সন্দেহ নেই তাতে,' রুথ বলল। 'ইজরায়েলে জন্ম ও বড় হওয়া মেয়ে। তেল আভিভ বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরানো ভাষার ওপর লেকচার দেন আমার বাবা।'

'আপনার সিনেমায় যোগ দেয়ার কথা বলুন।'

'ছোটবেলা থেকেই সিনেমা খুব পছন্দ আমার। সিনেমা হলে ছবি দেখতে বসে বার বার মনে হতো, ইস্, আমি যদি অভিনয় করতে পারতাম। ইসরায়েলে থাকতে প্রথমে একটা থিয়েটারে অভিনয় করেছি, সেখান থেকে সিনেমায় ছোট্ট একটা চরিত্র, তারপর ইটালিতে কাজ করার আমন্ত্রণ। ওখানে বেশ কয়েকটা ছবিতে কাজ করেছি। ওখানেই দেখা হয়েছে গ্লেনের সঙ্গে। একটা যুদ্ধের ছবিতে কাজ করছে তখন ও, লোকেশনে ওর সঙ্গে পরিচয়। শুধু অভিনয়ই করছে না তখন, ছবি পরিচালনাও করছে। সিনেমা বানানোর বেশির ভাগ টাকাও ওরই দেয়া।'

'ওই ছবিটাতে আপনাকে কাজ দিয়েছেন গ্লেন?'

'প্রথমে ছোট একটা চরিত্রে। কিন্তু সারা ছবিতে মেয়েমানুষের চরিত্র ও একটাই, তাই পত্রিকা সমালোচকদের চোখে ঠিকই পড়েছিলাম।'

হঠাৎ করেই যেন জাদুমন্ত্রের ছোঁয়ায় রুথের পিছনে কুয়াশার চাদর উধাও হয়ে গিয়ে পর্বত চোখে পড়ল। ঝকঝকে নীলাকাশ ফুঁড়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে যে পর্বতের চূড়া। একটু আগের ধোঁয়াটে অন্ধকারের কথা কল্পনাই করা যায় না এখন।

'যাবার সময় হলো।' রুথকে নামতে সাহায্য করার জন্য ভদ্রতা করে হাত বাড়াল রানা।

কিন্তু হাতটা না ধরে লাফিয়ে নামল রুথ। পর্বতের দিকে তাকাল। 'নাম কী ওটার?'

'আগ্‌সোসাট,' রানা বলল। 'এস্কিমো শব্দ, এর মানে পোয়াতির পেট।'

'হুঁহ্; আর নাম খুঁজে পেল না!' রুক্ষ শোনাল রুথের কণ্ঠ।

হনহন করে হেঁটে দেয়ালের ভাঙা জায়গা দিয়ে বেরিয়ে গেল ও।

আবার আগের রুক্ষ, কঠিন খোলসটা ফিরে এসেছে ওর। শামুকের মত খোলার ভিতরে গুটিয়ে নিয়েছে আবার নিজেকে। নিজে থেকে না খুললে ওই খোলস আর কোনমতেই খোলা যাবে না।

গম্ভীর মুখে ওকে অনুসরণ করল রানা।

তিন

ডিস্কোর সর্বদক্ষিণ প্রান্তে আরও দুটো পর্তুগিজ স্কুনার দেখল ওরা। ওগুলোর পিছনে ঝিরঝিরে বাতাসে পাল তুলে দিয়ে নৌবহরের মত এগিয়ে চলেছে চোদ্দো ফুট লম্বা একসারি ডোরি নৌকা। হলুদ আর সবুজ পাল উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করছে।

বাতাসে ভেসে দ্বীপের পাথুরে শিরদাঁড়া পার হয়ে এসে ওপাশের প্রণালীতে যেন ঝাঁপ দিতে তৈরি হলো রানার প্লেন। মূল ভূখণ্ড থেকে দ্বীপটাকে আলাদা করে রেখেছে এই প্রণালী। দ্রুত উচ্চতা হারাচ্ছে প্লেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই যা দেখতে চেয়েছিল, চোখে পড়ল রানার।

এই উপকূলের একটা খাঁটি এস্কিমো ফিশিং ভিলেজ নারকোয়াসিট। পনেরো ষোলোটা উজ্জ্বল রঙ করা কাঠের ঘর মালার মত ছড়িয়ে আছে সমুদ্রের কিনারে। পানিতে নোঙর করা রয়েছে দু'তিনটে ওয়েইল বোট আর ডজনখানেক কাইয়াক।

পাড় থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে রয়েছে 'আইসবার্গ'। নব্বই ফুট লম্বা, ছিপছিপে সুন্দর গঠন। ডিজেল ইঞ্জিনে চলে। উজ্জ্বল সাদা রঙ করা ইস্পাতে তৈরি খোল, তার উপর ঘন লালের অলঙ্করণ। বাতাসের দিক থেকে মোড় নিয়ে ল্যাণ্ডিঙের প্রস্তুতি নিচ্ছে রানা, এ সময় হুইলহাউস থেকে ব্রিজে বেরিয়ে রেলিং ঘেঁষে দাঁড়াল একজন লোক, ওদের দিকে চোখ।

'গ্লেন নাকি?' লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে রুথ। 'ভালমত দেখতে পাচ্ছি

না।' প্লেন মোড় নিচ্ছে, তাই দেখছে না ও।

মাথা নাড়ল রানা, 'না, ও হেনরি হুল্যাণ্ডবার্গ, গ্রীনল্যাণ্ডের লোক। ন্যুক থেকে এসেছে। এই উপকূল ওর অতি পরিচিত। জাহাজের পাইলট হিসেবে নিয়োগ করেছেন ওকে গ্রেন।'

'নিজের জাহাজের নাবিকদেরও এখানে সঙ্গে করে এনেছে?'

'সেটাই তো স্বাভাবিক। অনেককেই এনেছেন। একজন ইঞ্জিনিয়ার, দুজন ডেক হ্যাণ্ড, একজন বাবুর্চি—সবাই আমেরিকান। আর স্টুয়ার্ড লোকটা ফিলিপিনো।'

'বিলি হেসিয়ানো?'

'হ্যাঁ।'

খুশি মনে হলো রুথকে। 'যাক, ভালই। পুরনো চেনা মুখ দেখলে অস্বস্তি কমে।'

প্লেন নীচে নামিয়ে উড়ে গেল রানা। প্যাক-আইস কতখানি ছড়িয়ে রয়েছে দেখার জন্য। ঘাবড়ানোর মত কিছু দেখল না। আর দেরি না করে পানিতে নামল ও। ট্যাক্সিইং করে এগোল তীরের দিকে। আগেরবারের মতই ডাঙার কাছাকাছি পৌঁছে চাকা নামিয়ে দিল, চাকায় ভর করে উঠে এল ডাঙায়। ঠিক এই সময় গ্রাম থেকে দৌড়ে এল প্রথম কুকুরটা। ইঞ্জিন বন্ধ করে পাশের দরজা খুলে যখন উঁকি দিল রানা, সবগুলো কুকুর ততক্ষণে পৌঁছে গেছে, প্লেনের কাছে অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে। রাগত ভঙ্গিতে নিজেদের এলাকায় অনুপ্রবেশের প্রতিবাদ জানাচ্ছে প্লেনটার বিরুদ্ধে।

কয়েকটা এস্কিমো ছেলেমেয়ে ছুটে এসে ডাল দিয়ে বাড়ি মারার ভঙ্গি করে আর পাথর ছুঁড়ে ওগুলোকে তাড়াল। তারপর এক জায়গায় জড় হয়ে তাকিয়ে রইল রানাদের দিকে। বাদামী মঙ্গোলিয়ান মুখগুলোতে হাসি নেই কারও, অতিশয় গম্ভীর। পরনের ভারি ফার-লাইন্‌ড্‌ পারকায় অনেক বেশি ফোলা দেখাচ্ছে ওদেরকে।

'খুব আন্তরিক তো মনে হচ্ছে না,' রুথ বলল।

পকেট থেকে বাদামী রঙের একটা প্যাকেট বের করে দিল রানা, 'এগুলো দিয়ে দেখুন।'

প্যাকেট খুলে ভিতরে তাকাল রুথ। 'কী এগুলো?'

'পেপারমেন্ট লজেন্স। কখনোই হাসি ফোটাতে ব্যর্থ হয়নি।'

এবারেও হলো না। প্যাকেটটা দেখেই এগিয়ে আসতে শুরু করেছে ছেলেমেয়েগুলো, মুখের ভারী মেঘ কেটে গিয়ে যেন হাসির উজ্জ্বল রোদ ফুটেছে। চোখের পলকে ঘিরে ফেলল রুথকে। এক ঝাঁক বাড়ানো হাত ঝটকা দিয়ে উঠে গেল ওর দিকে।

রুথকে রেখে পানির দিকে এগোল রানা। আইসবার্গ থেকে একটা ওয়েইলবোট আসছে। মাঝামাঝি দূরত্ব পাড়ি দিয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যেই। হালের হাতলের কাছে দাঁড়ানো একজন ডেক হ্যাণ্ড। গলুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে হেনরি। হাতে দড়ি। ইঞ্জিনচালক ইঞ্জিন বন্ধ করে দিতেই মোড় নিতে আরম্ভ করল ওয়েইলবোট। দড়িটা তীরে ছুঁড়ে দিল হেনরি। এক থাবাতেই ধরে ফেলল রানা—এক পা পানিতে। টানতে লাগল দড়িটা। এক মুহূর্ত পরেই ওর পাশে এসে দাঁড়াল হেনরি,

দড়ি ধরল, ওয়েইলবোটটাকে টেনে আনতে সাহায্য করল রানাকে। সৈকতের কাছাকাছি নিয়ে এল বোটটাকে।

ভাল ইংরেজি বলে হেনরি। পনেরো বছর ক্যানাডিয়ান আর ব্রিটিশ মার্চেন্ট মেরিনে কাজ করেছে। ইংরেজি শেখার সুযোগটা হাতছাড়া করেনি।

'ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আপনার জন্যে,' রানাকে বলল ও। 'হঠাৎ করে কুয়াশায় যেভাবে ঢেকে ফেলল।'

'আরগামাস্কে নেমে পড়েছিলাম,' রানা জানাল। 'ঘণ্টাখানেক আটকে ছিলাম ওখানে।'

মাথা ঝাঁকাল হেনরি। 'উপকূল চেনে এ রকম কারোর জন্যে অবশ্য তত ভয় নেই। মেয়েটা কে?'

'বলল তো গ্লেনের বন্ধু।'

'কিন্তু মেহমান যে আসবে, আমাকে তো বলেনি।'

'জানে না, তাই বলেনি।'

'তাই?' ভ্রূকুটি করল হেনরি। 'কিন্তু বস মোটেও খুশি হবেন না।'

শ্রাগ করল রানা। 'আমাকে চাপাচাপি শুরু করল, না এনে পারলাম না। আপনার বস ওকে থাকতে না দিলে আমার সঙ্গে ফিরে যাবে। সন্দ্রেতে পৌঁছে দেব। ওখান থেকে ইয়োরোপ-আমেরিকা যেখানে ইচ্ছে যেতে পারবে।'

'যদি মনে করেন, আপনি সব সামলাতে পারবেন, আমার আপত্তি নেই। আমি এ-সবে নাক গলাতে যাচ্ছি না। এমনিতেই প্রচুর ঝামেলায় আছি।'

অবাক মনে হলো রানাকে। 'কী হয়েছে?'

'আর বলবেন না, বসকে নিয়েই যত ঝামেলা,' তিক্ত শোনাল হেনরির কণ্ঠ। 'নিজেকে ধ্বংস করার জন্যে এ-রকম উন্মাদ হয়ে যেতে দেখিনি আমি আর কাউকে।'

'কী করেছেন?'

'এই তো পরশু দিন হ্যাগামুটের কাছে গিয়েছিলাম মেরু ভালুকের খোঁজে—ওঁর নতুন পাগলামি। কয়েকজন এস্কিমো শিকারির সঙ্গে দেখা, কাইয়াক নিয়ে সিল শিকারে যাচ্ছিল। বলাই বাহুল্য, ওদেরকে সঙ্গে যেতে অনুরোধ করলেন বস। ফেরার পথে ওদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে একাই চলছিলেন, আর পড়বি তো পড় বরফের ওপর একটা ষণ্ডা ওয়ালরাসের সামনে।'

'ওটাকে একা মারার চেষ্টা করেছিলেন?' প্রশ্ন করল বিস্মিত রানা।

'একা তো বটেই—সঙ্গে রাইফেল বন্দুক থাকলেও এক কথা ছিল—হারপুন দিয়ে।'

'তারপর?'

'ছুটে এসে প্রথম ধাক্কাতেই ওঁকে চিত করে ফেলল ওয়ালরাস, কামড় দিয়ে দুই টুকরো করে ফেলল হারপুন। ভাগ্য ভাল, ঘটনাটা হ্যাগামুট থেকে আসা একজন শিকারির চোখে পড়েছিল। ওয়ালরাসটা বসকে খতম করে দেয়ার আগেই দৌড়ে গিয়ে ওটাকে গুলি করল শিকারি।'.

'গ্লেন জখম হয়েছেন?'

'কয়েকটা দাগ-টাগ, তার বেশি আর কিছু না। বেঁচে গেছেন এ-যাত্রা। ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দিলেন। আমি সাবধানে থাকার কথা বলতে গেলে আমাকে কি বললেন শুনবেন? বললেন, তাঁর ইচ্ছে হলে তিনি নরকে যাবেন, তাতে আমার কী? একা একা যেখানে ইচ্ছে যান, আপত্তি করতে যাব না। কিন্তু জাহাজ সহ সবাইকে যখন ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেন, তখন? এ বছর দক্ষিণের ফিয়র্ডে প্রচুর প্যাক-আইস জমেছে—জানেন নিশ্চয়—অথচ আমাকে ওদিকেই যাবার হুকুম দিয়ে বসলেন তিনি। ক্যাভানগার ফিয়র্ডে জাহাজ নিয়ে যেতে বললেন। ওখানে যাবার কারণ, এস্কিমো শিকারিরা জানিয়েছে, ওখানে নাকি মেরু ভালুক আছে। বাধ্য হয়ে গেলাম। হিমবাহ থেকে এত দ্রুত বরফ নেমে আসতে লাগল, পুরো চারটি ঘণ্টা আটকে বসে থাকতে হয়েছে আমাদের। আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম কোনদিন আর বেরোতে পারব না ভেবে।'

'এখন কোথায় তিনি?'

'দুই ঘণ্টা আগে বেরিয়েছেন, নারকোয়াসিট থেকে আসা একদল শিকারির সঙ্গে কাইয়াকে করে। মাইল তিনেক দূরে উপকূলের পাশের একটা খাঁড়িতে নাকি ভালুক দেখেছে একজন শিকারি, গতকাল বিকেলে। টাকা দিয়ে ওদেরকে সঙ্গে যেতে রাজি করিয়েছেন বস। ওদেরও ধারণা, লোকটা পাগল।'

ছেলেমেয়েগুলোর কবল থেকে কোনমতে নিজেকে মুক্ত করল রুথ। রানার কাছে এসে দাঁড়াল।

দ্রুত হেনরির সঙ্গে রুথের পরিচয়ের পালা শেষ করল রানা। রুথকে বলল, 'গ্লেন এখন এখানে নেই। মনে হচ্ছে আমার একটু খোঁজ নিতে যাওয়া উচিত। আপনি ইয়টে অপেক্ষা করুন।'

'আমি গেলে অসুবিধে আছে?'

'আছে। বিশ্বাস করুন, মেয়েদের জায়গা নয় ওটা। মেরু ভালুক পুরুষ-নারী বাছবিচার করে না।'

'বুঝলাম,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল রুথ। 'গ্লেনের এ-সব বড় বড় অ্যাডভেঞ্চারের ভক্তও নই আমি।'

অটার থেকে ততক্ষণে ওয়েইলবোটে মাল তোলা শুরু করে দিয়েছে ডেক হ্যাণ্ড লোকটা। হেনরির দিকে তাকাল রানা। 'আপনার সঙ্গে ইয়টে যাব। ওয়েইলবোটের মাল খালাস করা হয়ে গেলে বোটটা নিয়ে চলে যাব আমি।'

মাথা ঝাঁকাল হেনরি। মাল নামাতে ডেক হ্যাণ্ডকে সাহায্য করতে গেল। রানার দিকে তাকিয়ে হাসল রুথ। 'যান, বুঝবেন।'

'মানে?'

'গ্লেন রিভোল্টারের যখন মাথা খারাপ হয়, ওর কাছ থেকে দূরে থাকাই ভাল,' বলে বোটের দিকে রওনা হলো রুথ।

একটা মুহূর্ত ভাবল রানা। তারপর অটারে উঠল। পাইলটের সিটের নীচে একটা কম্পার্টমেণ্ট খুলে গান-বক্স বের করল। ওটার মধ্য থেকে বের করল গ্লেনের উইনচেস্টার হাণ্টিং রাইফেল। চমৎকার অস্ত্র। কয়েক হপ্তা আগে গ্লেন ওকে দিয়েছেন ওটার সাইট ঠিক আছে কি না গুলি করে দেখে দেয়ার জন্য। টার্গেটের

বেশ কিছুটা বামে ও নীচে লাগছিল গুলিগুলো। একশো গজে জিরো করে রেখেছে ও অস্ত্রটা। এখন পঞ্চাশ গজ দূরের টার্গেটে লক্ষ্যস্থির করতে হবে এক ইঞ্চি নীচে, আর দেড়শো গজে এক ইঞ্চি উপরে। আজ ফেরত দেবে বলে নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে। হয়তো কাজে লাগবে এখন।

ম্যাপ কম্পার্টমেন্ট থেকে কার্তুজের বাক্স বের করে ম্যাগাজিনে গুলি ভরল রানা। সাবধান থাকা ভাল। মেরু ভালুক আর গ্লেন রিভোল্টার, কাউকেই বিশ্বাস নেই।

ছয় থেকে সাত নট গতিতে চলেছে ওয়েইলবোট। আইসবার্গের কাছ থেকে রওনা হওয়ার পর শুরুতে যাত্রাটা খারাপ ছিল না, কিন্তু মাইল দুই এগোনোর পর ঝামেলা শুরু করল আইস প্যাক। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল, ইঞ্জিন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলো রানা। বোটের সিটে দাঁড়িয়ে অসংখ্য প্রণালীর গোলকধাঁধার মধ্যে খুঁজে বের করতে হলো কোন পথটা দিয়ে গেলে বরফের বাধা কম পড়বে।

বেশ কষ্ট করেই এগোতে হলো কিছুক্ষণ। যখন-তখন ভুস করে মাথা তুলছে ভাঙা বরফের চাঙড়, পানিকে দোলাচ্ছে, ভাঙা টুকরোর তীক্ষ্ণধার কিনারাগুলো ঘষা খাচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে। ওগুলোর মাঝখানে আটকা পড়লে ফাঁদে পড়া ইঁদুরের অবস্থা হবে বোটের। দুই-দুইবার পড়ল রানা, গতি বাড়িয়ে দিয়ে কোনমতে বাঁচল। অবশেষে মোটামুটি পরিষ্কার পানিতে আবার বেরিয়ে এল ও। এই ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘামছে। হাত কাঁপছে একটু একটু।

সাগরের পানি ছুঁয়ে আসা বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা। কিন্তু অন্তহীন নীল আকাশে সূর্যটা ঠিকই জ্বলছে। ওটার উত্তাপও এই হিমেল বাতাসকে গরম করতে পারছে না। দূরের পর্বতমালা আর আইস-ক্যাপের ঝকঝকে সুন্দর চেহারা দেখে মনেই হয় না ওগুলো এত ঠাণ্ডা।

হঠাৎ করেই যেন সব কিছু মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল—সাগর, বাতাস, রোদ, আকাশ, পর্বত, আইস-ক্যাপ, সব। দম আটকানো একটা মুহূর্ত। যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে পৃথিবীটা। প্রকৃতির এই বিশালতার মধ্যে বড় ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে নিজেকে রানার।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে বোট। বরফের চাঙড়ের ভয়ে গতি বাড়াতে সাহস করছে না। দশ মিনিট পর খানিকটা ধোঁয়া চোখে পড়ল ওর। সৈকতের সমান্তরালে চলে যাওয়া একটা পাথরের দেয়ালের ওপাশে। দেয়ালটা পার হয়েই শিকারির দলটাকে চোখে পড়ল। অগ্নিকুণ্ডের চারপাশ ঘিরে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। ওদের কাইয়াকগুলো সৈকতে টেনে তুলে রেখেছে। রানার দিকে পিছন করে বসেছেন গ্লেন, এক হাতে একটা টিনের কাপ, অন্য হাতে বোতল। ওয়েইলবোটের ইঞ্জিনের শব্দ কানে যেতে ঘুরে তাকালেন। রানাকে চিনতে পেরে বিকট চিৎকার দিয়ে উঠলেন আনন্দে। চেঁচিয়ে বললেন, 'আরি, রানা যে! এসো এসো! কী খবর?'

লাফিয়ে উঠে সৈকতের দিকে দৌড়ে এলেন তিনি। রানা তখন ভাঙা বরফের ভাসমান টুকরোর ফাঁক-ফোকর দিয়ে বোটটাকে তীরে নিয়ে যেতে ব্যস্ত। তাকিয়ে আছে গ্লেনের দিকে। বিশালদেহী, মাথায় বাদামী চুলের বোঝা, সুদর্শন চেহারা।

বেশ কয়েক দিন শেভ না করা খোঁচা খোঁচা দাড়ি রুক্ষ করে তুলেছে চেহারাটাকে। দুনিয়াজোড়া জনপ্রিয়তা এই মানুষটার, এই মুহূর্তে তাঁকে দেখে ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না। প্রথম ছবিতে অভিনয় করেছিলেন ষোলো বছর বয়েসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকান বিমান বাহিনীতে যোগ দেন, একটা বম্বার প্লেনে রিয়ার গানার হিসেবে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধ শেষে আবার ফিরে আসেন সিনেমায়। খুব দ্রুত জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে যান।

তবে গত কয়েক বছর ধরে সিনেমার চেয়ে গ্লেনের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েই বেশি লিখছে পত্রিকাগুলো, টিভি মিডিয়াগুলোতে আলোচনা হচ্ছে। ছবি বানানোও কমে গেছে তাঁর। অভিনয়ের বদলে বেশির ভাগ সময় ইয়টে করে ঘুরে বেড়ান সাগরে সাগরে। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের আড্ডাখানা—এই প্রবাদটা প্রমাণ করতেই যেন ঝামেলাও পাকাচ্ছেন আগের চেয়ে অনেক বেশি। আজকাল ওঁকে নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে মাঝে মাঝেই। লণ্ডনের স্যালুনে মারামারি, মাতাল হয়ে ইটালিয়ান পুলিশকে পিটানো, আমেরিকায় ওল্ড ওয়াইল্ড ওয়েস্টের কায়দায় পিস্তলবাজী, এ ধরনের ঘটনা খুব বেশি বেশি ঘটাচ্ছেন ইদানীং। লোকে বলতে আরম্ভ করেছে, বুড়ো বয়েসে ভীমরতি ধরেছে তাঁর।

মদের ঘোরে একটা সত্যি ঘটনা ফাঁস করে দিয়েছেন তিনি রানার কাছে—ওর অভিনয় জীবনের প্রায় ইতি ঘটতে চলেছে, ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়ে গেছে, অল্প বাজেটের একটা ফরাসি ছবিতে অভিনয়ের চুক্তি ছাড়া আর কোন কাজও নেই হাতে। গত দুই বছর কোন কাজ পাননি।

'একেবারে সময়মত এলে,' তীরে দাঁড়িয়ে রানাকে বললেন তিনি। এস্কিমোদের দেখালেন, 'এই ছেলেগুলো আমার জন্যে একটা ভালুকের খবর নিয়ে এসেছে।'

উইনচেস্টারটা কাঁধে ঝুলিয়ে লাফ দিয়ে তীরে নামল রানা। 'ভালুকটা ছোট হলেই খুশি হই।'

ভ্রূকুটি করল গ্লেন। ইঙ্গিতে উইনচেস্টারটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওটা এনেছ কেন?'

'আত্মরক্ষার জন্যে,' জবাব দিল রানা। 'কাউকে বিপদে ফেলার জন্যে একা আপনিই যথেষ্ট। তার ওপর যদি আরেকটা বড় মেরু ভালুক থাকে, রাইফেল ছাড়া উপায় আছে?'

কাইয়াকের পাশে ভেজা বালিতে ফেলে রাখা হারপুনের স্তূপ থেকে একটা হারপুন টেনে নিলেন গ্লেন। ছুঁড়ে মারার ভঙ্গি করে বললেন, 'মেরু ভালুক মারতে একজন পুরুষ মানুষের আর কী চাই?'

রাইফেল দিয়ে খুন করা যায়, কিন্তু লড়াই হয় না, কাপুরুষের মত বাঁচার চেয়ে বীরের মৃত্যু উত্তম, এ-সব লেকচার দেয়ার সুযোগ দিল না ওঁকে রানা। রাইফেলের বাঁটে চাপড় দিয়ে বলল, 'আমি ওসব বাহাদুরির মধ্যে নেই। ভালুককে একশো গজের মধ্যে আসতে দেখলেই পুরো ম্যাগাজিন খালি করে ফেলব। ওদের গায়ের গন্ধ সহ্য হয় না আমার।'

হো হো করে হাসলেন গ্লেন। প্রচণ্ড এক থাপ্পড় মারলেন রানার পিঠে। 'এসো, আগে গলায় খানিকটা ঢেলে নাও। গা গরম হবে।'

'আমার গা গরমই আছে। তার জন্যে মদ খেতে হবে না।'

'তোমার ইচ্ছে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে আগুনের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন গ্লেন।

অনুসরণ করল রানা। আগুনের কাছে এসে গ্লেনের পাশে বসল।

একটা প্রায় খালি হয়ে আসা বোতলের মুখ খুলে টিনের কাপে মদ ঢাললেন গ্লেন। নির্বিকার ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে নারকোয়াসিট গাঁয়ের শিকারিরা। পায়ের কাছে পড়ে থাকা কুকুরগুলোরও ওদের মনিবদের মতই নিরাসক্ত ভাব।

বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল গ্লেন। 'কাণ্ড দেখো ব্যাটাদের, কেমন ঠাণ্ডা মেরে আছে। অথচ এখানে আনতে কত টাকা ঘুষ দিয়েছি জানো?' খানিকটা উইস্কি গলায় ঢাললেন তিনি। 'অবশ্য এ ছাড়া আর কী-ই বা আশা করা যায় ওদের কাছে? পরনে দেখো, দোকান থেকে কেনা কাপড়। একজনের পরনেও সিলের চামড়ার প্যান্ট নেই। পূর্ব-পুরুষের সমস্ত ঐতিহ্য ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে বসে আছে।' বোতলের তলানিটুকু টিনের কাপে ঢাললেন তিনি।

রানা বলল, 'আমি আপনার জন্যে একজন মেহমান নিয়ে এসেছি। একটা মেয়ে। নাম রুথ ম্যাককেইন।'

ঝটকা দিয়ে ঘুরে তাকালেন গ্লেন। বিস্ময় ফুটেছে চেহারায়। 'রুথ? এখানে? যাহ্, ঠাট্টা করছ।'

মাথা নাড়ল রানা। 'না, সত্যি। গতরাতে কোপেনহেগেন থেকে সন্দ্রেতে এসেছে।'

'কী চায়, বলেছে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'হয়তো আপনাকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছে।'

'উঁহুঁ, বাড়ি যাব না, অসুবিধে আছে,' হাসলেন গ্লেন। 'মানুষের কাছে প্রচুর দেনা। গেলেই ছেঁকে ধরবে। অকারণে ভেজালের মধ্যে গিয়ে পড়া। তারচেয়ে গ্রীনল্যাণ্ডেই ভাল আছি আমি।' রানার দিকে কাত হলেন তিনি, মাতালের মত টলে পড়া ভঙ্গি। 'তোমাকে আমি সব বলব গোপনে—বুঝলে, গোপনে।'

'মেয়েটা আপনার জন্যে কোনও মেসেজও তো নিয়ে আসতে পারে।'

'হুঁ!' উজ্জ্বল হলো গ্লেনের মুখ। 'এটা অবশ্য ভাবিনি।'

চিৎকার শোনা গেল সৈকতের দিক থেকে। মুখ ফিরিয়ে রানা দেখল, উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে ওদের দিকে ছুটে আসছে একজন এস্কিমো।

সব ভুলে এক লাফে উঠে দাঁড়ালেন গ্লেন। হারপুন তুলে নিলেন। 'চলো, চলো!' কেউ সঙ্গে আসছে কি না দেখারও প্রয়োজন বোধ করলেন না।

উইনচেস্টারটা তুলে নিয়ে পিছনে চলল রানা। আর ওর পিছনে নারকোয়াসিট থেকে আসা শিকারিরা। কোনও কাজে যদি এস্কিমোরা আনন্দ পায়, ওদের হাসি দেখেই বোঝা যায়—কারণ সহজে হাসে না কোন এস্কিমো। এ মুহূর্তে ওদের কাউকে হাসতে দেখল না রানা। প্রাচীন পদ্ধতিতে এভাবে হারপুন দিয়ে ভালুক শিকারের ব্যাপারটা এ যুগে মোটেও পছন্দ করে না ওরা।

পাথর বিছানো সৈকতের শেষ মাথায় পৌঁছল ওরা। এর পরের অংশটা আরও খারাপ। বড় বড় পাথরের চাঙড় আর বরফের তালগোল পাকানো একটা জায়গা।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল একজন শিকারি। থমকে দাঁড়াল বাকিরা।

উত্তেজিত হয়ে একসঙ্গে হই-চই করে কথা শুরু করল সবাই।

রানারও চোখে পড়ল। ময়লা-হলুদ রোমে ঢাকা বিশাল একটা প্রাণী হেলেদুলে হেঁটে চলেছে সৈকতের ধার দিয়ে। একটা কুকুর চেঁচিয়ে উঠতেই থেমে গেল প্রাণীটা। ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরে তাকাল কৌতূহলী চোখে।

শ্বেত ভালুকের গায়ে গুলি লাগাতে নিশানা খুব ভাল হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। হাজার পাউণ্ড হাড্ডি-মাংসের পাহাড়ের দিকে নল সোজা করে ট্রিগার টিপে দিলেই হলো। কিন্তু যখন ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল গতিতে ছুটতে থাকে ওই ভালুক, নিশানা করা তখন সত্যি কঠিন। আর শিকারির দিকে ছুটে এলে তো কথাই নেই, ভয়ঙ্কর ব্যাপার। পাশ কাটানোর সময় থাবার একটা সামান্য আঘাতই একজন মানুষের মুখটাকে নেই করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

কিন্তু এ-সব কিছুই ভাবছেন না গ্লেন। বহু প্রতীক্ষিত জিনিসটাকে পেয়েছেন, সহজে ছাড়তে রাজি নন। উত্তেজনায় চিৎকার দিয়ে, হারপুন উঁচিয়ে ছুটলেন ভালুকের দিকে। ওঁর বয়েসী একজন মানুষের এই ক্ষিপ্রতা সত্যি অবাক করার মত।

অনেকখানি সামনে চলে গেছে কুকুরগুলো। কিন্তু ওগুলোর মালিক এস্কিমো শিকারিরা ঢিলেমি করছে। ওদের অনিচ্ছার কারণ বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। কুকুর হারানো নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই ওদের। এস্কিমোরা মেরু ভালুককে রহস্যময় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ভাবে। ওদের পৌরাণিক আর লোককাহিনিতে এই ভালুক নিয়ে অনেক অবাস্তব গল্প রয়েছে।

এস্কিমোদের অনীহা দেখে তাড়াতাড়ি কুকুরগুলোর পিছনে ছুটল রানা। পাথুরে সৈকত দৌড়ে পেরোল ভালুকটা। তারপর পানিতে ভাসমান একটা বরফের চাঙড়ে লাফিয়ে উঠল। ওটার লক্ষ্য কাছেই বরফের মাঝখানে একটা কালো গর্ত। প্রায় পিছলে গিয়ে সেই গর্তের পানিতে পড়ল ভালুকটা। পড়েই ডুব দিল। গ্লেনের পিছু নিয়ে কুকুরগুলো ছুটে গেল গর্তের দিকে। বেশ অনেকটা পিছনে রয়েছে এস্কিমো শিকারিরা।

চেঁচিয়ে সাবধান করল রানা। কিন্তু ফিরেও তাকালেন না গ্লেন। কুকুরগুলো গর্ত ঘিরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে। মুহূর্ত পরেই ঘটনাটা ঘটল। মেরু ভালুকের পুরানো কৌশল। পানির নীচ থেকে তীব্র গতিতে লাফিয়ে উঠল উপরে, দুই হাত ছড়িয়ে পুরো দেহের ভার নিয়ে বরফে পড়ল। চিড় ধরল প্রথমে পাতলা বরফে। মাকড়সার জাল দেখা দিল। ভালুকটা আবার লাফিয়ে উঠে বরফে পড়তেই বড় হলো ফাটলগুলো।

তীরের শেষ মাথায় থমকে দাঁড়িয়েছে শিকারিরা। চেঁচিয়ে ডাকছে কুকুরগুলোকে, ফিরে আসতে বলছে। দুই পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে, কুঁই-কুঁই করতে করতে ফিরে এল বেশির ভাগ কুকুর, কিন্তু ভালুকটা আক্রমণ চালালে ডিগবাজি খেয়ে পানিতে পড়ে যাওয়া তিন-চারটে কুকুর কোন সুযোগই পেল না। চোখের পলকে ওগুলোকে রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড বানিয়ে দিল ভালুকটা।

ভালুকের দশ-বারো ফুট দূর থেকে হারপুন ছুঁড়লেন গ্লেন। বরফে পা পিছলে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেলেন এক হাঁটুর উপর। হারপুন গাঁথল ভালুকের

বুকের ডান পাশে। আকাশ কাঁপানো গর্জন ছেড়ে দুই পায়ের উপর খাড়া হয়ে গেল ভালুক। এক থাবায় হারপুনের হাতল ভেঙে ফেলে দিল।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সরে আসতে চাইলেন গ্লেন। কিন্তু দেরি করে ফেলেছেন। বরফের মাঝে কালো একটা দাগ দেখা দিয়েছে, সৈকত থেকে আলাদা করে ফেলেছে ওঁকে।

বড় হলো দাগটা। মুহূর্ত পরেই কোমর পর্যন্ত তলিয়ে গেলেন গ্লেন, মরিয়া হয়ে হাত-পা ছুঁড়ে বরফ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। ভয়ঙ্কর গতিতে ওঁর দিকে ছুটে আসছে ভালুকটা। তীর থেকে তিন-চার গজ দূরে রয়েছেন গ্লেন। পানি থেকে উঠে ভালুকের আগে কোনমতেই সৈকতে পৌঁছতে পারবেন না।

আর কোন উপায় না দেখে রাইফেল তুলল রানা। মাত্র একটা গুলি করার সময় পাবে ও। গ্লেনের মাথার উপর খাড়া হয়ে আছে ভালুকটা। ট্রিগার টিপে দিল রানা। এক গুলিতেই ভালুকের খুলি উড়িয়ে দিল। ধড়াস করে আছড়ে পড়ল ভালুকটা। বরফে ছিটকে পড়ল রক্ত, মগজ। হাঁটু আর হাতে ভর করে কোনমতে এসে সৈকতে উঠলেন গ্লেন।

এতক্ষণে আগ্রহ দেখা গেল এস্কিমো শিকারিদের মাঝে। ছুটে গেল ওরা। বরফের নীচে তলিয়ে যাবার আগেই ভালুকটাকে তীরে টেনে আনতে হবে।

পশুর মত উপুড় হয়ে থেকে হাঁপাচ্ছেন গ্লেন। ওঁর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন গ্লেন। কালচে-সাদা দাড়ির ফাঁকে সাদা দাঁত অনেক বেশি সাদা দেখাল। এক হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের রক্ত মুছলেন তিনি। 'নিজের স্টান্ট সিনগুলোতে নিজেই অভিনয় করি আমি।'

'এটাও কি স্টান্ট ভেবেছিলেন?' তিক্ত শোনাল রানার গলা। 'কী নাম দেবেন ছবিটার? কিলার অভ দ্য নর্থ?'

'সাথে একটা ক্যামেরা থাকলে ভাল হতো,' রানার কথায় কান দিলেন না গ্লেন।

'ছবিটা কে তুলত?' ভুরু নাচাল রানা। 'আমি তো রাইফেল নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম।'

রানার দিকে তাকালেন না গ্লেন। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'কেউ থাকলে সাংঘাতিক কিছু শট নেয়া যেত।'

ভালুকটাকে তীরে টেনে তুলল শিকারিরা। ওদের সর্দার ভালুকের গা থেকে ভাঙা হারপুনের ফলাটা টেনে বের করল। এগিয়ে এল রানার দিকে। এস্কিমো ভাষায় কিছু বলল। সেটা গ্লেনকে অনুবাদ করে শোনাল রানা, 'ও বলছে, আইনত ভালুকটার দাবিদার এখন আপনি।'

'বুঝল কী করে বলদটা?'

'ফুসফুস ফুটো করে দিয়েছে আপনার হারপুন। গুলি না করলেও মারা যেত ভালুকটা, তবে দেরিতে।'

'বড়ই সুসংবাদ। এখন থেকে তুমি আর আমি এ ধরনের কাজ একসঙ্গে চালাতে পারব আশা করি।'

'আজকেই শেষ। আমি আর এই পাগলামির মধ্যে নেই। ওরা জানতে চাইছে,

চামড়াটা চান কি না।'

'কী করব? গুলি লেগে মাথাটাই নষ্ট হয়ে গেছে। সৌন্দর্যহীন। ওদের বলো, ওরাই নিয়ে যাক।'

সর্দারের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। আনন্দে উজ্জ্বল হলো লোকটার মুখ। শিশুর মত উল্লসিত হয়ে নিজের লোকদের ডাকল ও।

হাতে হাত ধরে ভালুকটাকে ঘিরে চক্র তৈরি করল শিকারিরা। তারপর গান ধরল। নেচে নেচে গাইছে। শব্দ শুনে মনে হচ্ছে শবদেহ ঘিরে বিলাপ করছে ওরা।

'কী করছে?' গ্লেন জিজ্ঞেস করলেন রানাকে।

'ভালুকটাকে খুন করার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে ওটার কাছে।'

পিছনে মাথা হেলিয়ে দিয়ে হা-হা করে হাসলেন গ্লেন। হাসির শব্দ প্রতিধ্বনি তুলে বয়ে গেল বরফের উপর দিয়ে। 'কত ধরনের মানুষ যে থাকে। ভালুকের জন্যে মায়া, নাকি ভালুকের প্রেতাত্মা এসে ঘাড় মটকাবে, সেই ভয়ে এমন করছে? যাকগে, চলো পালাই। ওদের কাণ্ডকারখানা বেশিক্ষণ দেখলে পাগল হয়ে যাব। ভিজে কাপড়ে ঠাণ্ডাও লাগছে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে সৈকত ধরে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি।

ওয়েইলবোটে উঠেই পিছনের লকারে একটা কম্বলের খোঁজে জিনিসপত্র ওলট-পালট শুরু করলেন গ্লেন। রানা বোটে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে দিতে কম্বল বের করে গায়ে জড়িয়ে ফেললেন। এক হাতে ছোট সাইজের একটা উইস্কির বোতল। দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিপি খুললেন।

'উহ্, কেন যে এত ছোট বোতল বানায়!' বোতলটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। 'খাবে নাকি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না।'

ইতিমধ্যেই কতটা উইস্কি পেটে ঢুকিয়েছেন তিনি, জানে না রানা। তবে একটা জিনিস বুঝতে পারছে, গিলতে গিলতে শীঘ্রি এমন একটা পর্যায়ে চলে যাবেন গ্লেন, যখন কেন এসেছেন, কোথায় আছেন, কিছুই আর মনে করতে পারবেন না। এ-সব সময়ে খুব ভাল মানুষও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। থামানো দরকার। কিন্তু কীভাবে থামাবে, বুঝতে পারছে না রানা।

বোতলে লম্বা চুমুক দিলেন তিনি। মুখ বাঁকালেন। বোতলের লেবেল দেখলেন। 'গ্লেন ফারগাস মল্ট উইস্কি। কত উইস্কি খেলাম জীবনে, কিন্তু এ রকম নাম তো আর শুনিনি।'

'এখানকার স্থানীয় জিনিস। সবচেয়ে ভাল।'

'ভাল না কচু। পুরানো দস্তা গুলে ঢেলে দিয়েছে নাকি কে জানে। এত বিস্বাদ!' বিস্বাদ হওয়াতে যে খাওয়া বন্ধ করে দেবেন, তা দিলেন না।

প্যাক-আইসের ফাঁক-ফোকর দিয়ে ওয়েইলবোট চালাল রানা।

গলুইয়ের কাছে গিয়ে বসলেন গ্লেন। গায়ে কম্বল জড়ানো। জড়সড় হয়ে আছেন। বুকের কাছে চেপে ধরেছেন বোতলটা। তাকিয়ে আছেন আইস-ক্যাপের ওপাশে পর্বতের দিকে।

একটা বরফের টিলার পাশ কাটাল রানা, সবুজ কাঁচের মত লাগছে বিশাল বরফের টুকরোটা।

'রুথ...দারুণ মেয়ে, তাই না?' রানার দিকে তাকালেন না গ্লেন।

'হুঁ।'

'শুধু হুঁ? ওকে তো তুমি চেনো না। ওর সম্পর্কে এমন সব কথা বলতে পারি, ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে যাবে তোমার। সিনেমায় প্রথম বড় সুযোগটা কিন্তু আমিই দিয়েছি ওকে, জানো?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'প্লেনে আসতে আসতে আমাকে বলেছে ও। ইটালিতে নাকি আপনি একটা যুদ্ধের ছবি বানাচ্ছিলেন তখন।'

শব্দ করে হাসলেন গ্লেন। হাসির দমকে দুলে দুলে উঠছেন। কামড় বসাতে শুরু করেছে মদ। 'জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল ওটা আমার। প্রডিউস্‌ড অ্যাণ্ড ডিরেক্টেড বাই গ্লেন রিভোল্টার। ওই ছবিটা বানিয়ে ফতুর হয়েছি। এখন হলে বানাতাম না। আসলে বয়েস না হলে মানুষের অভিজ্ঞতা বাড়ে না।'

'এতটাই খারাপ?'

হাসি থামাতে পারছেন না গ্লেন। 'একবাক্স পুরনো পচা ডিম থেকেও এত দুর্গন্ধ বেরোয় না।'

'রুথের ব্যাপারটা কী?'

'না না, ও ঠিকই ছিল, ওর কোন দোষ নেই,' শ্রাগ করল গ্লেন। 'বড় অভিনেত্রী নয়, ব্রিজিত বার্দো কিংবা সোফিয়া লোরেনের মত ট্যালেন্ট নেই, তবে খারাপ বলা যাবে না।' বোতলে মুখ লাগিয়ে আবার লম্বা চুমুক দিলেন তিনি। 'ওই মেয়েটাকে ওঠানোর জন্যে যা যা করা দরকার, সব করেছি আমি, যতটা সম্ভব। কাপড়-চোপড় কিনে দেয়া, সঙ্গে নিয়ে বেড়ানো, সিনেমার উপযুক্ত একটা নতুন নাম দেয়া—চোখে পড়ার জন্যে যা যা দরকার সবই করেছি।'

ভ্রূকুটি করল রানা। 'তারমানে রুথ ম্যাককেইন ওর আসল নাম নয়?'

'ধুর, আসল নামে কি আর দর্শক খুশি হয়? অভিনয় করতে গেলে সবারই একটা গালভরা নাম দরকার হয়, তাই না? আমিও গ্লেন রিভোল্টার নই। আমেরিকার উইসকনসিনের টিলম্যান ফল থেকে যখন বেরিয়েছিলাম, তখন আমার বাপের দেয়া নাম ছিল হ্যারি পিটারসন। রুথের সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয় আমার, ওর নাম ছিল ক্যারোলিন ফক্স।'

'তারমানে ও ইসরায়েলি নয়?'

'পুরোটাই বানানো, পত্রিকায় ছেপে মানুষকে বিমোহিত করার জন্যে। ইসরায়েলি শুনতে ভাল ল্যাগে, দর্শকরা পছন্দ করে। কেন, ওরাই জানে। রুথ নামটাও ক্লিক করে গেল। যা আমি চেয়েছিলাম। প্রচুর মানসিক জটিলতা আছে ওর। লণ্ডনের মাইল এণ্ড রোডের এক কানাগলিতে একটা দরজির দোকান আছে ওর বাবার। জায়গাটার নাম শুনেছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। হো-হো করে হেসে উঠতে গিয়েও উঠল না। 'অদ্ভুত এক মজার জগৎ আপনাদের, গ্লেন। কখনও ভেবে দেখেছেন?'

'গত তিপ্পান্ন বছর ধরে প্রতিদিন ভেবেছি,' হাসলেন গ্লেন। 'পঁয়তাল্লিশ বার

ত্রিকায় সাক্ষাৎকার দেয়ার সময় এ-কথা স্বীকার করেছি।' তারপর হঠাৎ করেই মেজাজের পরিবর্তন ঘটল ওঁর। অস্থির ভঙ্গিতে গায়ের উপর আরও টেনে দিলেন কম্বলটা। 'ভাবছি, রুথ কি আমার জন্যে কোন সুসংবাদ নিয়ে এল?'

'যেমন?'

'যেমন, একটা চিঠি...বা কোন মেসেজ।' কণ্ঠের উদ্বেগ চাপা দিতে পারলেন না গ্লেন।

মাথা নাড়ল রানা। 'জানি না।'

মাথা ঝাঁকালেন গ্লেন। 'তা ঠিক। তুমি জানবে কী করে? আর তোমাকে বলতেই বা যাবে কেন ও?' বোতলটা উঁচু করে মুখের কাছে নিয়ে গেলেন তিনি আবার।

পরিষ্কার নীল আকাশ। চমৎকার রোদ। তারপরেও পানি ছুঁয়ে আসা বাতাস যথেষ্ট ঠাণ্ডা। গ্লেনের হাতটা কাঁপতে দেখল রানা। শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছেন বোতলটাকে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ একভাবে বসে রইলেন গ্লেন। তারপর হঠাৎ করেই হেসে উঠলেন। 'আরেকটু হলেই গেছিলাম আজ, ভালুকটা মারতে গিয়ে। কী মৃত্যু! সত্যিকারের বি-পিকচার। ভালই জমেছিল, যা-ই বলো।'

এই প্রথম যেন ওঁর মাঝে বয়েসের ছাপ লক্ষ করল রানা।

বোতলে আবার লম্বা চুমুক দিলেন তিনি। এক চুমুকে ভিতরের তরল পদার্থ অর্ধেকে নামিয়ে এনে হা-হা করে হাসলেন। কর্কশ, রুক্ষ শোনাল হাসিটা। 'আরনস্ট হেমিংওয়েয়ের একটা কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, মরলে মানুষের মত মরো। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মুখে থুতু দিয়ে হাসতে হাসতে চলে যাও।' ঝটকা দিয়ে মুখ ফেরালেন তিনি। নেশা বাড়ছে ক্রমেই। আগ্রাসী হয়ে উঠছেন। 'তোমার কী মনে হয়, রানা? জীবন আর মৃত্যুর ব্যাপারে তোমার কী ধারণা? নাকি কোন মন্তব্য করতে চাও না?'

'মৃত্যুর কথা যদি বলেন, জীবনে বহু মানুষকে মরতে দেখেছি আমি,' রানা বলল। 'ভয়ঙ্কর, কুৎসিত, যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু। আবার বীরের মতও মরতে দেখেছি আমি মানুষকে। তবে আমার মতে, যে কোন মৃত্যুর চেয়ে জীবন ভাল।'

'তোমার কাছে ভাল।' গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন গ্লেন। চোখে অদ্ভুত আভা। শুকনো গলায় বললেন, 'কিন্তু কিছুই যদি তোমার অবশিষ্ট না থাকে, তখন?'

সামনে ঝুঁকলেন তিনি। চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ল দাড়ি বেয়ে। কর্কশকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তখন কী বলবে?'

জবাব দিল না রানা। গ্লেনের শান্ত, মরিয়া দৃষ্টিটাকে স্বাভাবিক করার জন্য কোন কথা খুঁজে পেল না ও।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নৌকার পাটাতনে ঝুঁকে বসে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন গ্লেন, তারপর ঝটকা দিয়ে ঘুরে বোতলটা ছুঁড়ে মারলেন সবুজ বরফের টিলায়। নিচু একটা ঢালে বাড়ি খেল বোতলটা, রোদ লেগে ঝিক করে উঠল একবার, তারপর হারিয়ে গেল বরফের মাঝে। বোতলটাকে যেন গিলে নিল বরফ।

চার

আইসবার্গের দিকে এগোচ্ছে ওয়েইলবোট। হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে এল হেনরি ও রুথ। রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল।

হাত নাড়লেন গ্লেন।

হাত নেড়েই জবাব দিল রুথ।

'রুথ, ডিয়ার, কেমন আছো?' ইয়টের পাশে বোট ভিড়তে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন গ্লেন।

দড়ির এক মাথা হেনরির দিকে ছুঁড়ে দিল রানা।

মই বেয়ে দ্রুত উঠে গেলেন গ্লেন। স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে রেলিং টপকালেন। রানা যখন ডেকে উঠল, রুথ তখন গ্লেনের গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ, ওঁর বিশাল দেহের তুলনায় ক্ষুদ্র লাগছে ওকে।

আবার মেজাজের পরিবর্তন হয়েছে রুথের। চোখ চকচক করছে। গালে যেন লাল আগুনের ছোঁয়া। অদ্ভুত প্রাণবন্ত লাগছে ওকে।

দুই হাতে রুথকে শিশুর মত তুলে ধরলেন গ্লেন। গালে চুমু খেলেন। তারপর নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'নীচে চলো। গলা ভেজাতে ভেজাতে ওদিককার সব খবর শুনব।'

কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে চলে যাচ্ছে দুজনে। তাকিয়ে আছে রানা। হেনরির কথায় যেন সম্বিত ফিরল। হেনরি বলছে, 'তা হলে থাকছে ও?'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' রানা বলল।

'কখন ফিরতে চান?'

'তাড়া নেই। তেল ভরব, শাওয়ার নেব, খাব, তার পর।'

মাথা ঝাঁকাল হেনরি। 'ওয়েদার রিপোর্ট জেনে আসি। জানাচ্ছি আপনাকে।' সন্দ্রে টাওয়ার থেকে রেডিওতে আসা আবহাওয়ার সংবাদ জানতে হুইলহাউসে ফিরে গেল ও।

ওয়েইলবোটে নামল আবার রানা। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। মুখ ঘোরাল তীরের দিকে। রুথের কথা ভাবছে। গ্লেনের সঙ্গে মেয়েটার কী সম্পর্ক? চুমু খাওয়ার অর্থ দুটো হতে পারে—এক: প্রেমিকা, দুই: পিতাপুত্রীর সম্পর্ক।

যা খুশি করে করুক, আমার কী?—ভেবে, ভাবনাগুলো মন থেকে দূর করে দিল ও। নিজের কাজে মন দিল।

কিছুক্ষণ পর আবার ইয়টে ফিরে এসে গ্লেন কিংবা রুথের ছায়াও দেখল না রানা। নীচে সোজা কেবিনের দিকে এগোল ও, এখানে এলে যে কেবিনটা ব্যবহার করে। খোলা সৈকতে বাতাস বেড়েছে, সেইসঙ্গে বেড়েছে ঠাণ্ডা। হি-হি কাঁপুনি তুলে দেয়। কাজ করতে কষ্ট হয়। ঠাণ্ডা যেন মজ্জায় ঢুকে গেছে। সেটা দূর করতে গরম পানির

শাওয়ার নেয়া দরকার। পনেরো মিনিট পর গরম হলো শরীর। গা মুছে, পোশাক পরে, মেইন স্যালুনে চলল ও।

বারের কাছে বসে থাকতে দেখা গেল গ্লেনকে। মন দিয়ে একটা চিঠি পড়ছেন। হালকা ভ্রূকুটিতে কুঁচকে আছে মুখ। এখনও পোশাক বদল করেননি। ওয়েইলবোট থেকে নেয়া সেই কম্বলটা পড়ে আছে পায়ের নীচে, উঁচু যে টুলটাতে বসেছেন, সেটার পায়া ঘেঁষে। গা থেকে ওটা খসে পড়ার পর যেন ভুলেই গেছেন, তোলার কথা আর মনে হয়নি।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দ্বিধা করল রানা। মুখ তুলে বারের পিছনে লাগানো আয়নায় ওকে দেখতে পেয়ে ফিরে তাকালেন গ্লেন, 'রানা, এসো।'

'চিঠি তা হলে পেলেন,' রানা বলল।

'চিঠি?' শূন্য দৃষ্টিতে একটা মুহূর্ত রানার দিকে তাকিয়ে রইলেন গ্লেন, যেন ও কী বলছে বুঝতে পারছেন না।

'রক সিনাত্রার কাছ থেকে আপনার নামে যে চিঠিটা আসার কথা ছিল,' মনে করিয়ে দিল রানা।

'ও, এটা?' চিঠিটা ভাঁজ করে খামে ঢোকালেন গ্লেন। 'হ্যাঁ, হাতে হাতে দিতে এনেছে রুথ।'

'আশা করি খারাপ খবর নেই।'

'না...কাজগুলো সারতে আরও দেরি হবে, সেটাই জানিয়েছে।' খামটা পকেটে রেখে বোতল নেয়ার জন্য বারের দিকে হাত বাড়ালেন গ্লেন। 'এখন আমাকে বলো, রানা, শীত শুরু হতে আর কত দেরি? বরফ জমে ঝামেলা সৃষ্টি করতে আর কতদিন?'

'এই ডিস্কোতে?'

'না। পুরো উপকূল জুড়ে।'

'সেটা নির্ভর করে অনেক কিছুর ওপর,' শ্রাগ করল রানা। 'একেক বছর একেক রকম অবস্থা হয়। তবে মোটামুটি সেপ্টেম্বরের শেষ ধরে নিতে পারেন।'

অবাক মনে হলো গ্লেনকে। 'তারমানে আরও ছয়-সাত হপ্তা সময় পাব। তোমার হিসেব ঠিক আছে তো?'

'না থাকার কোন কারণ নেই...গ্রীনল্যাণ্ডে আমি নতুন নই। এর আগেও বেশ কয়েকবার এসেছি। বছরের সবচেয়ে ভাল সময় হলো আগস্ট আর সেপ্টেম্বর। তুলনামূলকভাবে তাপমাত্রা বেশি থাকে, প্যাক-আইসের ঝামেলা অনেক কম।'

'যাক, ভাল খবর শোনালে,' গ্লেন বললেন। 'রক জানিয়েছে, সেপ্টেম্বরের শেষে তৈরি হবে ওরা।'

'তারমানে ততদিন আপনি নিরাপদ, এখানে ওদের ঝামেলা পোহাতে হবে না।'

'না। আবার যখন কাজ করতে যাব, ওরাও খাঁড়া নিয়ে ছুটে আসবে, যত তাড়াতাড়ি পারে কোপ মেরে আমার কল্লাটা নামিয়ে দেয়ার জন্যে।' আবার সেই পুরানো হাসিখুশি মেজাজে ফিরে এসেছেন গ্লেন। উঠে বারের পিছনে গিয়ে গ্লাস নিয়ে তাতে মদ ঢাললেন। 'আজ রাতেই তো ফিরে যাচ্ছ তুমি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'না গিয়ে উপায় নেই। কালকে দুটো চার্টার ট্রিপ আছে আমার। ফিরে এসে আরও পাব।'

'তুমি না গেলেই খুশি হতাম। ডিনারে থাকতে পারবে তো?'

'তা পারব।'

'গুড। প্রথমে তোমার কাজটা সেরে নিই। তারপর শাওয়ার নিতে যাব। কত হয়েছে?'

'সব মিলিয়ে সাতশো পঞ্চাশ।'

বারের নীচের ছোট একটা আলমারি খুলে কালো রঙের একটা ক্যাশ বাক্স বের করলেন গ্লেন। সব সময় প্রতিটি পাই পয়সা নগদে মিটিয়ে দেন তিনি, ব্যাপারটা কেমন আজবই লাগে রানার কাছে। গ্লেনের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয়, পৃথিবীর যেখানেই গেছেন, সেখানেই ওঁর কাছে টাকা পায় মানুষ, একমাত্র গ্রীনল্যাণ্ডে ছাড়া, এখানে একটা পয়সাও কেউ পায় না ওঁর কাছে। বাক্স খুলে একতাড়া নোট বের করলেন তিনি—বেশ কিছু হাজার ডলারের নোটও রয়েছে তাড়াটায়—আটটা একশো ডলারের নোট গুণে খুলে নিলেন তাড়া থেকে। রানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, 'আশা করি এতেই হয়ে যাবে।'

নোটগুলো নিয়ে ওয়ালেটে ভরে রাখল রানা।

ক্যাশ বাক্সটা আলমারিতে রেখে দিলেন গ্লেন। ইস্পাতের দরজাটা লাগিয়ে সবে সোজা হয়েছেন, এ সময় স্যালুনে ঢুকল রুথ।

বারের পিছনের দেয়ালে লাগানো আয়নার ভিতরে প্রথমে দেখল ওকে রানা। দরজায় দাঁড়ানো ওই চেহারাটা যে কোন পুরুষকে ফিরে তাকাতে বাধ্য করবে।

সোনালি সুতোয় কাজ করা যে পোশাকটা পরেছে ও, দাম হাজার ডলারের কম হবে না। খুব সুন্দরী আর স্মার্ট লাগছে এই পোশাকে। পায়ে সোনালি রঙের হাই হিল জুতো।

দুই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন গ্লেন। 'বাপরে, যা লাগছে না তোমাকে! এই ড্রেস কোথায় পেলে জানি না, কিন্তু দারুণ মানিয়েছে।'

মৃদু হাসি ফুটল রুথের মুখে। 'চমকে দিতে চেয়েছিলাম। বোঝা যাচ্ছে, সফল হয়েছি। তা চিঠিতে কী আছে? সুসংবাদ? রক কিন্তু কিছু বলেনি আমাকে।'

'আমার ঘাড়ে চাপতে আরও দেরি করবে,' শ্রাগ করল গ্লেন। 'সিনেমা কাজকর্ম এতদিনে তোমার জানা হয়ে যাবার কথা। রক ভাবছে আগামী মাসে শেষে বাড়ি পৌঁছব আমি।'

'এতদিন কী করবেন?'

'হয়তো এখানেই থাকব। এ পরিস্থিতিতে এটাই সবচেয়ে ভাল সিদ্ধান্ত হবে দারুণ সময় কাটছে আমার। এত তাড়াতাড়ি এ-সব ছেড়ে যেতে চাই না।' রানা দিকে ফিরে হাসল ও। 'তাই না, রানা?'

'তা ঠিক, সময়টা ভালই কাটছে,' রানা জবাব দিল। 'তবে প্রশ্ন হলে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টিকবেন কি না।'

মুখ টিপে হাসলেন গ্লেন। রুথকে বললেন, 'রানার কথা শুনো না, এইঞ্জেল। একটা জাত হতাশাবাদী। আমি শাওয়ার নিতে যাচ্ছি। ওকে একটা ড্রিংক বের ক

দাও, আর কিছু খাবার দাও।'

পিছনে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে গেলেন গ্লেন। রানার দিকে ঘুরল রুথ। শান্ত ভঙ্গি। দুই হাত কোমরে রাখা। পোশাকটা এমনভাবেই গায়ে লেগে আছে, দেহের কোথায় কী আছে স্পষ্ট বোঝা যায়, নগ্নই বলা চলে। জিজ্ঞেস করল, 'কী খাবেন বলুন?'

বারে কনুই রেখে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রানা। 'আর যা-ই খাই, মদ খাব না।'

'যাক, শুনে খুশি হলাম।' বারের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল রুথ। 'মত পরিবর্তন করতে অসুবিধে আছে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না, মত আমি পরিবর্তন করব না। ওরকম পোশাক পরা একজন সুন্দরী মেয়ে আশেপাশে থাকলে মাথাটা সাফ রাখা দরকার।'

'মন্তব্য? নাকি প্রশংসা?'

'সত্যি কথা। মদ ছাড়াও আপনার গুণগান করতে পারব আমি, মিস ম্যাককেইন। দিন, একটা টম্যাটো জুস দিন।'

'সত্যিই কিছু মেশাব না ওতে?'

'বললাম তো, এখন মদ খেতে ইচ্ছে করছে না। তা ছাড়া, আমার কী এক বিদঘুটে রোগ হয়েছে, স্টমাক অ্যালার্জি—ডাক্তারের নির্দেশ, আরও অন্তত ছয় মাস অ্যালকোহল স্পর্শ করা যাবে না।'

এক কোণে একটা স্টেরিও রেকর্ড প্লেয়ার রাখা। এগিয়ে গিয়ে একটা রেকর্ড হাতে নিয়ে দেখল রানা। পুরানো সিনাত্রা এলপি। বাকি যা আছে, বেশির ভাগই কোল পোর্টার, রজারস, আর হার্ট ম্যাটিরিয়াল।

প্লেয়ারে রেকর্ড চড়াল ও। সুইচ টিপল। সুরেলা কণ্ঠে বাজতে থাকল : অল দা থিংস ইউ আর।

ফিরে এসে বারে আগের জায়গায় দাঁড়াল রানা। লম্বা একটা গ্লাসে টম্যাটো জুস ঢেলে দিয়েছে রুথ। বরফ-শীতল। ফ্রিজ থেকে বের করা। চুমুক দিল রানা। স্বাদটা ভাল। ও আধ গ্লাস খেয়ে ফেলার পর, একটা খালি গ্লাস তুলে নিল রুথ। তাতে ভোদকা ঢালল। বড় চামচ দিয়ে তাতে বরফের কুচি ফেলল। গ্লাসটা তুলে নিল চোখের সামনে।

'খুব ভাল জিনিস,' বলল ও। 'স্বাদ নেই, গন্ধ নেই, অথচ কাজটা ঠিকই করে। আবার সকালে উঠে মাথা ধরা নিয়েও বিছানা ছাড়তে হয় না।'

রানার পেটের ভিতরে আচমকা খিঁচুনি শুরু হলো। বুঝে ফেলল, কী করেছে রুথ। হাত থেকে গ্লাসটা ছেড়ে বারের কিনারা খামচে ধরল। দেখল, ধীরে ধীরে হাঁ হয়ে যাচ্ছে রুথের মুখ। চোখ বড় বড়।

'কী হয়েছে?' বলল ও। 'কি হলো আপনার?'

বিশ্রী স্বাদটা গলা বেয়ে উঠে আসছে রানার মুখে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দিল দরজার দিকে। কম্প্যানিয়নওয়ের মাঝামাঝি এসে পা পিছলাল ওর। উপুড় হয়ে পড়তে পড়তেও সামলে নিল। রুথকে ওর নাম ধরে ডাকতে শুনল। বমিটা বেরিয়ে আসার আগে কোনমতে রেলিঙের পাশে এসে দাঁড়াল। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ঘাম বেরিয়ে এসেছে কপালে, ভীষণ অসুস্থ লাগছে। আগুন হয়ে ওঠা গালে লাগছে

বিকেলের ঠাণ্ডা বাতাস।

রেলিঙের পাশে বসে বার বার দমকে দমকে বমি করল রানা। পেটে যা ছি সব বেরিয়ে গেল। এখন আর পানিও নেই। ধীরে ধীরে কমে এল পাকস্থলী খিঁচুনি। বমিও বন্ধ হলো। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল ও। ফিরে তাকিয়ে দেখল কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে রুথ। কেমন অসহায় ভঙ্গি, মুখ সাদা, আতঙ্কিত।

'টম্যাটো জুসে কী দিয়েছিলেন? ভোদকা?' দুর্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

'সরি!' প্রায় শোনাই যাচ্ছে না রুথের কথা। 'আমি আসলে কোন ক্ষতি করতে চাইনি।'

'তাই নাকি? তা হলে কাজটা করলেন কেন?' পকেট থেকে রুমাল বের কে ঠোঁট মুছল রানা। রুমালটা ছুঁড়ে ফেলল রেলিঙের উপর দিয়ে সাগরে। 'আপনাকে বললাম, ডাক্তারের বারণ, অ্যালকোহল আমার ক্ষতি করবে...'

'আমি ভাবতেও পারিনি এরকমটা হবে! সামান্য ভোদকায় যে এরক রিঅ্যাকশন... কেন...'

'আমিও ভাবতে পারিনি, বারণ করার পরেও আপনি এই কাজটা করবেন কিছুদিন আগে একটা ভুল ইঞ্জেকশন পড়ায় মরতে মরতে বেঁচেছিলাম, আর আ মারা পড়ছিলাম আপনার সদিচ্ছার কারণে।'

মোসাদের পুশ করা ওই বিষের ক্রিয়া শরীর থেকে দূর হতে আরও ছয় মা সময় লাগবে। অ্যাভার্শন থেরাপি তো দিতেই হয়েছে, সেই সঙ্গে দুটো ওষুধ ব্যবহার করতে হয়েছে—অ্যাপোমরফিন আর অ্যান্টাবাস। এখন যে-কোন ধরনে অ্যালকহল পেটে পড়লেই উল্টে বেরিয়ে আসতে চায় পাকস্থলী।

'আমি দুঃখিত,' রুথ বলল। 'সত্যিই দুঃখিত, বিশ্বাস করুন।'

'ঠিক আছে, ক্যারোলিন,' ইচ্ছে করেই রুথের আসল নামটা বলল রানা 'আপনি তো আর জানতেন না। আমিও বলিনি আপনাকে। অ্যারগামাশে কুয়াশা মধ্যে কত কথা বললাম, কিন্তু এটা বলিনি। আসলে কেউই তার নিজের সব কথ অন্য কাউকে জানায় না, কিছু কথা গোপন রাখে।'

রানার মুখে নিজের আসল নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে যেন পাথরে মূর্তি হয়ে গেছে মেয়েটা। হঠাৎ করেই নিজের উপর রাগ হলো রানার, কেন বলতে গেল নামটা? মদ খাইয়ে ওকে কষ্ট দেয়ার জন্যই বোধহয় রেগে গিয়েছিল ও মেজাজ ঠিক রাখতে না পারায় এখন আফসোস হচ্ছে।

রুথের হাত ধরল ও। 'সরি।'

হ্যাঁচকা টানে হাতটা ছাড়িয়ে নিল রুথ। চোখে পানি। চড় মারতে হাত তুলে রানার পিছন দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। তারপর ঘু দাঁড়িয়ে ছুটে চলে গে কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে। রুথের গায়ের জোর অবাক করল রানাকে।

পিছন থেকে বলে উঠল গ্লেন, 'কী ব্যাপার, তোমরা কি ঝগড়া করছ নাকি?'

'নাহ্, সামান্য ভুল বোঝাবুঝি,' জবাব দিল রানা।

'রুথকে কোন প্রস্তাব দিয়েছিলে নাকি তুমি?'

হেসে উঠল রানা। 'কী প্রস্তাব দেব? আমাকে কি ওরকম লোক বলে মনে হয়?'

'কিন্তু ও কাঁদছে, রানা—ওকে এভাবে কোনদিন কাঁদতে দেখিনি আমি।'

ভ্রূকুটি করল রানা। রুথের কান্নাভেজা মুখ কল্পনা করতেও কষ্ট হলো। অ্যারমাস্কে কুয়াশার মধ্যে দেখা সেই মেয়েটা হয়তো কাঁদতে পারে, কিন্তু রুথ ম্যাককেইন নয়।

'গ্লেন, আমি যদি ওকে দুঃখ দিয়ে থাকি, সেটা ওর পাওনা ছিল,' রানা বলল।

হাত তুলল গ্লেন। 'থাক, বাদ দাও ওসব কথা। দেখি গিয়ে, কী হলো। ওর সমস্যাটা কোনখানে।'

কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে চলে গেলেন গ্লেন। হুইলহাউসের দরজা খুলে বেরিয়ে এল হেনরি। নির্বিকার চেহারা। কিন্তু রানা জানে, সবই দেখেছে ও।

'আপনার আবহাওয়ার রিপোর্ট নিয়ে এলাম, মিস্টার রানা। আগামী দু'ঘণ্টা ভালই থাকবে। তবে আইস-ক্যাপ থেকে বাতাস আসছে। ভারী বৃষ্টিপাত, সেইসঙ্গে ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। এখুনি রওনা হলে ঝড়ের কবলে পড়বেন না।'

ইয়ট থেকে পালানোর একটা সুযোগ পেয়ে যেন বেঁচে গেল রানা। 'তা হলে যাই আমি। এখন আর গ্লেনকে বিরক্ত করে লাভ নেই। এমনিতেই নিশ্চয় মহা ঝামেলায় আছেন বেচারা। ওঁকে বলবেন, আগামী হপ্তায় দেখা হবে। এর আগেই যদি মেয়েটাকে নিয়ে যেতে বলেন, আমাকে রেডিওতে কল করবেন।'

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল হেনরি। 'ওয়েইলবোটটা রেডি করে দিচ্ছি আপনাকে।'

নীচ থেকে ওর জিনিসপত্রগুলো নিয়ে এসে রানা দেখল ওকে তীরে নামিয়ে দিয়ে আসার জন্য দাঁড়িয়ে আছে একজন নাবিক।

রানাকে নামিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের দিকে বোটের মুখ ঘুরিয়ে রওনা হয়ে গেল লোকটা।

প্লেনে উঠল রানা। রুটিন চেক সেরে নিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। অটারটাকে নামিয়ে আনল সাগরে। চাকা তুলে নিয়ে ট্যাক্সিইং করে এগোল বাতাসের অনুকূলে। গতি বাড়ানোর আগে চওড়া জানালা দিয়ে মুখ বের করে ঝুঁকে দেখল পানিতে ভাসমান বরফের চাঙড় আছে কি না।

আইসবার্গের একশো গজ দূরে রয়েছে, ঘুরতে যাবে, এ সময় ওয়েইলবোটটাকে ওর দিকে ছুটে আসতে দেখল। সামনের গলুইয়ে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে হাত নাড়ছেন গ্লেন। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে পাশের দরজাটা খুলল রানা। প্লেনের পাশে এসে থামল ওয়েইলবোট। একটা ক্যানভাসের হোল্ডঅল ওর দিকে ছুঁড়ে দিলেন গ্লেন। তারপর প্লেনের একটা ফ্লোটে পা রেখে দরজার কিনার ধরে নিজেকে টেনে তুললেন কেবিনে।

'হঠাৎ করেই শহুরে জীবন দেখার জন্যে মনটা অস্থির হয়ে উঠল,' বললেন তিনি। 'নিতে কোন আপত্তি আছে?'

'আপত্তি কীসের?' হেসে বলল রানা। 'জো হুকুম, মহারাজ! তবে তাড়াতাড়ি পালাতে হবে আমাদের। ঝড় আসার আগেই পৌঁছে যেতে হবে ফ্রেডেরিকসবর্গে।'

পিছিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে ততক্ষণে ওয়েইলবোট। জাহাজের দিকে মুখ করে ঘুরে গেল। দেরি না করে স্টার্টার সুইচ টিপল রানা। প্লেনের নাক ঘুরিয়ে পানিতে ট্যাক্সিইং করে ছুটতে শুরু করল। ত্রিশ সেকেণ্ড পর আকাশে ভাসল প্লেন।

কোনাকুনি উপরে উঠছে দ্রুত। আইসবার্গের উপর দিয়ে পেরিয়ে এল। কম্প্যানিয়নওয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখল রুথকে। মুখ তুলে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

'কী অবস্থা ওর?' জানতে চাইল রানা।

শ্রাগ করল গ্লেন। 'ঠিক হয়ে যাবে। হেনরিকে আজ রাতেই রওনা হতে বলে এসেছি। কাল বিকেল নাগাদ ফ্রেডেরিকসবর্গে পৌঁছে যাবে।'

তারপর আসল কাজ শুরু করলেন গ্লেন, হিপ পকেট থেকে ছোট একটা ফ্লাস্ক বের করলেন। মুখ খুলে চুমুক দিয়ে হাসতে শুরু করলেন। 'তুমি ওকে কী বলেছ, জানি না, তবে কেবিনে ঢুকে দেখি গোখরো সাপের মত ফুঁসছে।'

'আমি ভেবেছিলাম আপনি জাহাজে থেকে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করবেন,' তিক্তকণ্ঠে বলল রানা।

'কিছু বলে শান্ত করা যাবে না। সময় গেলে আপনাআপনি শান্ত হয়ে আসবে। ওর সঙ্গে লড়াই করার বয়েস আর নেই আমার, অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। ও নিজে নিজে শান্ত হয়ে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

'এখানে কেন এসেছে, সেটা কি জানেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'শুধু ওই চিঠিটা দিতে এসেছে, এ কথা বলে বিশ্বাস করাতে পারবেন না আমাকে। গ্রীনল্যাণ্ডেও পোস্ট অফিস আছে, চিঠিটা ডাকে ছেড়ে দিলেই হতো।'

'এসেছে, আমাকে রাজি করাতে। এবারে যে ছবিটা করব, তাতে নিশ্চয় নায়িকার চরিত্রটা চায়।' হাসলেন গ্লেন। 'আমি শিওর, সেজন্যেই এসেছে—এ ছাড়া আর তো কোন কারণ দেখছি না। ভয় নেই, কাল যখন ফ্রেডেরিকসবর্গে পৌঁছবে আইসবার্গ, মুখে মিষ্টি হাসি দেখতে পাবে।'

সিটে হেলান দিলেন তিনি। হান্টিং ক্যাপের সামনের কানাটা চোখের উপর নামিয়ে দিলেন।

চুপচাপ বসে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল রানা। দুই হাত হুইলের উপর স্থির। রুথের কথা ভাবছে। শুধু একটা ছবিতে অভিনয়ের জন্য নিজেকে বিক্রি করতে চাইছে মেয়েটা? হতেও পারে। ছবিতে অভিনয়ের সুযোগের জন্য কত মানুষ কত কী করে!

হঠাৎ উইণ্ডস্ক্রিন ভিজিয়ে দিল ঝিরিঝিরি বৃষ্টির ফোঁটা। ভ্রূকুটি করল রানা। নিমিষে মন থেকে দূর হয়ে গেল সব ভাবনা। সন্দ্রে টাওয়ারের আবহাওয়াবিদরা সামান্য ভুল করে ফেলেছে, ওরা যে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে, তার আগেই আইস-ক্যাপ থেকে রওনা হয়ে গেছে ঝড়।

গতি বাড়ানোর প্রয়োজন বোধ করল ও। স্টিকটা টেনে আনল পায়ের আরও কাছে। উপরে উঠতে শুরু করল প্লেন।

পাঁচ

হোটেলের কাঁচের দরজায় আঘাত হানল বৃষ্টি মেশানো ঝোড়ো বাতাস। প্রবল আক্রোশে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল বিল্ডিংটার গায়ে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ডেস্কের দিকে এগোল রানা, সেখানে রুম বুক করতে ব্যস্ত গ্লেন।

'একেবারে সময়মত পৌঁছেছি,' ওঁকে বলল রানা।

হাসলেন গ্লেন। 'আমার আউটডোর অ্যাডভেঞ্চারের সর্বনাশ করল আরকী। যাকগে। আমার সঙ্গে ডিনার খাবে?'

'কয়েকটা টুকিটাকি কাজ আছে। আধঘণ্টার মধ্যেই আসছি।'

দোতলায় যাওয়ার জন্য সিঁড়ির দিকে এগোল গ্লেন।

ফোনের রিসিভার তুলে নিল রানা। এয়ার-স্ট্রিপে ফোন করে জেনে নিল ওর কোনও মেসেজ আছে কি না। একটা মেসেজ আছে—আগামী দিন বাড়তি একটা ভাড়ার কাজ। তেমন্ বড় কিছু না। ক্যানিং ফ্যাক্টরির জন্য কিছু যন্ত্রাংশ আনতে চল্লিশ মাইল দূরের ইনটুস্কে যেতে হবে। ফ্লাইট টাইম চেক করল ও, কাগজে লিখে নিল, তারপর রিসিভার রেখে ঘুরে দাঁড়াল।

'মিস্টার রানা!'

ডাক শুনে ফিরে তাকাল ও। অফিস থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরোতে দেখল রিসেপশনিস্টকে।

'আপনার চিঠি ফেলে যাচ্ছেন,' মেয়েটা বলল। দুটো চিঠি বাড়িয়ে দিল ও।

হাতে নিল রানা। ডাকে এসেছে। একটাতে বিল রয়েছে, খাম না ছিঁড়েও বুঝতে পারল। আরেকটার গায়ে লণ্ডনের পোস্ট অফিসের ছাপ। এ চিঠিটাও কে পাঠিয়েছে জানে রানা। গিল্টি মিয়া। তবু সন্দেহ নিরসনের জন্য খুলে দেখল। ছোট একটা মেসেজ, গিল্টি মিয়াই পাঠিয়েছে। তাতে লেখা : সিডি পেইচি। দেশের ঠিকানায় পেটিয়ে দিয়েচি। মুচকি হাসল রানা। লিখতে গিয়েও উচ্চারণ অনুসারে বানান বিকৃত করে গিল্টি মিয়া। যাই হোক, নিশ্চিন্ত হলো রানা। মেরিন সায়েন্টিস্ট ডক্টর আবেদের দেয়া ফরমুলার একটা অংশ নিরাপদেই বাংলাদেশে পৌঁছেছে। মেয়েটাকে বলল, 'থ্যাংক ইউ, ম্যাডাম।'

'একটা মেসেজও আছে,' মেয়েটা বলল। 'জনৈক মিস্টার মিচেল আপনাকে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করেছেন।'

'মিচেল?' ভ্রূকুটি করল রানা। 'নাম শুনিনি।'

'আজ বিকেলে রুম বুক করেছেন,' মেয়েটা বলল। 'আমিও ওঁকে আর কখনও দেখিনি।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে, দেখব।'

হয়তো কোনও ধনী টুরিস্ট, শিকারে যেতে চায়। প্রচুর টাকা খরচ করে এরা। লোকটাকে নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাল না ও। নিজের ঘরে ঢুকল। বিলের খামটা

টেবিলে রাখল। গিল্টি মিয়ার মেসেজটা পুড়িয়ে ফেলল। কাপড় বদলানোর প্রয়োজন মনে করল না। শুধু পারকা আর ফ্লাইং বুট খুলে নিয়ে রেইনডিয়ারের চামড়ায় তৈরি একজোড়া চটি পরল। বাইরে এসেই ডেভিড গোল্ডবার্গের সামনে পড়ল। সিঁড়ি বেয়ে করিডরে উঠে এসেছে। হাতে এক বোতল স্ন্যাপস।

'কই যাও?' জিজ্ঞেস করল রানা।

হেসে জবাব দিল ডেভিড, 'ডিটার ঘরে। আমার সম্মানে একটা সুপার পার্টি দিচ্ছে ও।'

'তোমার ঘরে কী সমস্যা?'

'আজ রাত একটা পর্যন্ত ওর ডিউটি। এতক্ষণ নিজের ঘরে বসে থাকতে পারব না।'

দু'এক গ্লাস শেষ করেই এসেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। রানার কাঁধ ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল। 'একটা দারুণ জীবন, রানা। বিশ্বাস করো, আমি যা করছি—এত আনন্দ জীবনের আর কিছুতে নেই। তবে কালকের জন্যে কিছু ফেলে রাখলে চলবে না—কাল কী হবে কেউই জানে না—তাই আজকের কাজটা আজকেই সেরে ফেলা ভাল।'

এ সময় ওর পিছনের একটা দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এল একজন মহিলা। না দেখে ঘুরতে গিয়ে মহিলার সঙ্গে ধাক্কা লাগাল ডেভিড। মহিলার হাতের হ্যাণ্ডব্যাগটা উড়ে চলে গেল। দুর্দান্ত সুন্দরী মহিলা, বয়েস তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ, রেনেসাঁ ম্যাডোনার মত তাড়া-করে-ফেরা বিষণ্ন চোখ। হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল ডেভিড। মুখে সেই চিরাচরিত মুগ্ধ ভঙ্গি ওর—সুন্দরী কোনও মহিলাকে দেখলে যা হয়। ওকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসল মহিলা। এটাও সেই হাসি, যখন কোন সুন্দরী মহিলা কোন পুরুষের মুখ দেখে বুঝে ফেলে, লোকটাকে বাঁদরের মত নাচাতে পারবে।

'সরি,' ডেভিড বলল।

এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও। হ্যাণ্ডব্যাগ তুলতে হাত বাড়াল। একই সময়ে বসতে গেল মহিলাও। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, ধরে ফেলতে বাধ্য হলো রানা।

'থ্যাংক ইউ,' রানাকে বলল মহিলা। তারপর ফিরে তাকিয়ে ডেভিডের হাত থেকে হ্যাণ্ডব্যাগটা নিল। চোখ বড় বড় করে মহিলার দিকে নির্লজ্জের মত তাকিয়ে আছে ডেভিড।

করিডর দিয়ে হেঁটে চলেছে মহিলা। পিছন থেকেও ওর কাঁধের কাঁপুনি দেখে বোঝা যায়, প্রবল চাপা হাসিতে কাঁপছে।

'কী সুন্দরী, রানা,' দম আটকে যাচ্ছে ডেভিডের। 'কী সুন্দরী!'

'সব মহিলাই তো তোমার কাছে কী সুন্দরী,' বলে নীচতলায় রওনা হলো রানা।

ডাইনিং রুমের এক কোণে একটা টেবিল দখল করে বসে থাকতে দেখল গ্লেনকে। সেদিকে এগোল রানা। ইতিমধ্যেই প্রায় ভরে এসেছে ঘরটা। বেশির ভাগকেই চেনে রানা—কারও সঙ্গে পরিচয় আছে, কেউ আবার মুখ-চেনা—তিনজন

বাদে। একজন সেই মহিলা, করিডরে যার সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়েছে ডেভিড। আর বাকি দুজন পুরুষ। সকালবেলা জানালার কাছের যে টেবিলটায় রুথ বসেছিল, ওরাও সেটাতে বসেছে। ওদের দিকে একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল রানা। গ্লেনের টেবিলের কাছে এসে উল্টোদিকে মুখোমুখি বসল।

হাসল গ্লেন। 'তোমার নজরেও তাহলে পড়েছে?'

'এ ঘরে এমন কোন পুরুষ মানুষ আছে, যার নজরে পড়বে না? মেয়েটা কে?'

'জানার সুযোগই পাইনি।'

'পাবেন। পাবেন।'

গ্লেনের হাতে এক বোতল জার্মান মদ, হক। এক প্লেট ভাজা স্যামন এনে দিল ওয়েইটার। গ্লেনের সঙ্গে সেটা ভাগ করে খেতে শুরু করল রানা। খাওয়া শেষে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে, এ সময় কাঁধে হাত পড়ল। ফিরে তাকাল রানা। সেই দুজন অচেনা লোকের একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। জানালটার দিকে তাকাল রানা। মহিলা তেমনি বসে আছে, তবে সঙ্গী অপর পুরুষ নেই।

'মিস্টার রানা? মিস্টার মাসুদ রানা?'

মাঝারি উচ্চতার মানুষ লোকটা। গাট্টাগোট্টা শরীর। থর্নপ্রুফ টুইডের তৈরি টু-পিস সুট পরেছে। দেখেই বোঝা যায়, দামি দরজির বানানো। চমৎকার ইংরেজি বলে, কিন্তু সামান্য জার্মান টান রয়েছে, সেটা এড়াতে পারেনি। পরে অবশ্য জেনেছে রানা, লোকটা অস্ট্রিয়ান।

কোন কারণ ছাড়াই দেখামাত্র ওকে অপছন্দ করল রানা। মধ্য ইয়োরোপের লোক ও, টাকমাথা, সামনের উপরের পাটির দুটো দাঁত সোনায়-বাঁধানো, বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে মস্ত একটা হীরা বসানো আংটি—তবে এ-সব কারণে যে ওকে অপছন্দ করেছে রানা, তা নয়।

উঠে দাঁড়াতে ইচ্ছে করল না ওর। 'হ্যাঁ, আমি মাসুদ রানা। কী চান?'

'আমি মিচেল—হিউগ মিচেল। এই যে আমার কার্ড।'

হাতে নিল রানা। বেশ অভিজাত চেহারার এক টুকরো কাগজ। তাতে নামের নীচের লেখা পড়ে জানা গেল লোকটা লণ্ডন অ্যাণ্ড ইউনিভার্সাল ইনশিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, লণ্ডনের বার্কলে স্কয়ারে ওর অফিস।

'এ-সব জেনে আমি কী করব, মিস্টার মিচেল?' গ্লেনকে দেখিয়ে রানা বলল, 'যাই হোক, ইনি আমার বন্ধু, গ্লেন রিভোল্টার।'

'উনি তো অতিচেনা মুখ।' হাত বাড়িয়ে দিল মিচেল। গ্লেনের হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধন্য হলাম, সার।'

জোর করে ভদ্রতা বজায় রাখলেন গ্লেন। হাত নেড়ে একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইশারা করলেন। বসল মিচেল। ওয়ালেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে টেবিলের উপর দিয়ে ঠেলে দিল রানার দিকে। 'পড়ে দেখুন, প্লিজ।'

চারদিন আগের টাইমস পত্রিকার একটা ক্লিপিং। গ্রীনল্যাণ্ড এক্সপিডিশনে নেতৃত্ব দিয়েছেন যিনি, অক্সফোর্ডের সেই প্রফেসরের সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে। গ্রীনল্যাণ্ড আইসক্যাপের পশ্চিম থেকে পুবে সফলভাবে পাড়ি দিয়ে লণ্ডনে ফিরে

সাক্ষাৎকারটা দিয়েছেন তিনি। পাড়ি দেয়ার সময় আইসক্যাপে একটা এরোপ্লেনের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেয়েছেন। একটা হিরন, ক্যানাডায় রেজিস্ট্রি করা। প্লেনের ভিতর দুটো মানুষের লাশ, শুদ্ধ করে বললে লাশের অবশিষ্টাংশ দেখেছেন বলে জানিয়েছেন। চেহারা দেখে চেনা কঠিন। কিন্তু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র আর ডকিউমেন্টারি এভিডেন্স যা উদ্ধার করা হয়েছে, সেসব দেখে জানা গেছে, দুজনেই ইংরেজ, একজনের নাম রবার্ট ক্রুজেনার, আরেকজন জেরি নিভেন। লাশগুলোকে বরফে কবর দিয়ে এসেছে ওই অভিযাত্রীরা।

পলকের জন্য মনের পর্দায় দৃশ্যটা দেখতে পেল রানা। বরফে নাক গুঁজে পড়ে আছে একটা লাল-নীল রঙ করা এরোপ্লেন। আইস-ক্যাপের চোখ ধাঁধানো আলোয় চকচক করছে দোমড়ানো ফিউজিলাজ। অতীতের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসা কোনও ভূতুড়ে প্রেতাত্মার মত যেন নীরব আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ওকে, কাছে যেতে বলছে। পুড়ল না কেন ওটা? আশ্চর্য! ট্যাংকে যে পরিমাণ তেল ছিল, তাতে তো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দপ্ করে জ্বলে ওঠার কথা।

হাত কীভাবে স্থির রাখছে, জানে না ও। মনের জোরে কাঁপুনি বন্ধ রেখেছে। ধীরে ধীরে বার বার পড়ল কাটিংটা, সময় নিচ্ছে আসলে।

'কী ভাবছেন, মিস্টার রানা?' রানার ভাবনায় কেটে বসল যেন মিচেলের প্রশ্নটা।

গ্লেনের দিকে কাটিংটা ঠেলে দিল রানা। 'ইন্টারেস্টিং। তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এ বছরের গোড়ার দিকে আরেকটা এক্সপিডিশন আরও চারশো মাইল উত্তরে একটা আমেরিকান প্লেন পড়ে থাকতে দেখেছিল, তিন বছর আগে থিউলি থেকে এসেছিল ওটা।'

'ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য। কোনও সার্চ পার্টি যায়নি?'

'সত্যি বলতে কী, প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে বরফ আর তুষারের ওই নরকে ঢোকার সাহসই কেউ করে না, কে যাবে খুঁজতে?' সামলে নিয়েছে রানা। স্বাভাবিক হয়ে গেছে কণ্ঠস্বর। 'প্রায়ই ঘটে এ রকম। আইস-ক্যাপের অনিশ্চিত আবহাওয়া এ-সব দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী। এই দেখা গেল পরিষ্কার নীল আকাশ, মিনিট পনেরো পরেই দেখা গেল প্রচণ্ড ঝড় বইছে, প্লেনের জন্যে এ ধরনের পরিস্থিতি ভয়ানক বিপজ্জনক।' মিচেলের দিকে তাকাল ও। 'কিন্তু আপনার এত আগ্রহ কেন?'

'তা তো থাকবেই, মিস্টার রানা। কারণ, ওই প্লেনের দুই আরোহীর জীবন বীমা করা ছিল আমাদের কোম্পানিতে। বছরখানেক আগে লাব্রাডরের গ্র্যান্ট বে থেকে রওনা দিয়ে হারিয়ে যায় প্লেনটা।'

'গন্তব্য কোথায় ছিল?' গ্লেন জানতে চাইলেন।

'আয়ারল্যাণ্ড।'

ভুরু উঁচু করল রানা। 'তারপর নিশ্চয় কোনও কারণে কোর্স বদল করেছিল পাইলট। কে ওড়াচ্ছিল?'

'জেরি নিভেন,' মিচেল বলল। 'বীমার শর্ত অনুযায়ী রবার্ট ক্রুজেনারের নিকটতম আত্মীয় ওর মাকে এবং জেরি নিভেনের স্ত্রী মায়া নিভেনকে আমাদের

পঁচিশ পঁচিশ মোট পঞ্চাশ হাজার ডলার দিতে হবে।'

মোলায়েম শিস দিলেন গ্লেন। 'এখন নিশ্চয় লাশ শনাক্ত করে নিশ্চিত হতে চাইছেন?'

মৃদু হাসি ফুটল মিচেলের ঠোঁটে। 'একেবারে ঠিক বলেছেন, মিস্টার রিভোল্ডার। এখন একটি প্রশ্নের জবাব জানা দরকার আমারঃ কোর্স থেকে এতটা সরে গেল কেন প্লেন।'

হাসলেন গ্লেন। বোতলের শেষ হুকটুকু গ্লাসে ঢাললেন। 'বাহ্, বেশ জমে উঠছে কাহিনিটা!'

ওঁর কথা এড়িয়ে গেল মিচেল। 'প্লেন পাওয়ার কথা পত্রিকায় পড়ে লণ্ডনের ডেনিশ এমব্যাসিতে খোঁজ নিলাম। ওরা জানাল, ওদের সিভিল এভিয়েশন থেকে প্লেনটা দেখতে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নানা কারণে দেরি হয়ে গেছে, হয়তো আগামী গ্রীষ্মের আগে আর যেতেই পারবে না। আমরা বললাম, আমরা নিজেরাই দেখতে যেতে চাই, ব্যবস্থা করে দিক। তখন ডেনমার্কের কাছ থেকে সরকারি অনুমতি নিয়ে দিল ওরা।'

'তারমানে এখনও যাননি,' রানা বলল।

হাসল মিচেল। 'এখানেই আপনার সাহায্য দরকার আমার, মিস্টার রানা। নুক-এ খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এখানে আপনিই একমাত্র অভিজ্ঞ পাইলট, যিনি আমাদেরকে ওই জায়গায় নিয়ে যেতে পারেন।' ওয়ালেট থেকে একটা টাইপ করা কাগজ বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল ও। 'সরকারের ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট।'

ছয়

বারে জনতার ভিড়, প্রায় সবাই পুরুষ হলেও ভদ্রতা বজায় রেখেছে। স্থানীয় দু'একজন ধনী ব্যক্তি, সরকারি বিল্ডিং প্রজেক্টের জন্য স্বল্পমেয়াদে কাজ করতে আসা কয়েকজন ডেনিশ ইঞ্জিনিয়ার ও সুপারভাইজার, আর উপকূলে সার্ভে করতে আসা একটা ডেনিশ নেভি কোভেটের কয়েকজন তরুণ অফিসার।

ভিড় ঠেলে এগোনোর সময় মায়া নিভেনকে দেখতে পেল রানা। সবার চোখ মহিলার উপর। আর এতে ওদেরকে দোষ দেয়া যায় না। বুদের এক কোণে বসে আছে। টেবিলে রাখা ঢাকনাওয়ালা বাতির আলোয় অসম্ভব সুন্দরী লাগছে ওকে।

রানারা কাছে যেতেই উঠে দাঁড়াল মিচেলের সহকারী। ওর সঙ্গেই প্রথম পরিচয় করাল মিচেল, 'রয় ফ্লেচার, আমার ক্লেইম ডিপার্টমেন্টের এভিয়েশন এক্সপার্ট। ভাবলাম, সাথে একজন বিশেষজ্ঞ থাকলে ভাল হয়।'

লম্বা একহারা গড়ন রয়ের। নিখুঁত করে ছাঁটা গোঁফ। একেবারে আদর্শ অবসরপ্রাপ্ত রয়াল এয়ার ফোর্সের লোক, কেবল চোখ দুটো ছাড়া। ব্লেডের মত ধারাল দৃষ্টি। কণ্ঠটা পুরুষালি নয়। রানার হাত যখন ধরল, মনে হলো, একেবারে মেয়েমানুষের হাত, এতই নরম।

এরপর মায়ার সঙ্গে রানার পরিচয় করিয়ে দিল মিচেল। 'ইনিই মিস্টার মাসুদ রানা, মিসেস নিভেন, নুক-এ যাঁর এত প্রশংসা শুনেছি। আশা করছি, ইনি আমাদেরকে সাহায্য করতে রাজি হবেন।'

'মিস্টার রানার সঙ্গে আগেই সাক্ষাৎ হয়েছে আমার, যদিও খুব নাটকীয় ভাবে,' বলে রানার হাতটা ধরল মায়া। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় ধরে রাখল। ওর কালো চোখে উদ্বেগ। আবার যখন কথা বলল, মোলায়েম, বাজনার মত কণ্ঠস্বরটা আবেগে ভরে গেল, 'গত তিন-চারটা দিন কী যে দুঃস্বপ্নের মধ্যে কেটেছে! মনে হয়েছে, সব অবাস্তব, কোন কিছুই আসল নয়।'

সামান্য নীরবতার পর গ্লেন বললেন শান্তকণ্ঠে, 'আমি যাই, রানা। পরে দেখা হবে।'

'না না, থাকুন,' তাড়াতাড়ি বাধা দিল মিচেল। মায়ার দিকে তাকাল। 'মিস্টার গ্লেন রিভোল্টার থাকলে আপনার নিশ্চয় কোন আপত্তি নেই, মিসেস নিভেন?'

অবাক বিস্ময়ে গ্লেনের দিকে তাকিয়ে রইল মায়া। 'এবার সত্যিই স্বপ্ন মনে হচ্ছে।'

আস্তে করে ওর হাত চাপড়ে দিলেন গ্লেন। 'না না, কী বলছেন—আপনার জন্যে কিছু করতে পারলে আমি খুশি হব, মিসেস নিভেন।'

রানার চেয়েও বেশি সময় ধরে গ্লেনের হাতটা ধরে রাখল মায়া।

সবাই বসলে পাশ দিয়ে যাওয়া একজন ওয়েইটারকে তুড়ি বাজিয়ে ডাকল মিচেল। কফির অর্ডার দিল। মায়াকে একটা সিগারেট দিলেন গ্লেন।

তুলোর পুরু আস্তর লাগানো দেয়ালে হেলান দিল মায়া। রানার উপর দৃষ্টি স্থির। 'কীসের জন্যে এখানে এসেছি আমরা, মিস্টার মিচেল নিশ্চয় সব বলেছেন?'

'শুধু একটা জিনিস বাদে। *আপনি* এখানে কেন, সেটা এখনও পরিষ্কার নয় আমার কাছে।'

মায়া বলল, 'আমি ভেবেছিলাম, আপনি বুঝেছেন, মিস্টার রানা। প্লেনের পাইলটের পরিচয় জানা খুবই জরুরি আমার জন্যে। ও-কী সত্যিই জেরি? এ ব্যাপারে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে।'

'ওখানে গিয়ে নিজের চোখে লাশ দেখে শনাক্ত করে?' মুচকি হাসল রানা। 'মৃত স্বামীকে দেখার জন্যে আপনার যে রকম উৎসাহ দেখছি, তাতে অবাক না হয়ে পারছি না।'

বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া ঘটল গ্লেনের মাঝে, রেগে উঠলেন, 'এত রুক্ষভাবে বলাটা তোমার ঠিক হয়নি, রানা।'

তাড়াতাড়ি গ্লেনের বাহুতে হাত রেখে ওঁকে শান্ত করতে চাইল মায়া। 'না না, রুক্ষভাবে কোথায়? ঠিকই তো বলছেন আপনার বন্ধু। লাশটা যদি আমার স্বামীর না হয়ে থাকে, আমি সত্যিই বেকায়দায় পড়ব। মিস্টার মিচেল সেটা জানেন।'

টেবিলের উপর ঝুঁকে মায়ার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন গ্লেন। 'আপনার জন্যে কিছু করতে পারলে আমি সত্যিই খুশি হতাম, মাই ডিয়ার, কিন্তু আমি নিজেই রয়েছি মহা ঝামেলায়।'

তাঁকে একটা মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে রানার দিকে ফিরল মায়া। 'আমার দুটো

ছোট্ট ছেলে আছে, মিস্টার রানা, আপনি কি তা জানেন?'

'না, কেউ বলেনি, মিসেস নিভেন।'

'তা হলে আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, মিস্টার রানা, এই ব্যাপারটাতে টাকা ছাড়াও আরও কিছু আছে—অনেক বড় কিছু। আমি শিওর হতে চাই, আমার স্বামী সত্যিই মারা গেছে কি না। আমাকে জানতেই হবে। এখন বুঝতে পারছেন?'

নরম চোখের দৃষ্টি উদ্বেগে ভরা। একটা হাত বাড়িয়ে দিল মায়া। মরিয়া আবেদনের ভঙ্গিতে যেন রানার হাত স্পর্শ করল হাতটা। মহিলার প্রভাবিত করার ক্ষমতা সত্যিই ভাল, অতিরিক্ত ভাল, প্রতিভা আছে—ভাবছে রানা। আরেকটু হলেই বিশ্বাস করিয়ে ফেলেছিল ওকে। 'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, মিসেস নিভেন। সরি।'

'সব কথা জানিয়েছি মিসেস নিভেনকে,' মিচেল বলল। 'শুনে আমার সঙ্গে আসতে চাইলেন তিনি। খুশি হয়েই নিয়ে এলাম। যদিও মিস্টার নিভেন দেখতে কেমন ছিলেন, জানিয়েছেন তিনি আমাদের, ছবি দেখিয়েছেন, কিন্তু কিছু কিছু জিনিস সামনাসামনি দেখে তিনি যতটা ভাল বলতে পারবেন, আর কেউ পারবে না। কাজেই, স্বামীকে শনাক্ত করার জন্যে তাঁকে নিয়ে এলাম।'

'মিস্টার নিভেনের ছবি আছে আপনার কাছে?' রানা জিজ্ঞেস করল।

মাথা ঝাঁকাল রয়। চামড়ার ব্রিফকেস থেকে একটা ম্যানিলা ফাইল বের করল। দুটো ছবি ঠেলে দিল টেবিলের উপর দিয়ে। একটা ছবি ক্লোজআপে তোলা, দেহের উপরের অংশ, বছর দুয়েক আগের। তাতে দেখা যাচ্ছে সুদর্শন একজন লোক, দৃঢ়বদ্ধ চোয়াল, বয়েস তিরিশের কাছাকাছি। দ্বিতীয় ছবিটা অনেক পরের, বৈমানিকের পোশাক পরা, একটা পাইপার কোম্যাঞ্চি প্লেনের পাশে দাঁড়ানো।

মায়া নিভেনের সামনে ছবি দুটো নামিয়ে রাখল রানা। 'তা হলে আপনার স্বামী এ-রকম দেখতে?'

কিছুটা অবাক হয়েই রানার দিকে তাকিয়ে রইল মায়া। 'বুঝলাম না।'

'শুনুন, আইস-ক্যাপ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিই আপনাকে, ওই জায়গাটা কেমন। এতই ঠাণ্ডা, মৃতদেহে পচন ধরে না। বরফে সংরক্ষিত, অবিকৃত থাকে।'

'কিন্তু এক্সপিডিশন রিপোর্টে তো দেখলাম, মোটেও অবিকৃত নয়,' মিচেল বলল।

'অবিকৃত হয়ে থাকলে তার জন্যে একটা জিনিসই দায়ী, মিস্টার মিচেল, মেরু শিয়াল,' রানা বলল। 'হায়েনার মতই ভয়ঙ্কর ওগুলো।'

চেয়ারে হেলান দিল মায়া। মুখে বেদনার ছাপ। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চোখ বুজে থাকল। আবার যখন মেলল, সামলে নিয়েছে। গম্ভীর স্বরে বলল, 'তারপরেও আমি দেখতে চাই। দেখে শিওর হতে চাই।'

একটা মুহূর্ত ভারী নীরবতা, ভাঙলেন গ্লেন, 'ফর গডস সেক, রানা, কী হয়েছে তোমার বলো তো?'

'সত্যি কথাটা খুব সহজভাবে জানানোর চেষ্টা করছি সবাইকে।' মিচেলের দিকে ফিরল রানা। 'এখন আসল কথায় আসা যাক। প্রথমে আমার জানা দরকার, ওই ধ্বংসাবশেষটা কোথায় আছে।'

ব্রিফকেস থেকে একটা ম্যাপ বের করে টেবিলে বিছাল রয়। পেন্সিল দিয়ে

দুটো ক্রস চিহ্ন এঁকে প্লেনের অবস্থান দেখানো হয়েছে। এক নজর দেখেই বুঝল রানা, বিশেষজ্ঞের কাজ।

'এটা যে ঠিক, শিওর হলেন কী করে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'অক্সফোর্ডে আমি নিজে গিয়েছি,' রয় জানাল। 'এক্সপিডিশনে নেতৃত্ব দিয়েছেন যে দুজন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। আনাড়ি হলে ওই বরফের স্তূপ পাড়ি দিতে পারতেন না ওঁরা।'

ঠিকই বলেছে রয়। মাথা ঝাঁকাল রানা। বিশেষজ্ঞ না হলে তুষার আর বরফে ঢাকা ওই জনহীন প্রান্তরের মাঝে পতিত একটা বিমানের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করে সেটা ম্যাপে এঁকে দেখাতে পারত না।

এক্সপিডিশনের যাত্রাপথ লাল কালি দিয়ে এঁকে দেখিয়েছে। স্যাণ্ডভিগ গাঁয়ে বুড়ো ডট জুনো সিনিয়রের ফার্মহাউস থেকে যাত্রা শুরু করে হিমবাহ পাড়ি দিয়ে প্রায় সরাসরি স্যাণ্ডভিগ ফিয়র্ডের দিকে এগিয়েছিল দলটা, উঁচু উপত্যকা ধরে চলে গিয়েছিল পর্বতের অন্যপাশের আইস-ক্যাপের দিকে। সাগর থেকে একশো মাইল ভিতরে প্লেনটাকে দেখেছে ওরা, জায়গাটা লেক সিউল থেকে বেশি দূরে নয়।

মনোযোগ দিয়ে ম্যাপটা দেখে মাথা নাড়ল রানা। 'মিস্টার মিচেল, ভুল লোকের সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন আপনারা।'

ভ্রূকুটি করল মিচেল। 'বুঝলাম না।'

'সহজ কথা। আমি একটা অটার অ্যামফিবিয়ান ওড়াই। তাতে চাকাও লাগানো আছে, যাতে পানি আর ডাঙা দু'জায়গায়ই নামতে পারি। কিন্তু তুষারে নামতে পারব না।'

'কিন্তু এই যে লেক,' ম্যাপে আঙুল রাখল রয়, 'লেক সিউল। প্লেনটা যেখানে পড়েছে, তার থেকে মাত্র পনেরো মাইল দূরে। এখানে নামাতে পারবেন না?'

'বছরে মাত্র দুই হপ্তা এটা বরফমুক্ত থাকে, সেপ্টেম্বরে,' রানা বলল। 'আমার জানামতে এর আগে থাকে না।'

'কিন্তু একবার দেখতে যেতে তো আপত্তি নেই নিশ্চয়? ধরুন, আগামী কাল?' মিচেল বলল, 'ভাল টাকা দেব। ও-নিয়ে ভাববেন না।'

'কিছুই না করে অকারণে টাকা নিতে রাজি নই আমি। তা ছাড়া আমার সময় নেই। আগামী কাল তিনটে চার্টার ফ্লাইট আছে আমার।'

'ওরা যা দেবে, তার ডবল দেব।'

মাথা নাড়ল রানা। 'হবে না। আপনারা চলে যাবার পরও এখানে থাকতে হবে আমাকে। আর কাস্টোমারের সঙ্গে কথার বরখেলাফ করে খুব বেশিদিন টিকতে পারব না এখানে।'

'আচ্ছা, স্থলপথে যাওয়া যায় না ওখানে?' রয় জিজ্ঞেস করল। 'ম্যাপে একটা রাস্তা দেখছি, ফ্রেডেরিকসবর্গ থেকে স্যাণ্ডভিগ গেছে।'

'পর্বতের ভিতর দিয়ে একশো মাইল রাস্তা রেইনডিয়ারে টানা গাড়িতে করে যেতে পারেন। ল্যাণ্ড-রোভার গাড়িতে করেও যাওয়া যায়, পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা লাগে, আবহাওয়ার ভালমন্দর ওপর নির্ভর করে সেটা। স্যাণ্ডভিগ যাওয়াটা কঠিন নয়, প্লেনে করে আপনাদের পৌছে দিতে বড়জোর ঘণ্টাখানেক লাগবে আমার।

সমস্যাটা হলো তার পরে। হিমবাহ, পর্বত, আইসক্যাপ। ওসব পেরিয়ে একশো মাইল পথ পায়ে হেঁটে যাওয়া, পৃথিবীর দুর্গমতম জায়গা দিয়ে। আমার ধারণা, গ্রীনল্যাণ্ড এক্সপিডিশনের কমপক্ষে পনেরো দিন লেগেছিল।' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল রানা। 'না, মিস্টার মিচেল, এত সহজ না। একটা কাজ করলে অবশ্য পারা যায়, হেলিকপ্টারে গেলে। কিন্তু পাবেন কোথায়? সবচেয়ে কাছের হেলিকপ্টরটা রয়েছে থিউলির আমেরিকান বেস-এ, এখান থেকে এক হাজার মাইল দূরে।'

আবার আরেকটা ভারী নীরবতা। গম্ভীর দৃষ্টিতে রয়ের দিকে তাকাচ্ছে মিচেল। 'কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না, তাই না?'

এতক্ষণ পর্যন্ত শুধু সমস্যা আর ঝামেলাগুলোর কথাই বলেছে রানা, ব্যাপারটাকে অসম্ভব বানিয়ে ফেলেছে। এখন বলল, 'তবে একটা উপায় আছে। যদি স্কি লাগানো প্লেন নিয়ে যাওয়া যায়।'

প্রচণ্ড আগ্রহে টেবিলের উপর প্রায় ঝুঁকে পড়ল মিচেল। 'আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আছে। আমার এক বন্ধুর, একটা এয়ারমাখি প্লেন। আইসল্যাণ্ডের লোক, নাম ডেভিড গোল্ডবার্গ। সাধারণত গরমকালে স্কি খুলে রাখে ও, কিন্তু আপনাদের কপাল ভাল, এবার এখনও ওটা খোলেনি, কারণ, ম্যালামাস্কের আইস-ক্যাপে একটা মাইনিং কোম্পানির সঙ্গে লম্বা চুক্তি করেছে।'

'আপনার ধারণা প্লেনটার কাছে নামতে পারবে আপনার বন্ধু?' রয় জিজ্ঞেস করল।

'পারা তো উচিত। তবে সেটা নির্ভর করে একটা স্নোফিল্ড খুঁজে পাওয়া যাবে কি না, তার ওপর।'

'না পেলে পারবে না?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আপনি বুঝতে পারছেন না, ওই জায়গাটা একটা শীতল নরক, রীতিমত দুঃস্বপ্ন; হাজার হাজার ফাটল। এত বেশি চিড় ধরা, উপর থেকে জালের মত মনে হয়। চাঁদের পিঠের মত এবড়ো-খেবড়ো, উঁচুনিচু, চাঁদের মতই নির্জন।'

'আপনার ওই বন্ধুটি, গোল্ডবার্গ না কী নাম বললেন? উনি কি ফ্রেডেরিকসবর্গে আছেন?' মিচেল জানতে চাইল।

'এখানকার এয়ারস্ট্রিপেই প্লেন রাখে। হোটেলের ডেস্ক থেকে ফোন করে মেসেজ রেখে দিতে পারেন। কাল সকালে উঠেই পেয়ে যাবে।'

'এই হোটেলে থাকেন না?'

'না, শহরের ধারে নিজের বাসা আছে।'

'আজ রাতে দেখা করা যায় না? যত শীঘ্রি সম্ভব কাজ শেষ করে ফেলতে চাই।'

আবার মাথা নাড়ল রানা। 'আজ রাতে উনি ভীষণ ব্যস্ত, মিস্টার মিচেল, আমার কথা অবিশ্বাস করবেন না।'

'নিশ্চয় মেয়েমানুষ, ডেভকে যতদূর চিনি,' বহুক্ষণ পর কথা বললেন গ্লেন।

রানার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল মিচেল, মাথা ঝাঁকাল রানা। 'জীবনের এই দিকটাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে ডেভ।' মায়ার দিকে তাকাল ও। 'আপনি

ওকে চেনেন, মিসেস নিভেন। ডিনারে আসার সময় ঘর থেকে বেরিয়ে যার সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিলেন।'

চোখ বড় বড় হলো মায়ার। 'ওই সুদর্শন সাদা চুলওয়ালা যুবক? ভারী মজা তো!' অবাক হয়ে ভুরু কুঁচকে তাকাল মিচেল। ওর কাছে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন মনে করল না মায়া। 'যদি কিছু মনে না করেন, আমি এখন শুতে যাব। খুব ক্লান্তি লাগছে।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' উদ্বিগ্ন মনে হলো মিচেলকে। 'চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'লাগবে না।'

'লাগবে, লাগবে। আমিও শুতে যাব। আসলে আমাদের সবারই এখন শুতে যাওয়া উচিত। কাল একটা লম্বা দিন পড়ে আছে। অনেক কাজ করতে হবে।'

উঠে দাঁড়াল মায়া। ওর সঙ্গে বাকি সবাই উঠে দাঁড়াল। রানার হাত ধরল ও। 'থ্যাংক ইউ, মিস্টার রানা। আপনার সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ।'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন গ্লেন। 'ভুলবেন না কিন্তু। আপনার জন্যে আমি সব করতে রাজি আছি, যা বলবেন।'

'না, ভুলব না।' উষ্ণ হাসি উপহার দিল গ্লেনকে মায়া। কালো চোখ দুটো চকচক করে উঠল ক্ষণিকের জন্য। হাত ধরে ওকে নিয়ে চলল মিচেল। গুড-নাইট জানিয়ে রয়ও রওনা হলো ওদের পিছন পিছন। রইল শুধু রানা ও গ্লেন।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ালেন তিনি। 'মহিলা বটে, কী বলো, রানা? আজকাল তো আর এ ধরনের মহিলাদের দেখাই যায় না।'

'আপনার তাই ধারণা?'

'ধারণা নয়, জানি।' ভ্রূকুটি করলেন গ্লেন। 'বুঝলাম না কেন তুমি ওর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে।'

জবাব দিল না রানা।

হয় তিনি রানার কণ্ঠের তিক্ত সুরটা বোঝেননি, কিংবা না বোঝার ভান করে এড়িয়ে গেলেন। আগের কথার খেই ধরে বললেন, 'বহুকাল আগের একটা পরিচিত মুখের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে আমাকে মহিলা। নিকিটা ব্রায়ানের নাম শুনেছ, রানা?'

'মনে করতে পারছি না।'

'অনেক বড় অভিনেত্রী ছিলেন, মস্ত তারকা। প্রথম ছবিতে আসেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে। জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে হঠাৎ করেই অভিনয় ছেড়ে দিলেন। ব্যাপারটা অনেকের কাছেই পাগলামি মনে হবে। কিন্তু ওই জগৎ তাঁর ভাল লাগেনি। বলেছেন, ডাস্টবিনে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন একটু একটু মনে পড়ছে,' রানা বলল। 'তার মৃত্যু নিয়ে কী একটা কেলেঙ্কারিও হয়েছিল, তাই না? একজন পুরুষকে নিয়ে দুই মহিলার লড়াই?'

দপ্ করে জ্বলে উঠলেন গ্লেন। 'মিথ্যে কথা! একেবারেই মিথ্যে! ওসব ছড়িয়েছে ওর শত্রুরা, যারা ওকে হিংসে করত, দেখতে পারত না—কারণ, তিনি ছিলেন সত্যিকারের একজন ভদ্রমহিলা। শঠদের মাঝে একজন ভাল মানুষ।'

ইশারায় একজন ওয়েইটারকে কাছে ডাকলেন তিনি। উইস্কি আনতে বললেন। 'অদ্ভুত, বুঝলে, কিন্তু যতই বয়েস হবে তোমার, তত বেশি পিছনে ফিরে তাকাবে, ফেলে আসা দিনগুলো নিয়ে ভাববে, কষ্ট পাবে, বুঝতে পারবে উন্নতি করার পিছনে একের পর এক কত সুযোগ থাকে। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাটাতে হাজির থেকে ঠিক কাজটা করতে পেরেছিলে বলেই ওপরে উঠতে পেরেছ।'

'ঠিকই বলেছেন,' রানা বলল। 'আপনি কোথায় সুযোগটা পেয়েছিলেন?'

'সান্তা বারবারার পিয়ারে... এক বৃষ্টিঝরা কুয়াশার রাতে। জাহাজঘাটে আমার সঙ্গে নিকিটার দেখা হয়েছিল। বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর জেনেছিলাম, বৃষ্টিভেজা রাতে বাইরে হেঁটে বেড়ানো ওঁর শখ। কয়েকটা গুণ্ডা ওকে অপমান করার চেষ্টা করেছিল।'

'আপনি ওদের বাধা দিলেন?'

'হ্যাঁ।' মুখ দেখেই বোঝা গেল দূর অতীতে হারিয়ে গেছে তাঁর মন, কল্পনায় দেখতে পাচ্ছেন দৃশ্যটা। 'তখন আমার বয়েস মাত্র ষোলো...উইসকনসিন থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, সিনেমায় অভিনয় করার নেশায়। মহিলা আমার জন্যে সব করলেন। কাপড়, খাবার, আশ্রয়, এমনকী ড্রামা স্কুলেও পাঠিয়েছেন। সিনেমায় নামারও সুযোগ করে দিয়েছেন।'

• 'আর আপনি কী করলেন? পটানোর চেষ্টা?'

মন্তব্যটা করেই রানা বুঝল, ভুল করে ফেলেছে। মাপ চাওয়ারও সুযোগ পেল না। গ্লেনের হাতটা নড়তেও দেখল না। তার আগেই টের পেল, কঠিন কতগুলো আঙুল ওর গলা টিপে ধরেছে। এত শক্তি ওঁর গায়ে, ভাবতে পারেনি রানা। দম বন্ধ হয়ে এল ওর।

'খবরদার, এ রকম কথা আর কক্ষনো বলবে না,' গ্লেনের চোখে আগুন। 'তিনি আমাকে ছেলের মত ভালবাসতেন। আমিও তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। সত্যিকারের ভদ্রমহিলা, প্রথমেই বলেছি, ভুলে গেছ? শোনো, এবার তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। এর আগেরবার ওঁকে নিয়ে যে আমার সামনে বাজে কথা বলেছিল, তার চোয়াল ভেঙে দিয়েছিলাম আমি।'

বললেন ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু গলাটা ছাড়তে অনেক বেশি দেরি করছেন—হয়তো জানেনই না, কী প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে তাঁর দেহে। রানা যখন দেখল দম বন্ধ হয়ে মারা যাবার উপক্রম হয়েছে, তখন দুই হাতে ধরল গ্লেনের দুই কব্জি, তারপর চাপ দিল। নেশার ঘোর কেটে গেল অভিনেতার, অবাক চোখে দেখছেন রানাকে।

তারপর হঠাৎ করেই রানার গলা ছেড়ে দিলেন গ্লেন।

গলায় হাত বুলিয়ে ধাতস্থ হয়ে রানা বলল, 'সরি। আসলে, সিনেমার লোকেদের সম্পর্কে আপনার মুখেই গত কয়েক দিনে এত খারাপ কথা শুনেছি... যাকগে, আপনি কী বোঝাতে চেয়েছেন বুঝতে পেরেছি। ওই মহিলার পর মায়া নিভেনকেই আপনি দেখলেন, যাকে ভদ্রমহিলা মনে হয়েছে?'

'বৈশিষ্ট্য আছে, এটা ঠিক, যে মেকি জগতে আমরা বাস করি।' চুমুক দিয়ে গ্লাসের উইস্কি শেষ করে ফেললেন তিনি। মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন। 'কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কী, রানা? জীবন, বেঁচে থাকা, টাকাপয়সা, এ-সব ব্যাপারে তোমার কী

মতামত?'

'জীবনটা আমার কাছেও একটা নাটক, গ্লেন। বার বার মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে আমার ভাল লাগে। জীবনে যদি উন্মাদনাই না থাকল, একঘেয়ে দিন পার করে লাভটা কী?'

'তুমিও যে আমাদেরই মত, প্রথম দিন দেখেই বুঝেছিলাম,' গ্লেন বললেন। 'উদ্দাম, প্রাণবন্ত একজন অ্যাডভেঞ্চারার। আমি যদি তোমার মত হতে পারতাম!' শূন্য দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। 'জীবনের বেশির ভাগ সময় স্টুডিও আর ক্যামেরার সামনে কাটিয়ে দিয়ে বাস্তবতাকেই অবাস্তব লাগে এখন। কোন কিছুই আর আসল মনে হয় না।'

'মায়া নিভেনকেও না?' কণ্ঠের ধার চাপা দিতে পারল না রানা।

ঝাঁকি খেয়ে যেন বাস্তবে ফিরে এলেন গ্লেন। ভুরু কুঁচকে তাকালেন রানার দিকে। 'কী বলতে চাও?'

'এবং ভদ্রলোক মিস্টার হিউগ মিচেল ও তার সহকারী—ক্লেইম সার্ভেয়ার, যারা মহা দামি স্যাভেল্স রো সুট পরে। ইদানীং ইনশিওরেন্স অফিসারের বেতন নিশ্চয় অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেছে, নইলে এত দামি কাপড় পরার টাকা ওরা পায় কোথায়?'

'তুমি কী বলতে চাও, বলো তো?'

'পুরো ব্যাপারটাতেই বিশ্রী, পচা দুর্গন্ধ পাচ্ছি আমি, আর সেটা পাওয়ার জন্যে খুব বেশি শক্তিশালী নাসিকার প্রয়োজন হয় না।' শূন্য দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে আছেন গ্লেন। রানা বলল, 'অসংখ্য ফুটো রয়েছে ওদের গল্পে। এত বেশি, কোনটা দিয়ে শুরু করব বুঝতে পারছি না।'

'তুমি বলতে চাইছ, মিচেল অপরাধী চক্রের কেউ?'

'তা ছাড়া আর কী?' ভুরু নাচাল রানা। 'আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন, গ্লেন। একের পর এক সিনেমায় অভিনয় করতে করতে বাস্তব দুনিয়াটা একেবারে ভুলেই গেছেন। সব অপরাধীর চেহারা সিনেমার ভিলেনের মত হতে হবে কেন?'

'রয়?' গ্লেনের কণ্ঠে অবিশ্বাস। 'ওকেও কি তোমার সন্দেহ? চোর-ডাকাত জাতীয় কিছু?'

'তারচেয়ে বড় কিছু। এক প্যাকেট সিগারেটের জন্যে ও আপনার গলা ফাঁক করে দিতে পারে।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেছে গ্লেনের। 'নাহ্, আর বসে থাকতে পারছি না। ঘুমানো দরকার।'

'আমিও তা-ই বলতে যাচ্ছিলাম,' বলে উঠে দাঁড়াল রানা। 'দেখা হবে, গ্লেন।' ঘুরে দাঁড়িয়ে হলঘরের ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলল ও।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমোতে গেল না রানা। অনেক কিছু ভাবার আছে। বাইরে প্রবল সোঁ-সোঁ করে বয়ে চলেছে ঝড়, সেইসঙ্গে বৃষ্টি। জানালার কাঁচে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো আঘাত হেনে বুলেট ফাটার শব্দ তুলছে। মাথার নীচে হাত রেখে বালিশে আধশোয়া হয়ে আছে ও। চালু করে দিয়েছে রেডিওটা।

দরজায় মৃদু আঘাতের শব্দটা প্রথমে বাতাসের কারণে হয়েছে বলেই ভুল করল রানা। তারপর আবার থাবা পড়ল দরজায়, এবার আগের চেয়ে জোরে। বিছানা থেকে নেমে গিয়ে দরজা খুলে দিল ও।

মিষ্টি হাসি হাসল মায়া। 'আমাকে একটা মিনিট সময় দিতে পারেন, মিস্টার রানা?'

'নিশ্চয়ই, আসুন।'

রানা দরজা লাগাচ্ছে, জানালার দিকে এগিয়ে গেল মায়া। কাঁচের ভিতর দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকাল। 'এখানে সব সময়ই কি আবহাওয়া এমন থাকে?'

রেডিওটা অফ করে দিল রানা। 'আপনি নিশ্চয় আবহাওয়া নিয়ে আলাপ করতে আসেননি এখানে, মিসেস নিভেন?'

ঘুরে দাঁড়াল মায়া। মুখে বিষণ্ন হাসি। 'আপনি খুব সরাসরি কথা বলেন, তাই না, মিস্টার রানা? এতে অবশ্য বলাটা আমার জন্যে সহজ হয়ে গেল। আপনি ঠিকই বলেছেন, আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি আমি। সত্যি কথা বলতে কী, ওই পাইলট, কী যেন নাম বললেন—হ্যাঁ, ডেভিড গোল্ডবার্গ, ওকে নিয়েই ভাবছি। ওর সঙ্গে দেখা করা যায় না?'

'আজ রাতে?' মাথা নাড়ল রানা। 'হবে না। অন্য কাজে ব্যস্ত আছে ও।'

'জানি,' অধৈর্য ভঙ্গিতে জবাব দিল মায়া। 'কোন মেয়ের সঙ্গে রয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয়, আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারব না।'

'মিচেল কী বলে?'

'আমার ধারণা, ও শুয়ে পড়েছে।' কাছে এগোল মায়া। প্রায় মরিয়া কণ্ঠে বলল, 'আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই। আজ রাতেই। আমি জানতে চাই, ও আমাদের সাহায্য করতে পারবে কি না। এই অনিশ্চয়তা আর আমি সহ্য করতে পারছি না।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে রানা। সুন্দর ওই চেহারাটার আড়ালে কোন খেলা চলছে মায়ার মনে, বোঝার চেষ্টা করছে।

'বেশ,' অবশেষে বলল ও, 'বসুন এখানে। দেখি কী করতে পারি।'

নীরব করিডোর। শেষ মাথায় ডিটার ঘর থেকে কোন শব্দ আসছে না। ঘড়ি দেখল রানা। মাঝরাত হয়ে এসেছে প্রায়। ডেভ বলেছে, রাত একটা পর্যন্ত ডিটার ডিউটি। দরজা খোলার চেষ্টা করল রানা। বন্ধ। ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে আসতে যাবে, এ সময় ডিটাকে দেখতে পেল। সার্ভিস স্টেয়ার দিয়ে উঠে আসছে, হাতে অনেকগুলো চাদর।

গালের চামড়া ও চোখে এক ধরনের আভা, একটা খুশি-খুশি ভাব। ডেভের কথা ভেবে নিশ্চয়।

রানাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি? এত রাতে এখানে?'

'ভাবলাম, ডেভ বোধহয় তোমার ঘরেই আছে।'

'ঘণ্টাখানেক আগে বেরিয়ে গেছে। বলল, ঘুমাতে হবে। সকালে উঠেই নাকি

ছুটতে হবে। ইটভ্যাকে যাবে। জরুরি কিছু?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না। অতটা নয়। পরে কথা বললেও চলবে। কালকে দেখা করব।'

ঘরে ঢুকে মায়াকে জানালায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে দেখল রানা। শব্দ শুনে ঝটব দিয়ে ঘুরে তাকাল মহিলা।

'আপনি আসতে দেরি করে ফেলেছেন,' রানা বলল। 'ও চলে গেছে।'

'ওর বাসা কি বেশি দূরে?'

'হেঁটে যেতে বড়জোর দশ মিনিট।'

'আমাকে নিয়ে যাবেন?' কাছে এসে দাঁড়াল মায়া। কালো চোখের তারা স্থি হলো রানার চোখে। ওর গায়ের পারফিউমের গন্ধ পেল রানা।

'ঠিক আছে, নিয়ে যাব,' বলল ও। 'তবে এই পোশাকে তো বাইরে যেত পারবেন না, বুট লাগবে, আর খুব গরম কোট। পরে আসুন। আমি পাঁচ মিনিট প আপনাকে ডেকে নেব।'

রানার বাহুতে হাত রাখল মায়া। দ্বিধা করে বলল, 'ভাবছি, মূল সিঁড়িটা ছাড় বেরোনোর আর কোন পথ আছে কি না।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সার্ভিস স্টেয়ার দিয়ে যাওয়া যেতে পারে। একেবারে বেযমেন্টে নেমে গেছে সিঁড়িটা। একটা দরজা আছে, সেটা দিয়ে পিছনের আঙিনায় বেরোনো যায়। ওদিক দিয়ে যেতে চান?'

'সমস্যাটা হলো, মিস্টার মিচেল আবার বারে গিয়ে বসেছেন। আমাবে বেরোতে দেখলে "কোথায় যাচ্ছি" ভেবে সন্দেহ করতে পারেন।'

'হুঁ! এ রকম ভাবার কারণটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না।'

রানার কথায় একটা ধাক্কা খেল মায়া। হাসিটা মুছে যাচ্ছে ধীরে ধীরে. পুরোপুরি মুছল না, সামান্য একটু ঝুলে রইল যেন ঠোঁটের কোণে। রানার কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'আমি তৈরি হয়ে নিই।'

তাড়াহুড়ো করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মহিলা।

বাইরে প্রবল বেগে দমকা হাওয়া বইছে, আবহাওয়া দপ্তরের ভাষায় 'ফোর্স এইট গেইল'। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো যেন সুচের মত এসে বিঁধছে রানা ও মায়ার মুখে। শক্ত করে রানার হাতটা ধরে রেখেছে ও, গায়ের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে। মেইন রোড ধরে হেঁটে চলেছে দুজনে।

কথা বলছে না কেউ। কারণ এই দুর্যোগে হাঁটার দিকেই মনোযোগ দিতে হচ্ছে বেশি। মেইন রোড থেকে মোড় নিয়ে একটা সরু গলিতে নামতেই বাতাসের ঝাপটা কমে গেল। দুই পাশের উঁচু কাঠের বাড়িগুলো বাতাস আটকে দিচ্ছে। আগের চেয়ে সহজ হলো এগোনো।

গলির শেষ মাথায় ডেভের ঘর। বাড়ির পিছনে মাটি উঁচু হয়ে উঠে পাহাড়ের সঙ্গে মিশেছে। একতলা একটা কাঠের বাড়ি, সামনে বারান্দা। জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। একটা পাল্লা বার বার খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে বাতাসে।

দরজায় থাবা দিল রানা। কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে উঁকি দিল ডেভ। গলায় বাঁধা একটা বড় রুমাল। পরনে ড্রেসিং গাউন। তবে দেখে মনে হলো না ঘুম থেকে উঠে এসেছে।

রানাকে দেখেই হাসি এ কান-ওকান হলো ওর। 'আরে, রানা! এত রাতে?'

হাত ধরে টেনে অন্ধকার থেকে মায়াকে আলোয় নিয়ে এল রানা। 'ঘরে আসব, ডেভ? বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।'

ভীষণ অবাক হয়েছে ডেভ। কিন্তু সরে ঢোকার জায়গা করে দিতে দেরি করল না। ভিতরে উষ্ণ আরাম। ঘরের এক কোণে একটা স্টোভ জ্বলছে পুরোদমে, ঢাকনা দিয়ে রাখা লোহার প্লেটটা এতই উত্তপ্ত, লাল হয়ে আছে।

দস্তানা খুলে আগুনের উপর হাত ছড়িয়ে দিল মায়া। সেঁকতে সেঁকতে বলল, 'আহ্, দারুণ আরাম! আপনার ঘরটা খুব সুন্দর।'

'ডেভিড্র গোল্ডবার্গ,' পরিচয় করিয়ে দিল রানা, 'মিসেস মায়া নিভেন। একটা জরুরি কাজে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম, ডেভ। কয়েক মিনিট সময় দিতে পারবে?'

'জরুরি কাজ?' মায়ার উপর থেকে জোর করে দৃষ্টি সরাল ডেভ। 'কী কাজ?'

'মিসেস নিভেনের কাছ থেকেই শুনো।'

ঘুরে শীতল দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল মায়া। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, মিস্টার রানা, অনেক কষ্ট করেছেন আমার জন্যে। আর কষ্ট দিতে চাই না। আপনি চলে যান। মিস্টার গোল্ডবার্গই আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিতে পারবেন।'

ডেভের অবস্থা দেখে মনে হলো, স্বপ্ন দেখছে। তাকিয়ে ভুরু নাচাল রানা, 'কী, পারবে?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়,' সম্বিত ফিরে পেল যেন ডেভ। 'মিসেস নিভেনকে নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না। আমিই হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

দরজার দিকে এগোল রানা। পিছন থেকে ডাকল মায়া। ফিরে তাকিয়ে রানা দেখল, ওর কোট খুলতে সাহায্য করছে ডেভ। এতক্ষণে লক্ষ করল রানা, উলের একটা ময়ূর-নীল পোশাক পরেছে মায়া, সামনের দিকে গলার কাছ থেকে বোতামের সারি নেমে গেছে হাঁটুর উপর পর্যন্ত। পায়ের বাকি অংশ আবৃত কালো রঙের চামড়ার কসাক বুট দিয়ে।

দ্রুত কাছে এসে রানার বাহুতে হাত রাখল মায়া। 'মিস্টার মিচেলের সঙ্গে দেখা হলে কিছু বলবেন না, প্লিজ। শুনলে আমার সম্পর্কে ভুল ধারণা করতে পারেন তিনি।'

'বলব না,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল রানা। 'আসলে এত কথা বলার কোন দরকারও নেই আমার।'

আবার মায়ার মুখ থেকে হাসিটা খসে পড়ল। ফিরে এল কি না দেখার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। ঘুরে দাঁড়াল। মায়াকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

বাতাসের গতিপথ বদল হয়েছে। সরু গলি দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ঢুকছে এখন। শক্ত হাতে ক্রমাগত চড় মেরে চলল যেন মুখে। ভীষণ ঠাণ্ডা, চামড়া ভেদ করে

হাড্ডি-মজ্জায় ঢুকে যেতে চাইছে। তবে এ-সব কোন কিছুই যেন ওর চিন্তাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারছে না। মোড় নিয়ে বড় রাস্তায় উঠল ও। নানাকথা ভাবছে। ভাবছে, ডেভ এখন কী করছে। জোরে জোরে হাসছে আর নিজের সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ দিচ্ছে নিশ্চয়। কিন্তু বেচারা বুঝতে পারছে না, আজকের এই রাতটার জন্য বড় রকমের খেসারত দিতে হবে হয়তো ওকে। সাবধান করতে পারত রানা। কিন্তু করে লাভ নেই। কথা শুনবে না ডেভ।

সাত

পরদিন, সুন্দর একটা উজ্জ্বল সকাল। এয়ারস্ট্রিপ ধরে হেঁটে চলেছে রানা, আবহাওয়ার খবর নিতে যাচ্ছে। শহরের পিছনে পর্বতটাকে মনে হচ্ছে অতি কাছে, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। সবুজ পাদদেশে ভেড়ার পাল চলেছে যেন সাদা টুকরো মেঘের মত ভেসে ভেসে, একজন রাখাল আর দুটো কুকুরের তাড়া খেয়ে। এখনকার এই নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না, প্রাচীনকালে যখন প্রথম ভাইকিং শিপগুলো এই অঞ্চলে ঢুকেছিল, কেন এটার নাম রেখেছিল গ্রীনল্যাণ্ড।

রানওয়েতে দেখা যাচ্ছে ডেভের এয়ারমাখিটা। ইঞ্জিন পরীক্ষা করছে একজন মেকানিক। পাশে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগে দেখছে তরুণ আইসল্যাণ্ডার। রোদে ঝিলমিল করছে সাদা চুল। রানাকে দেখে হেসে হাত নাড়ল। টারমাক পেরিয়ে এগিয়ে এল। মুখে চওড়া হাসি।

'খুব খুশি মনে হচ্ছে!' রানা বলল।

আরও চওড়া হলো ডেভের হাসি। 'দারুণ, দারুণ মেয়েমানুষ ও, রানা। বিশ্বাস করো। ও নিজেই জানে না কতখানি ভাল। এ রকম একটা মেয়েমানুষকে তো আর বিছানা থেকে ফেলে দিতে পারি না।'

'পঁচাত্তর বছর বয়েসী এস্কিমো বুড়িকেও তুমি ফেলে দিতে পারবে না, আর ও তো সুন্দরী মহিলা। মায়া তোমাকে গল্পটা বলার সুযোগ পেয়েছে তো? মিচেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?'

'আমি ওর সঙ্গে বসে নাস্তা খেয়েছি।'

'মায়ার সঙ্গে তোমার রাত কাটানোর কথা জানে?'

দু'হাত ছড়াল ডেভ। চোখে আহত দৃষ্টি। 'কবে কখন একজন মহিলার বদনাম করেছি, বলো তো?'

'তা করোনি। কী বলল মায়া?'

রানার কাঁধে হাত রাখল ডেভ। 'শুধুই ভালবাসার কথা, রানা। তুমি যাওয়ার পরের সেই চমৎকার মুহূর্তটা থেকে, সারাক্ষণ। হোটেলের করিডরে আমার গায়ে ধাক্কা খাওয়ার পর থেকেই নাকি আমাকে আর ভুলতে পারেনি, দেখা করার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিল।'

'তা তো জানিই,' হালকা স্বরে জবাব দিল রানা। 'এতই পাগল, রাত দুপুরে আমাকে বিছানা থেকে টেনে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।'

'তাহলেই বোঝো।'

'মিথ্যে বলা বাদ দাও। এখন আসল কথাটা বলো, কেন গিয়েছিল?'

'বললামই তো। ও, আরও বলেছে, সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে ওর। বেচারি। যা-ই হোক, আমার সঙ্গে কথা বলার পর মন ভাল হয়ে গেছে।'

'কিন্তু এত ছলচাতুরি কেন? কেন আমাকে মিচেলের কাছে কিছু বলতে নিষেধ করল?'

'তাই তো বলবে। আর দশটা সাধারণ বয়স্ক মানুষের মত মিচেলও ওর প্রেমে পড়ে গেছে। প্রচণ্ড ভালবাসা তৈরি হয়েছে। মায়া আমার কাছে গেছে শুনলে জেলাস হয়ে উঠবে। এখনই ওর কুনজরে পড়তে রাজি নয় মায়া।'

'ওই মিচেলটা ওর মাকে ভালবাসে কি না, তাতেও সন্দেহ আছে আমার,' রানা বলল। 'যা-ই হোক, যা ভাল বোঝো, করো। মিচেলকে তা হলে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছ?'

'এত বেশি টাকা দিতে চাইল, রাজি না হয়ে উপায় ছিল না। তবে টাকাটা ইনকাম করতে পারব কি না, সন্দেহ। যা খারাপ এখন অবস্থা, প্লেন নামানোর জায়গা পাব না।'

'লেক সিউল তো আছেই। বরফের ওপর নামানোর চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

মাথা ঝাঁকাল ডেভ। 'ওটার ওপরই বা কতখানি ভরসা করা যায়? পানির ওপর সমতল বরফ পাওয়া যাবে, কিন্তু কতখানি শক্ত, ভর সইতে পারবে কি না কে জানে। বছরের এ সময়ে বরফ অর্ধেক পাতলা হয়ে যায়। তা, শুনলাম, তুমি নাকি আজ সকালে ইনটুস্ক যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'ওদিকেই তো যাবে, আমার একটা কাজ করে দাও না। পর্তুগিজ ফিশিং ফ্লিট হসপিটালের জন্যে আমার কিছু ওষুধের চালান নিয়ে যাওয়ার কথা। ইটভাকের কিনারেই আছে। যেখানে যাচ্ছ, সেখান থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল।'

'ঠিক আছে, পৌঁছে দেব,' রানা বলল। 'টাকার জন্যেই কাজ করি। তুমি কী করবে?'

'স্যাণ্ডভিগে রয়্যাল গ্রীনল্যাণ্ড ট্রেডিং কোম্পানির স্টোরে সাপ্লাই নিয়ে যাব। ওখান থেকে পড়ে যাওয়া প্লেনটা দেখতে যাব। এ ভাবে ছাড়া সময় বের করতে পারতাম না। আজ বিকেলে ম্যালামাস্কের একটা ফ্লাইট শিডিউল পেয়েছি, ওটা মিস করতে পারব না।'

ওর অবস্থা বুঝতে পারছে রানা। ম্যালামাস্কে আমেরিকানদের সঙ্গে চুক্তিটাকে গুরুত্ব না দিয়ে পারবে না ডেভ। অপরিচিত কিছু লোকের কাজ করে দিতে গিয়ে—ওরা যত টাকাই দিক—চুক্তি নষ্ট করা উচিত হবে না। কারণ, সারা মৌসুমের চুক্তি করেছে আমেরিকান কোম্পানি। সপ্তাহে একটি মাত্র ট্রিপের জন্য ওরা যা টাকা দেয়, তাতে সারা বছরের খরচের টাকা উঠে আসে।

'মিচেলদের সবাইকে নিয়ে যাচ্ছ নাকি তুমি?'

মাথা নাড়ল ডেভ। 'না, প্লেনে মালপত্র বেশি হয়ে যাচ্ছে এমনিতেই। এখন আমি শুধু গিয়ে নামার জায়গা আছে কি না, ওপর থেকেই দেখে চলে আসব। নামার সময় পাব বলে মনে হয় না।'

'হুঁ। ঠিক আছে, ওষুধের বাক্সগুলো অটারে তোলার ব্যবস্থা করো। দেরি করতে পারব না। বহু কাজ করতে হবে আজকে।'

'তোমাকে জিজ্ঞেস না করেই তুলে দিয়েছি,' হাসল ডেভ। 'আমি জানতাম, তুমি না করবে না। রাতে ফ্রেডেরিকসকোস্টে দেখা হবে। চলি।'

এয়ারমাখির দিকে দৌড়ে গেল ডেভ। প্লেনে উঠল। দরজা পুরো বন্ধ হওয়ার পর পরই গর্জে উঠল ইঞ্জিন। শূন্যে উঠল প্লেন। বেশি তাড়াহুড়া করছে ও। ওড়ার আগে আরেকটু সময় নেয়া উচিত ছিল। নাক নিচু হয়ে গেল প্লেনের। স্টিক টেনে উপরে তোলার চেষ্টা করল না ও। স্টিকে টান না দিয়ে শক্তি অর্জনের সময় দিল ইঞ্জিনকে।

পানির বিশ ফুট উপর দিয়ে উড়ে পোতাশ্রয় পেরোল প্লেন। ভারী হয়ে আসছে ইঞ্জিনের শব্দ। শেষ পর্যন্ত সামলে নিল এয়ারমাখি। ধীরে ধীরে উপরে উঠতে শুরু করল। বায়ুস্রোতে পড়ে নাচানাচি করছে। এ যাত্রা কোনমতে রেহাই পেয়ে গেল—ভাবছে রানা—কিন্তু ডেভ যা অস্থির প্রকৃতির, এ রকম তাড়াহুড়া করতে গিয়ে কোনদিন মারা পড়বে।

ইনটুস্ক আর ইটভ্যাকে মাল পৌঁছে দিয়ে নিরাপদেই দুপুরের আগে ফ্রেডরিকসবর্গে ফিরে এল রানা। তিনজন যাত্রীকে তুলে নিল নুকে যাওয়ার জন্য। সেখান থেকে উড়ে গেল সন্দ্রে স্ট্রমফোর্ডে, কোপেনহেগেন থেকে আসা বিকেলের জেটটা ধরার জন্য। সাড়ে চারটা নাগাদ চারজন তরুণ ডেনিশ কনস্ট্রাকশন শ্রমিককে নিয়ে ফিরে চলল আবার ফ্রেডেরিকসবর্গে।

সারাদিন আবহাওয়া ভাল রইল। কাজেই কাজের কোনও অসুবিধে হলো না। তবে এতবার যাতায়াত করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল রানা, খুবই ক্লান্ত। হাত ব্যথা করছে, চোখের পাতার নীচে কচকচ করছে—বালিকণা পড়লে যেমন হয়; মনে হচ্ছে যেন কতকাল ঘুমায়নি। আসলে, একটা ছুটি দরকার, যেটা পাওয়ার কোনই আশা নেই আপাতত।

ফ্রেডেরিকসবর্গে ফিরে পোতাশ্রয় ঘিরে বার দুই চক্কর দিল ও, নিরাপদে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ সময় দেখল গ্লেনের জাহাজ 'আইসবার্গ' পৌঁছে গেছে। মেইন জেটিতে নোঙর করেছে ওটা। ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছে রানা, এ সময় ডেকে বেরিয়ে এল একজন মানুষ, রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল প্লেনটার দিকে। রুথের মতই লাগল রানার কাছে, কিন্তু দূর থেকে নিশ্চিত হতে পারল না।

চাকা নামিয়ে দিল রানা। পানিতে ট্যাক্সিইং করে ছুটে গিয়ে ঢালু কিনারা বেয়ে স্লিপওয়েতে তুলে আনল অটারটাকে। তরুণ ডেনিশরা একে একে ওর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নেমে গেল। একটা ল্যাণ্ড-রোভার ওদেরকে কনস্ট্রাকশন ক্যাম্প হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যেতে এসেছে। রানাকে লিফট দিতে চাইল ওরা। কিন্তু যেতে পারল না রানা, হারবারমাস্টারের কাছে জরুরি কাজ আছে।

হারবারমাস্টারের অফিস থেকে যখন বেরোল ও, ডেভকে দেখতে পেল। স্লিপওয়ের ধারে, অটারটার পাশের একটা খুঁটিতে বসে সিগারেট টানছে আর জোরে জোরে হাত নাড়ছে আইসবার্গের দিকে। রানা দেখল, রুথই দাঁড়িয়ে আছে রেলিঙে। গায়ে ভেড়ার চামড়ার কোট, মাথায় উলের একটা লাল টুপি।

'বাড়তি সময় বলে তো আর কিছু নেই তোমার,' ডেভের কাছে এসে রানা বলল। 'এত ব্যস্ততা।'

'ওরকম একটা মেয়ের জন্যে সব ছেড়ে দিতে পারি। কী মেয়ে!'

'কথাটা বোধহয় এর আগেও বলতে শুনেছি তোমাকে।'

আবার ইয়টের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল ডেভ। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল রুথ। নীচে চলে গেল। রানার দিকে ফিরে বলল ডেভ, 'এ ছাড়া আর কী বলব?'

'আর কিছু বলার নেই?' ভুরু নাচাল রানা। 'তা কী করে এলে বললে না?'

'ও, পড়ে যাওয়া প্লেনটার কথা জিজ্ঞেস করছ?' মাথা নাড়ল ও। 'খবর ভাল না। প্রথম কথা প্লেনটাকে খুঁজে বের করতেই অনেক কষ্ট হয়েছে। একটা গিরিখাতের মধ্যে নাক গুঁজে পড়ে আছে।'

'নামতে পারোনি?'

'প্রশ্নই ওঠে না। সাংঘাতিক খারাপ হয়ে আছে সবখানে। ওই গিরিখাত আর লেক সিউল-এর মাঝে দু'একটা জায়গা আছে, যেখানে নামার চেষ্টা করা যেত, কিন্তু সাহস পাইনি। নামার অবস্থা আছে কি না, হেঁটে গিয়ে আগে পরীক্ষা করে নিতে হবে। বেশি ঝুঁকি নিতে গেলে স্কি ভাঙত, কিংবা প্লেনটাকে খোয়াতাম, আমার ঘাড়ও ভাঙতে পারত। মিচেল যা দিতে চেয়েছে, তার দ্বিগুণ দিলেও লাভ হত না।'

'লেক সিউল-এর কী অবস্থা?'

শ্রাগ করল ডেভ। 'ভীষণ কুয়াশা ওই এলাকায়। নীচেই নামতে পারিনি, ল্যাণ্ড করা তো দূরের কথা। তবে যেটুকু দেখেছি, পানি আছে, সেইসঙ্গে প্রচুর বরফও আছে।'

'তারমানে তুমি বা আমি, কেউই নামতে পারছি না?'

'তাই তো মনে হলো। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে হয়তো অটার নিয়ে নামতে পারবে। কিন্তু এখন কোনমতেই সম্ভব না।'

'মিচেলকে জানিয়েছ?'

'জানিয়েছি। প্রচণ্ড হতাশ ও। আমি ওকে জানিয়ে দিয়েছি, আমার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয়।' ঘড়ি দেখল ডেভ। 'এখন যেতে হবে আমাকে। ম্যালামাস্কে যাওয়ার একটা বাড়তি কাজ পেয়েছি—ভাঙা ড্রিলিং রিগের পার্টস নিয়ে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ফিরব। আজ রাতে ফ্রেডেরিকসবর্গে থাকছ তো?'

'সম্ভবত।'

'তা হলে পরে দেখা হবে।'

স্লিপওয়ের মাথায় রাখা জেরিক্যান এনে অটারে তেল ভরতে লাগল রানা। দশ মিনিট পর উড়ে গেল ডেভ। কপালে হাত রেখে বিকেলের রোদ আড়াল করে তাকিয়ে আছে রানা। ক্রমেই ছোট হতে হতে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে প্লেনটা। আবার যখন ফিরে তাকাল, স্লিপওয়ের মাথায় দেখল রুথকে।

কাছে এল রুথ। 'দুঃসাহসী বৈমানিকের খবর কী?'

শেষ জেরিক্যানটার সমস্ত তেল ট্যাংকে ঢালল রানা। ক্যাপ লাগিয়ে নেমে এল প্লেন থেকে। 'ইয়ট-যাত্রাটা কেমন হলো? ভাল?'

'তত ভাল না। আসার পথে আজ সকালে বরফের চাঙড়ে ধাক্কা খেয়েছিল জাহাজ।'

'ক্ষতি হয়েছে?'

'আরেকটু জোরে লাগলে হয়তো ডুবেই যেত। হল্যাণ্ডবার্গ কাল সকালে ওটাকে ড্রাই-ডকে নিয়ে যাবে।'

'গ্লেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

মাথা নাড়ল রুথ। 'মনে হচ্ছে এড়িয়ে চলছে আমাকে।'

একটা প্রশ্ন করতে চাইছে রানা। থেকে থেকেই প্রশ্নটা খুঁচিয়ে চলেছে ওর মনের কোণে। কেন, জানে না। ডেভ যে খুঁটিটায় বসে ছিল, সেটাতে বসেছে রুথ। সিগারেট কেস বের করে ওকে একটা সিগারেট দিল রানা। 'একটা প্রশ্ন করতে চাই, যদি কিছু মনে না করেন।'

'করুন।'

'কেন এসেছেন এখানে?'

অবাক হলো রুথ। 'গ্লেনকেও জিজ্ঞেস করেছেন নাকি?'

'করেছি।'

'কী বলল?'

'ওর নতুন ছবিটায় আপনাকে নায়িকার রোল দিতে অনুরোধ করেছেন।'

'হুঁ!' ওর কণ্ঠে বোধহয় কঠোরতার ছোঁয়া, নিশ্চিত হতে পারল না রানা। কোটের কলার তুলে দিল। 'এ ছাড়া আর কোন্ কারণে জঘন্য এই জায়গাটায় আসব, বলতে পারেন?'

'ভেবে দেখতে পারি।'

'ভাবতে থাকুন। আর ইতিমধ্যে জাহাজ থেকে আমার মালপত্রগুলো নামাতে আমাকে সাহায্য করতে পারেন। হল্যাণ্ডবার্গ এখনই আমাকে হোটেলে উঠে যেতে বলেছে।'

ঘুরে দাঁড়াল রুথ। হাঁটতে শুরু করল জেটির দিকে। ওর দিকে তাকিয়ে আছে রানা। কংক্রিটের কজওয়েতে উঠল মেয়েটা। দাঁড়াল। তারপর ঘুরে তাকাল ওর দিকে। 'কী, আসবেন না?'

'সত্যিই আসতে বলছেন?' রানা জিজ্ঞেস করল। 'শেষে তো অভ্যাসে পরিণত হবে। বার বার আমাকে দিয়ে কুলির কাজ করাতে চাইবেন।'

ওকে একটা ধাক্কা দিতে চেয়েছিল রানা, সফল হলো। কথা খুঁজে পেল না রুথ। সামলে নিতে সময় লাগল। যখন নিল, গলার রুক্ষতা অনেক কমেছে। 'বোকার মত কথা বলবেন না।' বলে, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে, হেঁটে চলে গেল।

মুচকি হাসল রানা। তারপর পা বাড়াল। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল কজওয়ের দিকে।

আট

ফ্রেডেরিকসবর্গে লোকসংখ্যা যেমন কম, অপরাধও তেমন কম, হয় না বললেই চলে। তবু নিয়ম অনুযায়ী একজন পুলিশ অফিসার আছেন এখানে, সার্জেন্ট রোলাফ নিরেনসেন। শহরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব তাঁর উপর।

হোটেলের বারে বসে থাকতে দেখল ওঁকে রানা। লম্বা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এই মানুষটি মেরুপ্রদেশের চল্লিশটি শীত পার করেছেন, দেহের কুঁচকে যাওয়া চামড়া যেন সে-কথাই জানান দিচ্ছে।

গ্লেনের সঙ্গে বসে বিয়ার খাচ্ছেন সার্জেন্ট। অভিনেতার কোনও কথায় পিছনে মাথা হেলিয়ে দিয়ে জোরে জোরে হাসছেন। শান্ত স্বভাবের মানুষ। ধার্মিক। পাঁচ সন্তানের পিতা, এবং পাঁচটিই মেয়ে। এই নরম চেহারার মানুষটিরই কঠোর হয়ে ওঠা ভয়ঙ্কর ভিন্ন রূপ দেখেছে রানা, শনিবারের রাতে মাতাল হওয়া হাঙ্গামাকারী জেলেদের যখন লাথি, ঘুসি মেরে হোটেল থেকে বের করেন।

ওঁর পাশে টুলে বসল রানা। 'হ্যালো, রোলাফ, দেখি না। গত কয়েক দিন কোথায় ছিলেন?'

হাত মেলাল দুজনে। রোলাফ জবাব দিলেন, 'বহুদূর যেতে হয়েছিল, হিমবাহর অন্য পাশে, স্ট্যাভেঞ্জার ফিয়র্ডের মাথায়।'

'গোলমাল?'

'ওই তো, যা হয় আরকী—রেইনডিয়ার শিকারিরা একে অন্যের গলা কাটতে যাচ্ছিল।'

'কেউ জখম হয়েছে?'

'ছুরির খোঁচা খেয়েছে দু'একজন, তেমন কিছু না। ঠাণ্ডা করে দিয়ে এসেছি। যাকগে ওসব কথা। মিস্টার রিভোল্টার যা হাসাচ্ছিলেন না।'

গ্লেনের দিকে তাকাল রানা। 'আমাকে বলতে অসুবিধে আছে?'

'অবশেষে এখানকার সাংবাদিকরা খোঁজ পেয়ে গেছে আমার,' গ্লেন বললেন। 'লোকাল প্রেস থেকে একজন লোক এসে হাজির হয়েছিল একটু আগে। ইন্টারভিউ চাচ্ছিল। দিয়ে দিলাম। কেউ সাক্ষাৎকার চাইতে এলে আজ পর্যন্ত না দিয়ে পারিনি।'

'কোন কাগজ?'

আবার হাসতে আরম্ভ করলেন গ্লেন। 'মজাটাই তো সেটা। হাসলাম এ কারণেই।'

নিরেনসেনের দিকে তাকাল রানা। 'অটোয়াগ্যাগড়লিউটিট?'

মাথা ঝাঁকালেন সার্জেন্ট। 'আমি মিস্টার রিভোল্টারকে বোঝাচ্ছিলাম, কীভাবে তিনি এতক্ষণে অমর হয়ে গেছেন দুনিয়ার একমাত্র এস্কিমো ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজের পাতায়।'

'আর এই কথার পরে যদি আরেকটা ড্রিংক হয়ে না যায়, তা হলে কীসে হবে আমি জানি না,' গ্লেন বললেন।

মাথা নাড়লেন নিরেনসেন। 'না, আমি আর খাব না। এবার বন্ধ করা দরকার। আপনার সঙ্গে রাতে দেখা করব, রানা। অফিসে ফিরে ন্যাকের হেডকোয়ার্টার থেকে ওই প্লেনটার খবর জানলাম, গ্রীনল্যাণ্ড এক্সপিডিশন যেটা দেখতে পেয়েছে। লণ্ডন অ্যাণ্ড ইউনিভার্সাল ইনশিওরেন্স কোম্পানির মিস্টার মিচেল কোপেনহেগেনের মিনিস্ট্রি থেকে একটা সার্চ সার্টিফিকেট নিয়ে হেডকোয়ার্টারে দেখা করেছে। আমার ধারণা হেডকোয়ার্টার ওকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে।'

'ওরা বলেছে কি না জানি না, তবে ওই লোক আমার সঙ্গে দেখা করেছে।' সমস্ত ঘটনা খুলে বলল রানা। মিচেলের দেখা করা থেকে শুরু করে ডেভের সঙ্গে শেষ কথা বলা পর্যন্ত, সব।

'ডেভ যে নামার কোন জায়গা পায়নি, তাতে আমি অবাক হচ্ছি না। কিন্তু কুয়াশা না থাকলে লেক সিউল-এ প্রচুর পানি দেখতে পেত ও, যেখানে ফ্লোটপ্লেন নামানো সম্ভব।'

'আপনি শিওর?'

পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে রানাকে দিলেন সার্জেন্ট। 'নিজের চোখেই দেখুন থিউলির আমেরিকানদের প্রকাশিত আবহাওয়ার সাপ্তাহিক আঞ্চলিক খবর। এতে বলা হয়েছে, বছরের এ সময়ে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি গরম পড়েছে ওই এলাকায়।'

রিপোর্টটা পড়ে ফিরিয়ে দিল রানা। 'হুঁ। ওদের রিপোর্ট খুব নির্ভুল হয়।'

'তাতে কোন সন্দেহ নেই।' কাগজটা আবার পকেটে রেখে দিলেন সার্জেন্ট। 'তারমানে ওখানে না যেতে পারার কোন কারণ নেই। আগামী কাল গেলে কেমন হয়?'

জবাব দেয়ার আগে সময় নিল রানা। 'আপনি কি মিচেলের এজেন্ট?'

হাসলেন সার্জেন্ট। 'ওর সঙ্গে দেখাই হয়নি এখনও। এটা এখন অফিশিয়াল ব্যাপার, রানা। কর্তৃপক্ষ চাইছে আমি ওখানে যাই, নিজের চোখে দেখি, তারপর কোপেনহেগেনে একটা প্রাথমিক রিপোর্ট পাঠাই। আগামী বছরের আগে ওরা কাউকে ওখানে পাঠাতে পারবে বলে মনে হয় না। আমি রিপোর্ট পাঠালে, তার সঙ্গে এভিয়েশন এক্সপার্ট রয় ফ্লেচারের রিপোর্টের মিল থাকলে, ওরা সম্ভবত আর বেশিদূর এগোবে না। আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন?'

কিন্তু রানা ভাবছে অন্য কথা—প্লেনটা তা হলে ধ্বংস হয়নি! এই সন্দেহটা অবশ্য গত এক বছর ধরে বার বার হয়েছে ওর। আইস-ক্যাপের উপর পড়েছে ওটা, এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ওখানেই পড়ে আছে। কল্পনায় দেখতে পেল, সীমাহীন সাদার মাঝে পড়ে থাকা রূপালী-নীল প্লেনটাকে। কৌতূহল মাথা চাড়া দিচ্ছে। জানে, ওখানে না গিয়ে ও পারবে না।

'মনে হয় ম্যানেজ করতে পারব,' বলল ও। 'তাতে অবশ্য আমার আগামী দু'দিনের শিডিউল বদলাতে হবে। কিন্তু তত জরুরি কোন কাজ নেই।'

'গুড। সকাল সকাল রওনা হলেই ভাল। সাতটা নাগাদ রেডি থাকতে

পারবেন?'

'পারব। মিচেলের সঙ্গে কি আপনি কথা বলবেন, না আমি বলব?'

'আমিই বলব। পরিচয়টাও হয়ে যাবে।'

'যেতে হলে সবকিছু আমার জানা থাকা দরকার। মিচেলের কাছে জেনেছি, সিউল-এর দশ মাইল পুবে আছে প্লেনটা। যাব কী করে ওখানে?'

'অবশ্যই স্কি নিয়ে। দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব আমরা।'

'সেটা তো আপনি আর আমি পারব। বাকিরা? ওরা স্কিয়িং জানে কি না কে জানে।'

'যেতে হলে ওদের শিখে নিতে হবে,' সাফ কথা জানিয়ে দিলেন সার্জেন্ট।

'কার কথা বলছেন? মায়া নিভেন?'

'ওকে হালকা স্লেজে করে টেনে নেয়া যায়। কিন্তু স্কিয়িং না জানলে বাকি দুজনের হেঁটে যেতে হবে, আর কোনও উপায় নেই।'

'হুঁ।'

ক্যাপটা উল্টো করে বসিয়েছিলেন সার্জেন্ট, এখন সোজা করে বসালেন—ডিউটির সময় যেভাবে রাখতে হয়—বারের আয়নায় তাকিয়ে দেখে নিলেন ঠিক আছে কি না। 'এখন কোথায় যাবেন?'

'কেন?'

'যদি আপনাকে আবার প্রয়োজন হয়?'

'ফ্রেডেরিকসকোস্ট রেস্টুরেন্টে যাব ভাবছি।'

'ফ্রেডেরিকসকোস্ট? ঝামেলা বাধতে পারে, আগেই সাবধান করে দিচ্ছি। একটা পর্তুগিজ স্কুনার আসার কথা।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'জানি। আসার পথে ফিয়র্ডে ঢুকতে দেখে এলাম। কে আছে ওতে? আমার চেনা কেউ?'

'তেজো ডুয়েরো।' দুর্বোধ্য হাসি ফুটল নিরেনসনের ঠোঁটের কোণে। 'আমি হলে ওই রেস্টুরেন্টের ছায়াও মাড়াতাম না।'

সার্জেন্ট বেরিয়ে গেলে গ্লেন জিজ্ঞেস করলেন, 'তা এই তেজো ডুয়েরোটা কে? ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন?'

'ওরকমই কিছু। মাসে একবার করে সাপ্লাই নিতে আসে, আর এলেই ঝামেলা পাকায়। কোনদিন যে কাকে খুন করে বসবে! ইতিমধ্যেই কাউকে করে বসে আছে কি না—অন্য কোথাও—কে জানে!'

'শুনতে তো ভালই লাগছে,' গ্লেন বললেন। 'আমিও যাব তোমার সঙ্গে। বসে থাকতে থাকতে হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে। একটু নড়াচড়া দরকার। এই অবস্থায় রুথের সঙ্গে দেখা করারও সাহস পাচ্ছি না।'

'বেশ, যাবেন,' রানা বলল। 'আমার কিছু কাজ আছে। সেরে আসি। মিনিট পনেরোর মধ্যেই চলে আসব।'

গ্লেনকে বারে রেখে এসে, রিসিপশনের দিকে এগোল ও। ডেস্ক থেকে এয়ারস্ট্রিপে ফোন করল। জানিয়ে দিল, আগামী দুদিন যেতে পারবে না। একটা জরুরি সরকারি কাজে বাইরে যেতে হবে। ন্যাক আর সন্দ্রেতে যাদের কাজ নিয়েছে

ও, তাদেরকে বলে দিতে হবে—ওরা শিডিউল চেঞ্জ করুক, অথবা অন্য কাউকে দিয়ে ওদের কাজ করিয়ে নিক।

রিসিভার রেখে অপেক্ষা করতে লাগল রানা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফোন বাজল। এয়ারস্ট্রিপে যে লোকের কাছে ফোন করেছিল ও, সে জানাল, ন্যুক আর সন্দ্রেতে যোগাযোগ করেছিল। অসুবিধে নেই। ওরা শিডিউল বদলাতে রাজি হয়েছে।

নিজের ঘরে চলে এল রানা। কাপড় খুলে বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার নিল। ঘরে ফিরে অন্য কাপড় পরল। ভারী নরওয়েজিয়ান সোয়েটারে মাথা ঢুকিয়েছে, এমন সময় টোকা পড়ল দরজায়। খুলে দিল। রুথকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল দরজার বাইরে।

'গ্লেনকে খুঁজছি। ও কোথায়, জানেন?'

'জানতাম,' হাসিমুখে বলল রানা, 'তবে এ মুহূর্তে কোথায় আছে জানি না। ভবিষ্যতে কোথায় থাকবে, সেটা অবশ্য বলতে পারি। ফ্রেডেরিকসকোস্ট রেস্টুরেন্টে। মেইন স্ট্রিটের শেষ মাথায়।'

'তা হলে ওখানেই দেখা করব।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ওখানে যাওয়া উচিত হবে না আপনার। মাতাল জেলেদের আড্ডা। মদের ছড়াছড়ি আর ঘর ভর্তি সিগারেটের ধোঁয়া—ছোট্ট মেয়েদের জন্যে মোটেও উপযুক্ত নয়।'

'মাসুদ রানার মত ছোট্ট ছেলেরা যদি যেতে পারে, ছোট্ট মেয়েদেরও যেতে কোন বাধা নেই,' বলে গটমট করে করিডর ধরে হেঁটে চলে গেল রুথ।

ফ্রেডেরিকসকোস্ট ভদ্রলোকের জায়গা নয়। এ রকম রেস্টুরেন্ট পৃথিবীর সবখানেই আছে। এই বিশেষ রেস্টুরেন্টটা একটা দোতলা কাঠের বাড়িতে করা হয়েছে। দোতলায় কী আছে, সেটা যারা বানিয়েছে তারাই জানে। কিন্তু নীচতলার বারান্দা দিয়ে সুইং ডোর ঠেলে ঢুকলে যে মস্ত হলঘরটা পাওয়া যাবে, তাতে রয়েছে সাদাসিধে সুস্বাদু খাবার—যত ইচ্ছে, যে কোন ধরনের মদ, আর দরাজ দিল মহিলারা। দরজার পাশে রাখা চকচকে বড় জুক বক্সটা সারাক্ষণ ঝমাঝম করে মিউজিক বাজিয়ে যায়, কখনও বন্ধ হয় না।

ঘরের পিছন দিকে, বারের কাছে একটা টেবিল নিয়ে বসল রানা ও গ্লেন। দুজনের জন্য স্টেইক ও চিপস, আর গ্লেনের জন্য বিয়ারের অর্ডার দিল রানা। পুরোদমে মিউজিক বাজিয়ে চলেছে জুক বক্সটা। কয়েকজন তরুণ গ্রীনল্যাণ্ডার ওটাকে ঘিরে রেখেছে, ভদ্রতার মুখোশ খুলে ফেলে দিয়েছে যেন গা থেকে।

গুঙিয়ে উঠলেন গ্লেন। 'ধূর, আর কোন জায়গা নেই, যেখানে সত্যি সত্যি গা ছমছম করে? গ্রীনল্যাণ্ডে এসেছিলাম মেরু ভালুক আর প্রচণ্ড প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সিলের চামড়ার পোশাক পরা আদিবাসীদের নিরন্তর লড়াই দেখতে, কিন্তু এ কী দেখছি?'

'করডুরয়ের পোশাক আর রক মিউজিক।'

'তারচেয়ে আমেরিকায় বসে থাকলেই পারতাম। পুরানো শহরের কোনও

কুখ্যাত গলিতে। আর দু'এক বছর পরে এলে তো মনে হয় ওই ধরনের রেস্টুরেন্টও দেখতে পাব এখানে।'

মাথা নাড়ল রানা। তরুণ গ্রীনল্যাণ্ডারদের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'তাতে ওদের কোনও আপত্তি নেই। বরং বাধা দিলেই তিমির হাড্ডি কোপানোর কুড়াল তুলে ঘাড়ে কোপ মারতে আসবে।'

ভিড় বাড়ছে ক্রমে। দিনে বারো ঘণ্টা হাড়ভাঙা খাটুনি শেষে আসতে আরম্ভ করেছে নির্মাণ শ্রমিকরা, পেশাদার জেলে ও ফার শিকারির দল; ডেইন, আইসল্যাণ্ডার, নরউইজিয়ান, গ্রীনল্যাণ্ডার, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান, এস্কিমো—সব জাতের লোক রয়েছে তাদের মধ্যে।

'জানো, রানা, আমার বাবা খুব কড়া লোক ছিল,' খাবারের জন্য অপেক্ষা করতে করতে গ্লেন বললেন। 'বাবা যখন মারা যায়, আমার বয়েস তখন সাত। ভেঙে গেল আমাদের পরিবারটা। আমি উইসকনসিনে আমার আণ্টি হেজেলিনের কাছে থাকতে গেলাম।'

'ভাল ছিলেন ওখানে?'

'এরচেয়ে ভাল আর হয় না। আমাকে সিনেমায় নিয়ে যেতেন, বাবা যেটা কোনদিনই করেনি। সিনেমায় যাওয়াই বারণ ছিল আমার জন্যে। প্রথম যে ছবিটা আমার মনে দাগ কাটে, সেটার নাম "দি অ্যাডভেঞ্চারারস"। বার বার রিমেক হয়েছে ওটা। এখনও পরিষ্কার মনে আছে ছবিটার কথা। মানুষের স্মৃতি এক অদ্ভুত জিনিস। কখন যে কোনটা মনে পড়বে! কতকাল ওটার কথা মনেই ছিল না আমার, অথচ এ রকম একটা জায়গায় বসে মনে পড়ল।'

কালো সিল্কের পোশাক পরা একটা এস্কিমো মেয়ে খাবার নিয়ে এল। বেহায়ার মত হাসে। শরীরের অনেকখানি বেরিয়ে আছে পোশাকের বাইরে। খাবারের প্লেট টেবিলে রাখার সময় এতই নিচু হলো, বুকের চাপ লাগল গ্লেনের কাঁধে।

বার থেকে এক বোতল উইস্কি এনে দিতে বললেন গ্লেন। নির্লজ্জের মত তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটা। চোখে লাগানো নকল পাপড়ি নাচাল ঘন ঘন। নীরবে বলতে চাইল কী যেন। সাড়া না পেয়ে বারের দিকে চলল। ভিড়ের ভিতর দিয়ে এগোনোর সময় একজন চাপড় মারল ওর নিতম্বে, হাসির বিস্ফোরণ ঘটল। কিন্তু মেয়েটা কিছুই মনে করল না। কোনই প্রতিবাদ করল না যখন অয়েলস্কিন জ্যাকেট পরা দাড়িওয়ালা একজন জেলে টান দিয়ে ওকে গায়ের উপর টেনে এনে চুমু খেয়ে পাশের জনের দিকে ঠেলে দিল।

'রানা, আমার বমি পাচ্ছে,' গ্লেন বললেন। 'এক কালের এত গর্বিত একটা জাতির এই অবনতি!'

'ওদের দুর্ভাগ্য,' রানা বলল। 'ভাবতে খারাপই লাগে, আদিম মানুষগুলো তাদের স্বকীয়তা হারিয়ে তথাকথিত সভ্যতার খারাপ জিনিসগুলোই গ্রহণ করছে, ভালগুলো নয়।'

মাথা ঝাঁকালেন গ্লেন। 'কী আর বলব, আমেরিকান সূ ইনডিয়ানদের মত অভিজাত ইনডিয়ানদেরও এই অবনতি ঘটেছে। এতটাই অধপতন হয়েছে, গর্ব করার মত কিছুই আর অবশিষ্ট নেই ওদের। টুরিস্টদেরকে নোংরা খেলা দেখিয়ে

ওদের খাবার জোগাড় করতে হয়।'

'আর কিছুদিন পর আদিম জাতি বলতে কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না আর দুনিয়ায়।'

'আমারও তাই মনে হয়।' গ্লেনের মুখটা ভারী মেঘ জমা আকাশের মত থমথমে। বোতল আর দুটো গ্লাস এনে টেবিলে রাখল এস্কিমো মেয়েটা। সঙ্গে সঙ্গে বোতল থেকে গ্লাস ভরে মদ ঢাললেন তিনি।

'বুঝলে, রানা, রেইনডিয়ার শিকারে যাব ভাবছি। আইসবার্গ থাকবে ড্রাই-ডকে, বেরিয়ে পড়ার এটাই সুযোগ।'

'কোথায় যাবেন, ভেবেছেন?'

'হোটেলের বারম্যান বলল স্যাণ্ডভিগে গেলে ভাল হয়। ওদিকে নাকি এখনও কিছু পুরনো ভাইকিং বসতি আছে। বহুকষ্টে টিকে আছে ওরা। শিকার যদি না-ও পাই, ওদের দেখতে পেলে যাওয়ার কষ্টটা সার্থক হবে।'

'ভাইকিং দেখতে চান? আমি একজনের কাছে নিয়ে যেতে পারি আপনাকে,' রানা বলল। 'তাঁর নাম ডট জুনো।'

'জুনো? হোটেলের মেয়েটা—ডিটা জুনো—ওর কেউ হয় না তো?'

'ওর দাদা। এক ভাই ছিল, আমার বন্ধু, ওর নাম ছিল ডট জুনো জুনিয়র, দাদার নামে নাম। একটা কিলার ওয়েইল খুন করেছে ওকে। সে অন্য গল্প। বুড়ো ডট জুনোর বয়েস পঁচাত্তর, খাঁটি ভাইকিং। স্যাণ্ডভিগের কাছে একটা ফার্ম আছে তাঁর, আটশো ভেড়া আছে, কিন্তু খামারের কাজ না করে বেশিরভাগ সময় তিনি কাটান ওখানে প্রাচীন বসতির খোঁজে।'

'প্রত্নতাত্ত্বিক! তিনি আমাকে কয়েকদিন রাখবেন তাঁর বাড়িতে?'

'না রাখার কোন কারণই নেই—তাঁর দ্বিতীয় কাজ মেহমানদারি। কোন কারণে আবার রুথের কাছ থেকে পালাতে চাইছেন?'

'না, এবার পালাব না। যদি আসতে চায়, ওকেও সঙ্গে নেব। ওখানে যাব কী করে বলো তো?'

'সেটা আপনার ইচ্ছে। ডেভকে পাওয়া গেলে ওর প্লেন ভাড়া করতে পারেন, কিংবা সকালে আমার প্লেনে চড়তে পারেন—ঠাসাঠাসি করে বসতে হবে বুঝতেই পারছেন—সকাল ঠিক সাতটায় রওনা দিচ্ছি আমরা। আপনাকে স্যাণ্ডভিগে নামিয়ে দিতে পারব।'

'সকাল সাতটা বলে যে কোনও সময় আছে, মনেই পড়ে না,' গ্লেন বললেন। 'তবু, ওঠার চেষ্টা করব।'

এ সময় ওদের উপর চোখ পড়ল রানার—হিউগ মিচেল, রয় ফ্লেচার আর মায়া নিভেন দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। সবে ঢুকেছে তিনজনে। রানার উপর চোখ পড়তে সঙ্গীদের কিছু বলল মিচেল। তারপর হাসিমুখে এগিয়ে এল।

'সার্জেন্ট নিরেনসনের সঙ্গে কথা বললাম, মিস্টার রানা,' কাছে এসে বলল মিচেল। 'মনে হচ্ছে আমাদের সবারই প্লেনটার কাছে যাওয়ার একটা সুযোগ তৈরি হলো।'

'সেটা নির্ভর করছে ওখানে গিয়ে আমরা কী দেখতে পাব তার ওপর,' রানা

বলল। চেয়ারে বসছে তখন মিচেলরা। 'লেকে নামার মত অবস্থা যদি থাকেও, আবহাওয়া ভাল না থাকলে নামতে পারব না। এই তো, আজকেই, লেকের কাছে গিয়েও নামার সাহস হয়নি ডেভিড গোল্ডবার্গের, ভারী কুয়াশার কারণে। লেকটাকে ওপর থেকে দেখারও সুযোগ পায়নি।'

'সব সময়ই কি এমন হয়?' রয় জিজ্ঞেস করল।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সব সময়। এমনকী গরমকালেও। যখন-তখন শিলাবৃষ্টি, বৃষ্টি, কুয়াশা, তুষারঝড় শুরু হয়ে যায়। হঠাৎ করে কোথা থেকে যে উদয় হয়, বোঝাই যায় না। ঘণ্টাখানেক পরেই আবার সব পরিষ্কার, নীল আকাশ দেখা যায়, বিশ্বাসই করা যায় না। স্কি করতে পারেন?'

'আমি জন্মেছি, বড় হয়েছি অস্ট্রিয়ান টাইরলে,' রয়ের আগেই জবাব দিল মিচেল। 'পাঁচ বছর বয়েস থেকে স্কি করে স্কুলে যেতে হয়েছে। আর মিস্টার ফ্লেচার দুটো শীতের ছুটি ফ্রান্সে কাটিয়েছেন। সে-সময় যতখানি শিখেছেন, তাতে কাজ চালানো যাবে।'

'আমি জানি না,' মায়া বলল। 'তবে সার্জেন্ট নিরেনসেন বললেন, আমাকে নেয়ার ব্যবস্থা করা যাবে।'

'যতদূর শুনলাম, ডিলাক্স ভ্রমণ করানো হবে আপনাকে,' গ্লেন বললেন। 'এত দুর্গম জায়গায় বেড়াতে গিয়েও একটা চুল জায়গা থেকে নড়বে না আপনার। তা এখন একটা ড্রিংক হয়ে গেলে কেমন হয়?'

ভিড় বাড়ছে, কোলাহলও বাড়ছে। ছোট্ট ডান্স ফ্লোরে নাচছে অনেকে। অন্ধকার কোণ থেকে মাঝে মাঝেই ভেসে আসছে তীক্ষ্ণ চিৎকার, গ্লাস ভাঙার শব্দ, প্রতিধ্বনি তুলছে যেন ঘরের বাতাসে কুয়াশার মত ভেসে বেড়ানো সিগারেটের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে।

'উফ্, নিউ ইয়র্কের কানাগলির রেস্টুরেন্টকেও হার মানায়।' মায়ার দিকে ঝুঁকলেন গ্লেন, 'এরচেয়ে ভাল কোথাও বসতে চান?'

'নিশ্চয় এখানে আমাকে বিপদে পড়তে হবে না,' মায়া বলল। 'আপনারা তো আছেনই। সত্যি বলতে, আমার বরং ভালই লাগছে এখানে।'

মুহূর্ত পরেই ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা, দড়াম করে বাড়ি খেল দেয়ালে। দরজায় একটা দৈত্যকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। তেজো ডুয়েরো। পিছনে ওর আধডজন নাবিক। তেজোর পরনে মোটা কাপড়ের কোট, পুরানো ক্যাপটা টেনে বসানো তেলমাখা কালো চুলের উপর। শুয়োরের মত কুতকুতে চোখ, চ্যাপ্টা, কোদালের মত চোয়াল, চামড়ার রঙ এতটাই কালো ঘেঁষা, শরীরে নিগ্রো-রক্ত আছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না।

ঝমাঝম বেজে চলেছে জুক বক্স, দম নেয়ার সুযোগ পাচ্ছে না যেন, কিন্তু যটাকে কেন্দ্র করে যারা হুল্লোড় করছিল, তারা থেমে গেল। কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে গেল সবার। ফিরে তাকিয়ে একজন সঙ্গীকে কিছু বলল তেজো। কর্কশ হাসি হেসে উঠল সঙ্গীরা। এই হাসি বোধহয় ঘরের লোকগুলোর উদ্বেগ কমিয়ে দিল, আবার কথা বলতে শুরু করল ওরা। বারের দিকে এগোল তেজো, শর্টকাটে, ডান্স ফ্লোরের উপর দিয়ে। সামনে পড়তে চাইল না কেউ, দ্রুত সরে জায়গা করে দিল।

গ্লাসের মদ শেষ করে আবার ঢালল গ্লেন। 'তা হলে এই লোকই তেজো ডুয়েরো? ওর কাণ্ড দেখে তো মনে হচ্ছে মাথায় ঘিলু বলতে কিছু নেই।'

'মাথা নয়, ওর হাতের দিকে নজর রাখতে হবে আপনাকে,' রানা বলল। 'পচা ডালের মত মট করে আপনার হাতটাকে ভেঙে দিতে পারবে ও-দুটো।'

সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া দেখা গেল রয়ের মাঝে। সাদা হয়ে গেছে মুখ, চোখে অদ্ভুত আলো। টেবিলের কিনারে আলতো করে ফেলে রাখা হাতে নরম চামড়ায় তৈরি কালো দামি দস্তানা পরা, খাবার টেবিলে বসেও খোলেনি। আঙুলগুলো খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। লোকটার এই প্রতিক্রিয়া অবাক করল রানাকে। ভীষণ বিপজ্জনক লোক, বুঝতে পারল।

'পুরুষ বটে, তাই না?' মায়া বলল।

'সেটা নির্ভর করে কোন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাচ্ছ তুমি, তার ওপর, সুইটি।' সাবধানে একটা টার্কিশ সিগারেট ধরাল রয়, দস্তানা না খুলেই। 'আমি অবশ্য অবাকই হচ্ছি, মানুষের মত ওকে দুই পায়ে খাড়া হয়ে চলতে দেখে। আমি মনে করেছিলাম গত পাঁচ লক্ষ বছরে মানুষ জাতিটার অনেক উন্নতি হয়েছে।'

কথাটা ঠিকই বলেছে রয়—তেজো ডুয়েরো একটা জন্তু, নৈতিকতা বর্জিত বিবেকহীন একটা পশু, অসভ্য, নিষ্ঠুর, হিংস্র। কাউকে অপছন্দ হলে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিঁপড়ে মাড়ানোর মত পিষে ফেলতে দ্বিধা করবে না।

অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে গ্লেনের চোখে, যেটা মোটেও ভাল লাগল না রানার। আবার গ্লাসে উইস্কি ঢাললেন। 'একটা প্রবাদ আছে, জানো? যত বেশি বড় হয়, তত বেশি জোরে পড়ে।'

'এ ধরনের কথাবার্তা এখন খুব বিপজ্জনক, গ্লেন,' রানা বলল। 'কয়েকটা তথ্য আপনাকে জানানো দরকার। গোলমালটা কখনও নিজে শুরু করে না তেজো ডুয়েরো, অন্যকে দিয়ে করায়, আর এভাবেই এখন পর্যন্ত জেলে যাওয়া ঠেকিয়ে রেখেছে ও। তবে গোলমালটা শেষ করার ব্যাপারে কোন অনীহা নেই ওর। গত জুনে ন্যুকে একজন নাবিককে চিরকালের জন্যে খোঁড়া করে দিয়েছিল। গত মাসে এই বারেই একজন রেইনডিয়ার শিকারিকে পিটিয়ে আধমরা করেছিল।'

'তো আমাকে কী করতে বলো?' ভুরু নাচালেন গ্লেন। 'হাতজোড় করে বসে থাকব?'

এ সময় দরজা খুলে গেল আবার। ঘরে ঢুকল ডেভ। বগলের নীচে রুথের একটা হাত চেপে ধরে রেখেছে। রুথের পরনে দামি একটা ফারের কোট, মিংক বলেই মনে হচ্ছে, তবে নকলও হতে পারে। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে ঘরের ভিতর তাকাল। রানার উপর চোখ পড়তেই দৃষ্টি স্থির হলো। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইল, চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই, তারপর ফারের কোটটা খুলে ডেভের হাতে দিল।

সোনালি সুতোয় অলংকরণ করা সাংঘাতিক সেই পোশাকটা পরেছে ও। অস্পষ্ট আলোয় এমন করে জ্বলছে তাতে বসানো পুতিগুলো, যেন আগুন ধরে গেছে। যা করতে চেয়েছিল ও, করল, ঘরের সমস্ত কোলাহল যেন আরও একবার সুইচ টিপে স্তব্ধ করে দেয়া হলো, একমাত্র জুক যন্ত্রটা ছাড়া।

অবশেষে নড়ে উঠল ও। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রানাদের দিকে। আবার শুরু হলো উত্তেজিত হট্টগোল। কথাবার্তা হই-চইয়ের সঙ্গে হাসির শব্দও শোনা যাচ্ছে, বিশ্রী হাসি। অঘটনের আশঙ্কায় দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে রানা।

নয়

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন। দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে যেন সিনেমার ডায়লগ বললেন, 'অ্যাণ্ড বিহোল্ড, দেয়ার ওয়াজ আ উওম্যান অভ ব্যাবিলন।'

ঘণ্টাখানেক হলো ফ্রেডেরিকসকোস্টে এসেছেন, এর মধ্যেই আধ বোতল উইস্কি শেষ করে ফেলেছেন। প্রায় সারাদিনই খেয়েছেন, রেস্টুরেন্টে ঢুকে সেটার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছেন আরও। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, কথা বলার সময় হুঁশ থাকছে না কী বলছেন, কপালের উপর এসে পড়েছে এলোমেলো চুল।

ইতিমধ্যেই এদিকে তাকাতে শুরু করেছে লোকে। গ্লেন ও রুথ, দুজনেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ওদের। তাকানো দেখেই বোঝা গেল গ্লেনকে প্রায় সবাই চেনে। তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। একশো এগারোটা ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি, আর তার বেশির ভাগই পৃথিবীর বড় বড় ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। মারমুখো অভিনেতা গ্লেন রিভোল্টার—কখনও ওয়েস্টার্ন গানফাইটার, কখনও মাতাল নাবিক, কখনও বা প্লেন ওড়ানো অ্যাডভেঞ্চারার—অনেকেরই প্রিয় অভিনেতা। এতক্ষণ তাঁর উপস্থিতি খেয়াল করেনি কেউ, রুথ আসার পর ওকে দেখতে গিয়ে গ্লেনের উপর নজর পড়েছে সবার।

মিচেলদের সঙ্গে রুথের পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। একটা চেয়ার এনে দিল ডেভ। হাঁ করে তাকিয়ে আছে মিচেল, সুন্দরী নারীর উপর পুরুষের সেই পুরানো দৃষ্টি। রয়ও তাকিয়ে আছে, তবে মিচেলের মত করে নয়। মায়ার মুখে স্থির হাসি, রুথকে পছন্দ করতে পারছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। ওর পোশাক দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

রুথের কোমর জড়িয়ে ধরলেন গ্লেন। 'ডেভ, ভাবছি, আগামী কাল রুথকে নিয়ে স্যাণ্ডভিগে যাব, রেইনডিয়ার শিকার করতে। আমাদেরকে দিয়ে আসতে পারবে?'

'ইচ্ছে তো করছে,' ডেভ বলল। 'কিন্তু আগামী কাল সকালে যে আমাকে সন্দ্রে যেতে হচ্ছে।'

লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল মায়া, থেমে গিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

মায়ার দৃষ্টি এড়িয়ে রানার দিকে তাকাল ডেভ। 'রোলাফ নিরেনসন আমাকে বলেছে, তুমি নাকি সিউল-এ নামার চেষ্টা করবে।'

'হ্যাঁ,' রানা বলল।

'দেখো আবার, যে আবহাওয়ার রিপোর্টটা তোমাকে দেখিয়েছে, সেটা ঠিক

আছে কি না। ওর রিপোর্টের ওপর ভরসা করে আমি হলে যেতাম না।' রুথের কাঁধে হাত রাখল ডেভ। 'নাচবেন?'

চট করে রানার দিকে তাকাল একবার রুথ। তারপর চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'নাচব।'

'আমিও নাচব।' উঠে দাঁড়ালেন গ্লেন। মৃদু টলছেন। একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন মায়ার দিকে। 'এসো, কীভাবে নাচতে হয়, ওদের দেখিয়ে দিই আমরা। এহহে, তুমি করে বলে ফেললাম।'

'না না, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বলল মায়া, 'তুমি করেই তো বলবেন।'

অসন্তোষ চাপা দেয়ার চেষ্টা করেও পারল না মিচেল। সেটা দেখেও না দেখার ভান করল মায়া, গ্লেনের সঙ্গে চলে গেল। আগের মতই প্রচণ্ড শব্দে স্পিকার ফাটাচ্ছে জুক বক্স। খুদে ডান্স ফ্লোরটাতে ভিড়।

ওদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে পর্তুগিজদের দিকে তাকাল রানা। সবার নজর রুথের দিকে। চোখ দিয়েই যেন সমস্ত কাপড় খুলে নগ্ন করছে ওকে। এটা স্বাভাবিক, কিন্তু যে জিনিসটা রানাকে চিন্তিত করল, সেটা হলো কথা থামিয়ে দিয়েছে ওরা। বারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে তেজো ডুয়েরো, দুই হাত পকেটে, ঠোঁটে সিগারেট ঝুলছে। পাথর হয়ে গেছে যেন মুখটা। মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি সরছে না গ্লেনের উপর থেকে।

সহিংসতার গন্ধ পাচ্ছে রানা। ঘরে টান টান উত্তেজনা। ধোঁয়ায় ভরা বাতাসে ঘাম আর মদের গন্ধ। যে-কোন মুহূর্তে যা খুশি ঘটে যেতে পারে এখন। নিজের অজান্তেই দেহের পেশিগুলো শক্ত হয়ে যাচ্ছে ওর।

তবে ঘটনাটা ঘটল এমন একটা জায়গা থেকে, যেটার জন্য তৈরি ছিল না ও। জুক বক্সে নতুন মিউজিক লাগানো হয়েছে। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল রয়। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল ডেভের কাছে। কাঁধে টোকা দিল। ফিরে তাকাল ডেভ। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রুথকে ছেড়ে দিল।

ফিরে এসে টেবিলে বসল ডেভ।

মাথা নেড়ে রয় আর রুথের দিকে ইঙ্গিত করল রানা। 'ভালই নাচছে কিন্তু দুজনে।'

'ভাল না কচু,' আক্রোশ চাপা দিতে পারল না ডেভ।

নিজের একজন লোককে কী যেন বলল তেজো। বিশালদেহী, কুৎসিত চেহারা, ময়লা লাগা চামড়ার জ্যাকেট পরা লোকটার। কনুইয়ের গুঁতোয় ভিড় সরিয়ে এগিয়ে গেল ও, রয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, টোকা দিল কাঁধে। মাথা নাড়ল রয়। রুথকে ছাড়ল না। আবার ওর কাঁধে হাত রাখল পর্তুগিজ লোকটা। ওর হাতটা সরিয়ে দিল রয়, এবার অধৈর্য ভঙ্গিতে।

স্যাভেল রো সুট আর আরএএফ টাই পরা মেয়েলি চেহারার ইংরেজ লোকটা, এমনিতেই এ রকম একটা জায়গায় বেমানান, তার উপর এত সুন্দরী একটা মেয়ের সঙ্গে নাচছে, বেশির ভাগ লোকের দৃষ্টি ওর উপর, অনেকেই হিংসে করছে ওকে। এরপর যে ঘটনাটা ঘটল, চমকে দিল দর্শকদের, একমাত্র রানাকে বাদে।

হ্যাঁচকা টানে রয়কে নিজের দিকে ঘুরিয়ে ফেলল পর্তুগিজ লোকটা। কলার

চেপে ধরল। তারপর চোখের পলকে ঘটে গেল কয়েকটা ঘটনা। লোকটার দুই উরুর ফাঁকে লাথি মারল রয়। এত জোরে যে, চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, জুক বক্সের শব্দকে ছাপিয়ে শোনা গেল। পরমুহূর্তে ডান হাতের একপাশ দিয়ে কারাতে-কায়দায় লোকটার গলার পাশে কোপ মারল রয়।

কাটা কলাগাছের মত টলে পড়ে গেল লোকটা। এরপর যেন নরক গুলজার শুরু হলো। হুড়োহুড়ি করে চারদিকে সরে যেতে শুরু করেছে লোকজন। রুথকে জোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়ার সময় পেল শুধু রয়। তারপরই চারপাশ থেকে আক্রান্ত হলো। ওর প্রায় গায়ের উপর এসে পড়ল আরেকজন পর্তুগিজ। সামান্য পিছিয়ে গিয়ে লোকটার তলপেটে লাথি মারল রয়। তারপর হাত চালাল। একেও ফেলে দিতে দেরি হলো না।

আরও চারজন রয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এতজনকে একসঙ্গে কাবু করা সম্ভব হলো না। চেপে ধরে ওকে নুইয়ে ফেলল লোকগুলো।

এগোতে শুরু করেছে ডেভ। কিন্তু তার আগেই খেপা ষাঁড়ের মত গর্জন করে ছুটে গেলেন গ্লেন। একজন পর্তুগিজের ঘাড় চেপে ধরলেন এক হাতে, অন্য হাতে ওর প্যান্টের পিছনটা আঁকড়ে ধরে উঁচু করে ফেললেন, ছুঁড়ে ফেললেন একটা টেবিলের উপর। মেঝেতে ভেঙে পড়ল টেবিলটা। গ্লাস আর বোতল ভাঙার ঝনঝন শব্দ হলো। কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে গেল চারপাশে। মহিলা কণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল। রয়কে চেপে ধরা আরেকটা লোকের দিকে ফিরে তাকালেন গ্লেন। দ্রুত উপরে উঠে লোকটার ঘাড়ে নেমে এল তাঁর একটা হাত।

ছুটে গিয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠল ডেভ, জোড়া পায়ে লাথি মারল আরেকজন পর্তুগিজের পিঠে। ওকে নিয়ে দড়াম করে পড়ল মেঝেতে। পরস্পরের গলা চেপে ধরার চেষ্টা করতে করতে গড়াগড়ি খেতে থাকল। মাটিতে পড়ে গেছে রয়। বাকি একজন পর্তুগিজ ওর মাথায় লাথি মারতে যাচ্ছে। লোকটা পা তুলতেই হঠাৎ থেমে গিয়ে পা'টা চেপে ধরল রয়। প্রচণ্ড এক মোচড় দিয়ে হ্যাঁচকা টান মারল, মেঝেতে পড়ে গেল লোকটা। এতগুলো ঘটনা ঘটতে বড়জোর তিরিশ সেকেণ্ড লেগেছে।

রয়কে সাহায্য করতে এগোলেন গ্লেন। কিন্তু কাছে যেতে পারলেন না। তার আগেই তিন লাফে পৌঁছে গেল তেজো ডুয়েরো। প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে, ভিড় ঠেলে এত দ্রুত এগিয়েছে, ওর ক্ষিপ্রতা দেখে অবাক না হয়ে উপায় নেই। গ্লেনকে পিছন থেকে এক হাতে জড়িয়ে ধরল ও। অন্য হাতে পেঁচিয়ে ধরল গ্লেনের গলা।

রয় আর ডেভ তেজোর সহকারীদের সামলাতে ব্যস্ত, গ্লেনকে সাহায্য করতে যেতে পারল না কেউ। দুই হাতে খামচি মেরে গলা থেকে হাতটা সরানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন গ্লেন। লাল হয়ে যাচ্ছে মুখ।

হট্টগোল তুমুল পর্যায়ে পৌঁছেছে। রুথের চিৎকার শোনা গেল। বন বিড়ালের মত ঝাঁপ দিয়ে পড়ল তেজোর উপর। এক হাতে ওকে ঝেড়ে ফেলে দিল তেজো। গ্লেনের গলায় চাপ বাড়াল। ওর পাথরের মত মুখটায় ফুটেছে নিষ্ঠুর হাসি।

আর দেরি করা যায় না। ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল রানা। তেজোর পিছনে এসে দাঁড়াল। হাত রাখল ওর কাঁধে। তেজো ভাবল, আবার এসেছে রুথ। ঝেড়ে

ফেলতে গেল। কিন্তু রানার হাতে ধরা পড়ল হাতটা। বেকায়দা ভঙ্গিতে হাতে মোচড় খেয়ে বিকৃত হয়ে গেল তেজোর মুখ। চিৎকারটা বেরোল তার পর। অবাক হয়ে ফিরে তাকাল, দেখতে চায়, এ রকম করে কে এত ব্যথা দেয়। গ্লেনের গলায় ঢিল হয়ে গেল ওর হাতের চাপ। অবশেষে গলা মুক্ত করতে পারলেন গ্লেন।

প্রচণ্ড রাগে চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে তেজোর। মুচড়ে ধরা হাতটা ছাড়িয়ে নিতে গেল। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হলো না, হাতটা ছেড়ে দিয়েছে রানা। খেপা গ্রিজলির মত হাত চালাল তেজো। লাগাতে পারল না। চোখের পলকে সরে গেছে রানা। পরক্ষণে দেখা গেল, দুই হাত আর দুই পা দ্রুত ওঠানামা করছে ওর। ডাঙায় তোলা মাছের মত হাঁ হয়ে গেল তেজোর মুখ। অবাক বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেছে চোখ দুটো। কল্পনাই করেনি কোনদিন ওর চেয়ে সাইজে ছোট একটা মানুষ এভাবে পিটাতে পারে ওকে। রক্তাক্ত মুখের ভিতর থেকে টেনে বের করে আনল খসে যাওয়া একটা দাঁত। রেস্টুরেন্টের প্রতিটি লোক হাঁ করে স্তম্ভিত বিস্ময়ে চেয়ে দেখছে বুশ পাইলটের কাণ্ড। কয়েক সেকেণ্ডেই প্রায় ভর্তা করে দিয়েছে রানা তেজোর নাক-মুখ।

একটা চেয়ার তুলে নিয়েছেন গ্লেন। রানা বাধা দেয়ার আগেই তেজোর মাথায় বাড়ি মেরে ভাঙলেন চেয়ারটা। ধরাশায়ী হলো তেজো। মাথা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

একটা মদের বোতল তুলে নিয়ে গলাটা ধরে বারের কিনারে বাড়ি দিয়ে ভাঙলেন গ্লেন। ভয়ঙ্কর অস্ত্র। তেজোর বুকে এক পা তুলে দিয়ে বোতলের ভাঙা মাথাটা তেজোর চোয়ালের নীচে গলায় চেপে ধরলেন তিনি। তাঁর গলায় ব্যথা দেয়ার প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছেন। জোরে একটা খোঁচা দিলেই নালী কেটে যাবে।

ঠিক এই সময় পিস্তলের গুলির শব্দ হলো। মুহূর্তে থেমে গেল হট্টগোল। ফিরে তাকিয়ে রোলাফ নিরেনসেনকে দেখতে পেল রানা। উদ্যত পিস্তল হাতে এগিয়ে আসছেন।

'অনেক হয়েছে, এবার থামুন,' গ্লেনকে উদ্দেশ্য করে বললেন তিনি। 'এখন থেকে সব দায়িত্ব আমার।'

খুব সাবধানে আস্তে করে বোতলটা বারে নামিয়ে রাখলেন গ্লেন।

ফিরে তাকাল রানা। কার কী অবস্থা, এতক্ষণে দেখার সুযোগ পেল। মেঝেতে পড়ে মার খাওয়া কুকুরের মত হাঁপাচ্ছে তেজো। ডান্স ফ্লোরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে কপালের কাটা দাগ থেকে রক্ত মুছছে রয়। ডেভকে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করছে মায়া।

তেজো আর ওর ধরাশায়ী সঙ্গীদের—এখনও যাদের দাঁড়ানোর ক্ষমতা আছে—নিয়ে গিয়ে বারের কাছে সারি দিয়ে দাঁড় করালেন নিরেনসেন। দুজন এখনও মেঝেতেই পড়ে আছে বেহুঁশ হয়ে। গ্লেন যে লোকটাকে তুলে টেবিলে আছাড় মেরেছিলেন, তার একটা হাত ভেঙে গেছে, ভাঙা হাতটা অন্য হাত দিয়ে চেপে ধরে একটা চেয়ারে বসে আছে ও।

রানার কাছে এগিয়ে এলেন নিরেনসেন। পিস্তলটা উদ্যত। ওঁর ভয়টা আসলে তেজোকে। কখন আবার কী করে বসে, সেই আশঙ্কা করছেন। আহত বাঘের মত

জ্বলন্ত চোখে রানার দিকে তাকাচ্ছে দানবটা, দাড়ি থেকে রক্ত মুছছে।

'ঘরে যান, রানা,' ইংরেজিতে বললেন নিরেনসেন। 'আপনার বন্ধুকেও নিয়ে যান,' গ্লেনকে দেখালেন তিনি। 'আপনাদের সঙ্গে আমি পরে কথা বলব।'

রানার পাশে এসে দাঁড়াল রুথ। মুখ ফ্যাকাসে। কাঁপছে। তবে কথা বলার সময় শান্ত রইল কণ্ঠটা, 'এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল, রানা, সময় থাকতে।'

এক হাত বাড়িয়ে রানার হাত ধরল ও। টেনে নিয়ে চলল দরজার দিকে। পিছনে এগোলেন গ্লেন।

পুরো দুই মিনিট ঠাণ্ডা পানিতে শাওয়ার নিল রানা। তোয়ালে দিয়ে গা মুছে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। কাপড় পরছে, এ-সময় টোকা পড়ল দরজায়। ভেজানো পাল্লা খুলে ভিতরে ঢুকল ডেভ। ডান গালে চোয়ালের কাছে কালো দাগ হয়ে আছে, ঘুসি খেয়েছে ওখানে। এক হাতের উল্টো পিঠের চামড়া ছড়ে গেছে।

চওড়া হাসি হাসল ও। 'দারুণ একটা রাত, কী বলো? তোমার কী অবস্থা?'

'ভাল। গ্লেন কেমন আছেন?'

'রুথ আছে ওঁর সঙ্গে। আমি বাড়ি যাচ্ছি, এ কাপড়ে আর থাকতে পারছি না। আধঘণ্টার মধ্যে ফিরব। বারে দেখা হবে তোমার সঙ্গে।'

ডেভ বেরিয়ে গেলে কাপড় পরা শেষ করল রানা। করিডোরে বেরিয়ে গ্লেনের ঘরের দিকে চলল। দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে টোকা দিল পাল্লায়। দরজা খুলে দিল রুথ।

'কেমন আছেন উনি?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'নিজেই এসে দেখুন।'

বিছানায় চিত হয়ে আছেন গ্লেন। গায়ে মোটা লেপ। নাক ডাকাচ্ছেন। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে মুখ।

'কামড় বসিয়েছে অবশেষে উইস্কি,' রুথ বলল। 'জেগে উঠে হয়তো ভাববেন দুঃস্বপ্ন দেখেছেন।'

'আমারও কেমন বিশ্বাস হতে চাইছে না,' রানা বলল।

ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল রুথ। কিছু বলতে যাচ্ছিল, এ-সময় আবার টোকা পড়ল দরজায়। রুথ গিয়ে দরজা খুললে ঘরে ঢুকল মায়া নিভেন।

'মিস্টার রিভোল্টারকে দেখতে এলাম,' বলল ও।

বিছানার দিকে হাত তুলল রুথ। 'ওঁর ভক্তরা এখন এই অবস্থায় দেখলে কী করত দেখতে ইচ্ছে করছে!'

বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল মায়া। গ্লেনের দিকে তাকিয়ে আছে। 'প্রায়ই এমন করেন নাকি?'

'সপ্তায় চার-পাঁচ বার।'

বেডসাইড লকারে একটা কুমিরের চামড়ায় তৈরি ওয়ালেট রাখল মায়া। 'এটা রেখে গেলাম। ফ্রেডেরিকসকোস্টে পেয়েছি। মারামারি করার সময় নিশ্চয় ওঁর পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল।'

'এটা গ্লেনের, আপনি শিওর?'

মাথা ঝাঁকাল মায়া। 'হ্যাঁ। ভিতরে কী আছে দেখেছি। ওঁর নামে একটা চিঠি আছে।' দরজার দিকে এগোল ও। বেরোনোর আগে থেমে ফিরে তাকাল। 'মিস্টার রানা, দারুণ দেখিয়েছেন কিন্তু রেস্টুরেন্টে। এমন মারপিট শিখলেন কোথায়? আপনি সাহেব, সত্যিই চমকদার লোক। তেজোর ভাগ্য ভাল, সময়মত সার্জেন্ট এসেছিলেন। নইলে আপনি আর গ্লেন মিলে দানবটাকে মেরেই ফেলতেন।'

'না, মারতাম না। সামান্য শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতাম।'

'যা শিক্ষা দিয়েছেন, জীবনে ভুলবে না তেজো।'

আস্তে করে পিছনে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল মায়া।

রানার দিকে ফিরল রুথ। 'আমাদেরও যাওয়া উচিত। উনি ঘুমোন। কোথায় যাওয়া যায়? আমার ঘরে চলুন? কথা আছে।'

গ্লেনের পাশের রুমটাই রুথের। ঘরে ঢুকে জানালার কাছে গিয়ে বসল ও। ভণিতা না করে সরাসরি আসল কথায় এল, 'আচ্ছা, মিসেস নিভেন এখানে কেন এসেছেন, বলুন তো?'

সব কথা জানাল রুথকে রানা। মন দিয়ে শুনল ও। মৃদু ভ্রূকুটিতে কুঁচকে রয়েছে কপাল। রানার কথা শেষ হওয়ার পরও কুঁচকেই রইল।

'রয় কিন্তু একজন বীমা কোম্পানির লোক হিসেবে মারপিটটা একটু বেশিই জানে,' রুথ বলল। 'আর আপনিও কম দেখালেন না।'

'বিমান বাহিনীতে থাকার সময় আত্মরক্ষার কৌশল শেখানো হয়েছে আমাকে,' রানা বলল।

'কৌশলটা একটু বেশিই শিখেছেন,' রুথ বলল। 'খালি হাতেই মেরে ফেলতে পারতেন ওই দানবটাকে। আপনি কে, বলুন তো?'

'এই পৃথিবীরই একজন মানবসন্তান,' হাসিমুখে জবাব দিল রানা। 'যাকগে, গ্লেনের কথা বলুন। তাঁর আচরণ মোটেই স্বাভাবিক লাগেনি আমার। মদের ঘোরে এমনটা করলেন?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল রুথ। 'নাহ্, আপনার ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, মিস্টার রানা। যাকগে, দাঁড়ান এখানে। আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখাব।'

মিনিট দুই পরেই ফিরে এল রুথ। হাতে কুমিরের চামড়ায় তৈরি সেই ওয়ালেটটা, মায়া যেটা ফ্রেডেরিকসকোস্টে পেয়েছে বলেছে। ওয়ালেট থেকে একটা খাম বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল রুথ। 'নিন, পড়ুন এটা।'

পড়ল রানা। গ্লেনের জন্য খুবই খারাপ খবর। রক সিনাত্রার কোম্পানি আর ছবি বানাতে আগ্রহী নয়। যারা টাকা লগ্নী করে, তারাও গ্লেনের প্রতি আগ্রহ হারিয়েছে। দুঃখ প্রকাশ করে রক জানিয়েছে, কিছুই করার নেই আর তাদের। শুধু তাই নয়, ক্যালিফোর্নিয়ায় গ্লেনের স্থাবর-অস্থাবর যত সম্পত্তি আছে, সব নিলামে তোলা হবে খুব শীঘ্রি, আদালতের নির্দেশ পাওয়ামাত্র পুলিশ নিয়ে হাজির হবে পাওনাদাররা।

ভুরু কুঁচকে চিঠিটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। আস্তে করে ওর হাত থেকে সেটা টেনে নিল রুথ। ভাঁজ করে খামে ভরল।

'কিন্তু আমাকে মিথ্যে বললেন কেন তিনি?' রানার প্রশ্ন।
শ্রাগ করল রুথ। 'হয়তো নিজের পজিশন খাটো করতে চাননি।'
'আপনি সব জানেন?'
'জানি।'
'তা হলে আপনার যদি কোন লাভ না-ই থাকে, এলেন কেন?'
'কারণ, এই বিপদের দিনে ওর একজন বন্ধু দরকার।' একটা হাত কোমরে রেখে রানার দিকে তাকিয়ে আছে রুথ। 'আমার বিপদের দিনে ও আমাকে সাহায্য করেছিল। মাঝে মাঝে বিছানায়ও গেছি তার সঙ্গে, তবে সেটা একান্তই আমার ইচ্ছেয়। ও কখনও জোর করেনি।'
'হুঁ!' ঘড়ি দেখল রানা। 'ওহ্-হো, আমার জন্যে বারে অপেক্ষা করার কথা ডেভের। যাই এখন।'

বারে ঢুকে রানা দেখল ডেভের পাশে একটা টুলে রোলাফ নিরেনসেন বসে আছেন। রানাকে দেখে উঠে দাঁড়াল ডেভ। 'এখন এলে। দেরি দেখে আমি তো ভাবছিলাম, কী হলো। রুথ কোথায়?'
'ওর ঘরে। তবে এখন ওখানে যাওয়ার চিন্তা কোরো না। মেজাজ খুব একটা ভাল না।'
'মেয়েমানুষের মেজাজ ঠিক করতে আমার সময় লাগে না,' বলে বেরিয়ে গেল ডেভ।
টম্যাটো জুসের অর্ডার দিয়ে ডেভ যে টুলটায় বসেছিল, সেটাতে বসল রানা। 'আমার হাতে হাতকড়া পরাবেন কখন, সার্জেন্ট?'
কথাটাকে হালকাভাবে নিলেন নিরেনসেন। 'পরানোর দরকার হবে না আর। মিস্টার রিভোল্টার কোথায়?'
'ঘুমোচ্ছেন। সকালে উঠে যদি এ-সব ঘটনার কথা মনে করতে পারেন, অবাকই হব। পর্তুগিজগুলোর কী অবস্থা?'
'হাত-ভাঙাটাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। তেজো আর ওর সহকারীরা সব জাহাজে ফিরে গেছে। কড়া নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি, জাহাজ থেকে যেন আর না নামে। চলে যেতে চাইলে, চলে যাক। এই উপকূলের কোনখানেই যাতে আর নামতে না পারে, সেদিকেও নজর রাখব আমি।' বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিলেন তিনি। 'ভাগ্যিস, আজ সময়মত চলে এসেছিলাম। নইলে একটা খুনখারাপি ঘটে যেতে পারত।'
'তা ঠিক।'
রানার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'চলি। ঘরে গিয়ে ভালমত একটা ঘুম দিন। সকালে স্লিপওয়েতে দেখা করব।'
সার্জেন্ট চলে যাওয়ার পর টম্যাটোর জুস শেষ করে রানাও দোতলায় উঠে এল। শান্ত, নির্জন করিডর। নিজের ঘরের দরজার কাছে এসে ডেভের কথা মনে পড়ল। কী করছে ও? যা খুশি করুকগে...ভাবতে না ভাবতেই রুথের ঘরের ভিতর থেকে তীক্ষ্ণ, রাগত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

সোজা সেদিকে এগোল রানা। নব ঘুরিয়ে ঠেলা দিয়ে দরজা খুলে ফেলল। বিছানায় চিত হয়ে আছে রুথ, ওর গায়ের উপর উপুড় হয়ে, দুই হাত চেপে ধরেছে ডেভ, হাসছে। পিছন থেকে ওর কলার ধরে টেনে তুলে আনল রানা। ধাক্কা দিয়ে ফেলল দেয়ালে। মেঝেতে পড়তে পড়তে সামলে নিল ডেভ। উঠে বসল রুথ। টেনে সমান করল স্কার্টের নীচের দিকটা।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল রানা। 'আর কোন সাহায্য লাগবে?'

'হ্যাঁ, ওই বদমাশটাকে এখান থেকে নিয়ে যান।'

'চলো, ডেভ।'

ডেভের চোখে ভয়ঙ্কর দৃষ্টি। 'কাজটা ভাল করলে না, রানা।' ওকে এতটা রাগতে দেখেনি কখনও রানা। রুথের দিকে ফিরল ডেভ। 'এই যে, তোমার মনে রাখার জন্যে এই জিনিসটা ফেলে যাচ্ছি। এটা দেখে দেখে ডেভ গোল্ডবার্গকে মনে কোরো।'

বিছানায় কিছু একটা ছুঁড়ে ফেলে বেরিয়ে গেল ডেভ। দড়াম করে লাগিয়ে দিয়ে গেল দরজাটা। যে জিনিসটা ফেলেছে, ওটা বিছানা থেকে গড়িয়ে নীচে পড়ল। মেঝেতে উপুড় হয়ে নুয়ে বিছানার নীচে দেখল রুথ। জিনিসটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাতের তালু মেলে ধরল আলোর দিকে। সবুজ আগুন জ্বলছে যেন জিনিসটা থেকে। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে ওর।

হাত বাড়াল রানা, 'দেখি?'

জিনিসটা আলোর দিকে উঁচু করে ধরল ও।

'দামি কিছু?' রুথ জিজ্ঞেস করল।

রুথের তালুতে আবার জিনিসটা রেখে দিল রানা। 'এক হাজার, দু'হাজার, কিংবা বেশিও হতে পারে। বিশেষজ্ঞরাই ভাল বলতে পারবে।' চেহারাটা দেখার মত হয়ে গেল রুথের। রানা বলল, 'জিনিসটা পান্না।'

হতভম্ব হয়ে গেছে রুথ। 'গ্রীনল্যাণ্ডে পান্না পাওয়া যায় বলে তো শুনিনি।'

'আমিও শুনিনি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল রানা।

দশ

পরদিন সকাল সাড়ে-ছ'টায় এয়ারস্ট্রিপ ধরে হেঁটে চলল রানা। প্রথমে ওয়েদার রিপোর্ট নেবে। যদিও জানে, প্রয়োজন নেই, দেখেই বোঝা যাচ্ছে দিনটা ভাল যাবে। শান্ত পানি থেকে হালকা ধোঁয়ার মত কুয়াশা ওঠা, ঝকঝকে আকাশের গায়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো পর্বতমালার দিকে নজর বুলালেই বোঝা যায়, সহসা খারাপ হবে না আবহাওয়া।

টাওয়ার থেকে ফেরার পথে শর্টকাটে চলল ও। যুদ্ধের সময় আমেরিকানদের তৈরি করা দুটো কংক্রিটের হ্যাঙারের পাশ দিয়ে। ডেভ যে হ্যাঙারটায় প্লেন রাখে, সেটার বাইরে একটা জীপ দাঁড়ানো। হ্যাঙারের মস্ত স্লাইডিং ডোরটার মাঝে ছোট

জুডাস গেট লাগানো, সেটার দিকে এগোল রানা। গেট খুলে বেরিয়ে এল চিফ মেকানিক—একজন ক্যানাডিয়ান, নাম জিভস—সঙ্গে ডেভ। কিছু বলল দুজনে। তারপর জীপে চড়ে চলে গেল জিভস।

ঘুরে দাঁড়াতেই রানার উপর চোখ পড়ল ডেভের। ওর দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল রানা, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। এগিয়ে গেল ডেভের কাছে। 'কী হয়েছে?'

জবাব দিল না ডেভ। জুডাস গেটটা আবার খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। পিছন পিছন গেল রানা। আধো-আলোয় যেন গুটিসুটি হয়ে আছে এয়ারমাখি প্লেনটা, অর্ধেক ভর পেটের উপর, আর অর্ধেকটা কাত হয়ে থাকা এক ডানায়। দুটো স্কি-ই ভেঙে টুকরো টুকরো। আণ্ডারক্যারিজেরও প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। অঘটন ঘটানো হয়েছে যে জিনিসটা দিয়ে—পুরানো একটা তিন-টনি বেডফোর্ড ট্রাক—সেটাও দাঁড়িয়ে আছে প্লেনের কাছে। সাধারণ কাজের জন্য এয়ারস্ট্রিপে রাখা হয় ওটা। পিছিয়ে আনার সময় ধাক্কা লাগিয়েছে এয়ারমাখির গায়ে।

'কী হয়েছে?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা।

'জানি না,' ডেভ জবাব দিল। 'সকালে এসে দেখি এই অবস্থা। রাতে কাজ হয় না এখানে, জানো। জিভসের ধারণা কোন মাতালের কাজ। রাতে এসে এই কাণ্ড করেছে। মজা করার জন্যে ট্রাকে উঠেছিল, এই অবস্থা করে রেখে গেছে।'

'আমার বিশ্বাস হলো না,' জবাব দিল রানা।

ভারী নীরবতা বিরাজ করল কয়েকটা মুহূর্ত। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে দুজনে। একটা সময় রানার মনে হলো, যা ঘটেছে খুলে বলবে ওকে ডেভ, কিন্তু বলল না।

'জিভস বলছে প্লেনটা ওঅর্কশপে নিতে হবে,' ডেভ বলল।

'মেরামত করতে?'

'হ্যাঁ। দুদিন লাগবে।'

'দুদিনে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে, ডেভ।'

হাসল ডেভ। ওর হাসিটা স্বাভাবিক মনে হলো না রানার কাছে। 'তোমার কথা বুঝতে পারলে খুশি হতাম, রানা।'

'আমিও হতাম। যাকগে, আমি যাই।' জুডাস গেটের কাছে গিয়ে ফিরে তাকাল রানা। 'একটা কথা, কাল রাতে যে পাথরটা রুথকে দিয়ে এলে, ওরকম আরও পাথর পেলে আমাকেও একটা দিয়ো। বুড়ো বয়েসের জন্যে সঞ্চয় করে রাখব।'

জবাব দিল না ডেভ। মুখের হাসিটা ধরে রাখল, তবে আধো-আলোয় ওর চোখে ভয় দেখল বলে মনে হলো রানার। বেরিয়ে এল ও। বন্দরের দিকে এগোল।

৯

স্লিপওয়েতে রয়েছেন সার্জেন্ট নিরেনসেন, মিচেল, রয় আর মায়া। বিশালদেহী পুলিশ অফিসার আর রয় মিলে প্লেনে স্কি আর প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস তুলছে।

'আবহাওয়ার রিপোর্ট কী বলে?' রানাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন সার্জেন্ট।

'দিনের বেশির ভাগ সময় পরিষ্কার থাকবে। রাতে সামান্য কুয়াশা পড়তে পারে। তাড়াতাড়ি কাজ সারতে পারলে কুয়াশার আগেই বেরিয়ে আসতে পারব

আমরা।'

মাথা ঝাঁকালেন সার্জেন্ট। 'চলুন তা হলে। স্যাণ্ডভিগ-প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। একটা হালকা স্লেজ রেডি রাখতে বলেছি আমাদের জন্যে।'

পিছনে ইঞ্জিনের শব্দ শুনে ফিরে তাকাল রানা। হোটেলের ল্যাণ্ড-রোভারটাকে ছুটে আসতে দেখল রাস্তা ধরে। কয়েক গজ দূরে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল। প্রথমে নামল রুথ। ভেড়ার চামড়ার কোট গায়ে, স্কি প্যান্ট পরনে, আর চোখে স্নানগ্লাস। সুইটজারল্যাণ্ডের কোনও উইন্টার রিসোর্টে এই পোশাক টুরিস্টের গায়ে মানিয়ে যেত, কিন্তু গ্রীনল্যাণ্ডে বড়ই বেমানান। ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে এল হোটেলের পোর্টার। জিপ থেকে মালপত্র নামাতে লাগল। পাশের সিট থেকে লাফিয়ে নামলেন গ্লেন। পুরোপুরি সুস্থ। আগের রাতের মাতলামির কোন চিহ্নই নেই।

'এত সকালে উঠতে খুব কষ্ট হয়েছে,' খুশি খুশি কণ্ঠে বললেন তিনি। 'আরেকটু হলেই মিস করেছিলাম।'

রানার দিকে ফিরলেন সার্জেন্ট। ভুরু উঁচু করে জিজ্ঞেস করলেন, 'মিস্টার রিভোল্টারও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন নাকি?'

'স্যাণ্ডভিগ পর্যন্ত,' রানা বলল। 'উনি আর মিস ম্যাককেইন কয়েক দিন থাকবেন ওখানে, রেইনডিয়ার শিকার করবেন।'

সার্জেন্টের সন্দেহ গেল না। 'খুব ঠাসাঠাসি করে যেতে হবে।'

ডেনিশ ভাষায় বললেন তিনি, কিন্তু গ্লেন বুঝে ফেলেছেন মনে হলো।

'দেখুন,' গ্লেন বললেন, 'আপনাদের বিরক্ত করার কোন ইচ্ছেই আমার নেই। ঠিক আছে, কষ্ট হলে আপনাদের সঙ্গে না-ই গেলাম। ডেভকে নিয়েও যেতে পারব।'

'তা হলে অপেক্ষা করতে হবে আপনাদের,' রানা বলল। 'একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। তিন দিনের আগে আর এয়ারমাখিটাকে আকাশে ওড়াতে পারবে বলে মনে হয় না।'

কী হয়েছে জানতে চাইলেন সার্জেন্ট। সংক্ষেপে জানাল রানা। মিচেল আর রয়ের এ ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ দেখা গেল না, কিন্তু হাঁ করে প্রতিটি কথা যেন গিলল মায়া। দুই গাল লাল হলো সামান্য, যদিও চোখে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। রানার কথা শুনে গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন সার্জেন্ট। রানা বুঝল, ওর মতই সার্জেন্টও জিভসের ব্যাখ্যাটা মেনে নিতে পারেননি।

'বেচারা ডেভ! এমন সময় অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটল, বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল ওর।' গ্লেনের দিকে ফিরলেন সার্জেন্ট। 'রানা যদি আমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে পারে, আমার কোন আপত্তি নেই। তবে দেরি করা যাবে না, এখুনি রওনা হওয়া দরকার। প্রচুর কাজ পড়ে আছে। কাজ সেরে বেলা থাকতেই ফিরতে চাই—যদি সম্ভব হয়, আইস-ক্যাপে রাত কাটানোর কোন ইচ্ছেই আমার নেই।'

পোর্টারকে ওর পারিশ্রমিক বুঝিয়ে দিলেন গ্লেন। ল্যাণ্ড-রোভার নিয়ে চলে গেল লোকটা। ওঁর মালপত্র প্লেনে তুলতে লাগলেন সার্জেন্ট ও রয়।

রুথের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেল রানা। একধারে টেনে নিয়ে গিয়ে

নিচুস্বরে বলল, 'কাল রাতের কথা...মানে, ডেভ আপনাকে যে জিনিসটা দিয়েছে, সেটার কথা আপাতত কাউকে বলবেন না।'

রানার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রুথ। কালো সানগ্লাসের আড়ালে ওর চোখ দুটো দেখতে পেল না রানা। 'বেশ, বলব না। তবে প্রথম সুযোগেই আমাকে জানাতে হবে, কেন গোপন রাখতে চাইছেন কথাটা।'

এটা কোন প্রশ্ন নয়, তাই জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। প্লেনের কেবিনে উঠে মালপত্রগুলো দেখল কোথায় রাখা হয়েছে। কিন্তু প্লেন সম্পর্কে ভাল ধারণা আছে রয়ের, কোন ভুল দেখতে পেল না রানা। একেবারে সঠিক জায়গায় রেখেছে, এত বোঝা আর যাত্রী নিয়ে ভারসাম্য হারাবে না প্লেন। আবার নীচে নেমে এল ও।

এক এক করে সবাই উঠল। ফ্লোটগুলো শেষবারের মত চেক করল রানা। প্লেনের পাইলটের সিটে উঠে বসল। ট্যাক্সিইং করে পানিতে নামিয়ে প্লেন নিয়ে ছুটতে শুরু করল। নিরাপদেই উড়াল দিল পরিষ্কার আকাশে।

সাগর থেকে পঞ্চাশ মাইল ভিতরে স্যাণ্ডভিগ গ্রাম। অনেকগুলো ছোট ছোট দ্বীপ আর পাথুরে উপকূল কেটে ঢোকা ফিয়র্ড ওটাকে সাগরের আক্রমণ থেকে নিরাপদ বেষ্টনী দিয়ে রেখেছে। পর্বতের পাদদেশে সরু একটা শৈলশিরার উপর দাঁড়িয়ে এই গ্রামটা, প্রণালীর অন্যপাশ থেকে দেখতে খুব সুন্দর লাগে।

ফ্রেডেরিকসবর্গ থেকে রওনা দেয়ার ঠিক চল্লিশ মিনিট পর ছোট একটা সৈকতে প্লেন তুলে আনল রানা। খুব জমজমাট কোনও জায়গা নয় এটা। ডজনখানেক বাড়িঘর, ছোট একটা মোরাভিয়ান গির্জা আর ট্রেডিং কোম্পানির একটা স্টোর আছে। শিকার করে আনা সিলমাছের চামড়া আর হাঙরের যকৃত কেনে এরা, বিনিময়ে স্টোর থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে যায় স্থানীয় অধিবাসীরা।

প্লেনটাকে দেখে গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই ভিড় জমাল সৈকতে, কৌতূহলী চোখে দেখতে লাগল যাত্রীদের, বিশেষ করে গ্লেন আর রুথকে। এদের বেশির ভাগই খাঁটি এস্কিমো। খাটো, বলিষ্ঠ, মঙ্গোলিয়ান চেহারা। স্টোর থেকে কেনা কাপড়ের পোশাক পরনে, তবে পায়ে সিলের চামড়ার বুট।

স্টোর থেকে বেরিয়ে এল নিরেনসেনের প্রতিনিধি। পিছনে হালকা একটা স্লেজ টেনে এনে প্লেনে তুলে দিল দুজন লোক।

'সব ঠিক আছে তো?' রানার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন গ্লেন।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'জীপে করে আপনাদেরকে ডট জুনোর বাড়িতে পৌঁছে দিতে বললাম।'

'ইংরেজি তো জানে না,' গ্লেন বললেন। 'ওর সঙ্গে কথা বলব কী করে?'

'ভয় নেই, ঠিকমতই পৌঁছে দেবে আপনাদের।'

'তারপর, ফিরব কীভাবে?'

শ্রাগ করল রানা। 'রেডিওতে যে কোন সময় ফ্রেডেরিকসবর্গ এয়ারস্ট্রিপে যোগাযোগ করতে পারবেন। যখন আমাকে আসতে বলবেন, চলে আসব।'

রুথের দিকে তাকাল ও। মেয়েটার সঙ্গে একান্তে কথা বলা দরকার। তবে বলার উপযুক্ত সময় নয় এটা, তা ছাড়া সুযোগও নেই। রানার ভাবনাটা বুঝেই যেন ওর দিকে তাকিয়ে হাসল রুথ, মৃদু মাথা ঝাঁকাল। হাসিটা ফিরিয়ে দিয়ে কেবিনে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল রানা।

স্যাণ্ডভিগ থেকে ওড়া সাধারণত সহজ হয় না। ভুল দিক থেকে বাতাস বয়। তার কারণ, পাথরের হাজার ফুট দেয়াল প্রায় খাড়া নেমে গেছে ফিয়র্ডের সবুজ পানিতে। কিন্তু আজ সকালে ভাগ্য সহায়, তাই কোনরকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই আকাশে উড়ল অটার। গ্রামের সবুজ চারণভূমির উপর দিয়ে উড়ে এসে নাক ঘুরিয়ে ফিয়র্ডের পাথুরে দেয়ালকে একপাশে রেখে উড়ে চলল।

আরও চল্লিশ মিনিট পর সিউল-এ পৌঁছুল ওরা। কুয়াশার চিহ্নও নেই কোথাও। উচ্চতা কমাল রানা। সাগরের নীল পানির উপর দিয়ে উড়ে গেল। প্রচুর বরফ আছে, কিন্তু এতই পাতলা, কাঁচের চাদরের মত ভেসে রয়েছে পানিতে।

প্লেন আবার উপরে তুলে আনল রানা।

সার্জেন্ট জিজ্ঞেস করলেন, 'কী মনে হচ্ছে?'

'খারাপ না। তবে নামার আগে ওই প্লেনটা খুঁজে বের করা দরকার। সময় ও কষ্ট দুটোই বাঁচবে তা হলে।'

তিন-চার মিনিটেই দশ মাইল পেরিয়ে এল ওরা। কিন্তু হিরন বিমানটা চোখে পড়ল না। থ্রটল টানল রানা। ইঞ্জিনের গর্জন গুঞ্জনে রূপ নিল। কাঁধের উপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে কথা বলল ও, 'এখানেই কোথাও আছে প্লেনটা। নজর রাখুন সবাই। ডেভ বলেছে, একটা গিরিখাতের মধ্যে পড়েছে ওটা।'

দীর্ঘ চক্কর দিয়ে প্লেন নীচে নামাল ও।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকার দিয়ে উঠল রয়, 'ওই যে! ওই যে! বাঁয়ে! বাঁয়ে!'

মোড় নিয়ে আবার চক্কর দিল রানা। আরেকটু নীচে নামাল প্লেন। এবার সবাই দেখতে পেল ওটাকে। একটা গভীর গিরিখাতের মধ্যে নাক নিচু করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে বিমানটা। বরফের সাদা কার্পেটে ঝিলমিল করছে রূপালী ও নীল রঙ।

আবার প্লেন উপরে তুলে সিউল-এ ফিরে চলল রানা। গম্ভীর হয়ে আছে।

সামনে ঝুঁকল মিচেল। 'প্লেনটার কাছে যেতে কতক্ষণ লাগবে?'

'সেটা নির্ভর করে আপনার ওপর,' রানা বলল, 'আপনি কত দ্রুত স্কি করতে পারেন। ভাগ্য ভাল হলে দু'তিন ঘণ্টা।'

'ওখানে গিয়ে, প্লেনটা দেখে, আজ রাতে ফ্রেডেরিকসবর্গে ফিরতে পারব?'

'যদি আবহাওয়া গণ্ডগোল না করে।' লেকের উপর পাক খেয়ে প্লেন নামাতে আরম্ভ করল রানা।

নামাটা খুব সহজ হলো, এতটা আশা করেনি ওরা। বরফ নেই বললেই চলে। শুধু তীরের কাছে পাতলা হয়ে জমে আছে। ট্যাক্সিইং করে তীরে ওঠার সময় চাকার চাপে মুড়মুড় করে ভেঙে গেল।

অটারটাকে সৈকতে তুলে এনে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল রানা।

হঠাৎ করেই প্রচণ্ড নীরবতা যেন গ্রাস করল ওদের। ফিরে তাকিয়ে হাসল

রানা। 'নামলাম তো সহজেই। বাকি কাজটা এত সহজ হয় কি না দেখা যাক। নামুন সবাই।'

দরজা খুলে সৈকতে লাফিয়ে নামল ও।

এগারো

বরফ না থাকলে জায়গাটাকে জলাভূমি বলা যেত। নরম মাটি, পাঁকে ভরা। কিন্তু বরফ সবকিছুকে শক্ত করে দিয়েছে। বালিয়াড়ির মত দেখতে ছোট ছোট বরফের টিলা ছড়িয়ে গেছে যতদূর চোখ যায়, তীব্র সাদা আলোয় চোখ ধাঁধাচ্ছে দিগন্ত।

দলটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এগোল রানা। গলা থেকে ঝুলছে কম্পাস। নিরেনসেন আর মিচেল স্লেজটাকে টেনে নিয়ে চলেছেন। দুটো দড়ির এক প্রান্ত বাঁধা স্লেজের সঙ্গে, আরেক প্রান্ত কোমরে।

ওদের বেশ খানিকটা আগে চলেছে রানা। আধঘণ্টা পর থেমে ফিরে তাকিয়ে দেখল, পিছনের ওরা কতখানি এগিয়েছে। মিচেল আসলেই দক্ষ, কিন্তু রয় কুলাতে পারছে না। ওদের অন্তত একশো গজ পিছনে রয়। হুডওয়ালা পারকা আর কালো গগলসে বেশ ভারিক্কি লাগছে সবাইকে। এমনকী স্লেজে বসে থাকা মায়া নিভেনকেও। পায়ের উপর একটা কম্বল ফেলে রেখেছে ও।

আবার এগোতে শুরু করল রানা। বরফের টিলার পাশ কেটে, এঁকেবেঁকে। প্রচুর পরিশ্রমের কাজ, কিন্তু ওর খারাপ লাগছে না। বাতাস নেই। রোদেরও তেজ আছে। তাতে বরফের উপরটা সামান্য ভেজা ভেজা। একটা শৈলশিরার উপর উঠে থামল ও। চারপাশে তাকিয়ে নির্জন সাদা জগৎটাকে দেখল ভালমত।

দেখতে দেখতে কেমন অদ্ভুত অনুভূতি হলো ওর। মনে পড়ল অ্যামুণ্ডসেন, পিয়ারি আর জিনো ওয়াটকিনসের কথা। এই দুর্গম বরফের দেশে অভিযানে এসেছিলেন দুঃসাহসী ওই অভিযাত্রীরা। সেই একই দলে যোগ দিয়েছে এখন সে-ও, ভেবে গর্বই হলো। শৈলশিরার অন্যপাশের ঢাল বেয়ে নীচে নামল। বরফের উপর দিয়ে ছুটে চলল যেন নতুন উদ্যমে।

বরফের গায়ে এখানে অসংখ্য সরু ফাটল, জালের মত হয়ে আছে। কিছুদূর এগিয়ে ফিরে এল আবার।

'কোনও সমস্যা?' নিরেনসেন জিজ্ঞেস করলেন।

'হবে না, যদি সাবধানে চলা যায়। সরু সরু কিছু ফাটল আছে। তবে পিছন থেকে এখন স্লেজটাকে ঠেলতে হবে আমার, নইলে টেনে নিতে কষ্ট হবে আপনাদের।'

'আমি বরং নেমে হাঁটি,' মায়া বলল।

মাথা নাড়ল রানা। 'না, লাগবে না। আমরা পারব।'

শৈলশিরার উপর দেখা গেল রয়কে। থেমে বিশ্রাম নিল, তারপর পিছলে নেমে আসতে লাগল রানাদের কাছে। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গিয়ে গড়াতে লাগল নরম

তুষারে। ওকে ধরে তুলল রানা। ক্লান্ত দেখাচ্ছে, মুখে ঘাম।

'কী অবস্থা আপনার?' রানা জিজ্ঞেস করল।

হাসিতে উজ্জ্বল হলো রয়ের মুখ। 'প্র্যাকটিস নেই তো, এ ছাড়া ভালই আছি তবে ঠিক হয়ে যাবে।'

'পরের রাস্তাটুকু একসঙ্গে থেকে এগোনোই ভাল আমাদের,' রানা বলল। 'এ জায়গাটা আগের মত অতটা সহজ না। ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে পিছনে থেকে স্লেজ ঠেলায় সাহায্য করতে পারেন।'

পরের জায়গাটুকু পাড়ি দিতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল। বেশির ভাগ ফাটল সরু হলেও কোন-কোনটা তিন-চার ফুট চওড়া, আর গভীরতা অনুমান করা কঠিন এ-সব ফাটলের উপর দিয়ে ঠেলে নেয়া গেল না স্লেজ, তুলে উঁচু করে বয়ে পার করতে হলো। কোন কোন জায়গায় ফাটল ঢেকে দিয়ে ফাঁদ পেতে রেখেছে যেন তুষার, ওগুলোতে পা দিলেই ভিতরে ঢুকে যাবে, তলিয়ে যেতে হবে গভীরে নিরেনসেনের অভিজ্ঞ চোখই কেবল বাঁচিয়ে দিতে লাগল ওদের এ-সব ফাঁদ থেকে।

অবশেষে ফাটলওয়ালা জায়গাটা পেরিয়ে এল ওরা। দশ মিনিট বিশ্রাম নিল তারপর আবার রওনা হলো। এখানে চলাটা মোটামুটি সহজ হলো। বেশ খানিকটা জুড়ে ছড়ানো বরফের তেপান্তর। প্রতি দশ মিনিট পর পর থেমে অবস্থান পরীক্ষা করে দেখে নিচ্ছে রানা।

দুপুর নাগাদ একটা উঁচু জায়গার উপর দাঁড়িয়ে নীচের বরফে ঢাকা সমভূমির দিকে তাকাল ও। আকাশ থেকে যেটাকে সরু গিরিখাত মনে হয়েছে, সেটা আসলে একটা গভীর সঙ্কীর্ণ উপত্যকা। ঢাল বেয়ে দ্রুত নেমে এল ও। দেখার কিছু নেই এখানে। আঁকাবাঁকা পথে ছুটে চলল আবার।

একটা মোড় ঘুরতেই হিরনটাকে দেখতে পেল, নীচে পড়ে রয়েছে। তুষারে নাক গোঁজা। একটা ডানা ছিঁড়ে গিয়ে পড়েছে দু'শো গজ দূরে। এক পাশে কবর কতগুলো পাথর দিয়ে চাপা দেয়া। তাতে গুঁজে দেয়া হয়েছে একটা ক্রুশ। প্লেনের ফিউজিলাজ কেটে দুটো লম্বা টুকরো নিয়ে ক্রুশটা তৈরি করা হয়েছে।

নির্জন নীরবতার মাঝে চুপচাপ দাঁড়িয়ে প্লেনের ধ্বংসস্তূপটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। এতই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, অন্যরা যে কখন এসে হাজির হয়েছে, টেরই পেল না।

'অদ্ভুতভাবে মানিয়ে গেছে এই তুষারের মাঝে,' মিচেল বলল।

ফিরে তাকাল রানা। মায়াকে স্লেজ থেকে নামতে সাহায্য করছেন নিরেনসেন পিছনে একশো গজ দূরে রয়েছে রয়। রানার পাশে এসে হিরনটার দিকে তাকালেন সার্জেন্ট। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরবতার পর জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন।

'এখন করতে হবে সবচেয়ে অপ্রিয় কাজটা,' রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'নীচে নামবেন?'

প্লেনটার কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে একটা তাঁবু খাটানো হলো। তাতে ঢুকে প্রাইমাস স্টোভে চা বানাতে বসল মায়া। ইচ্ছে করেই ওকে কাজে ব্যস্ত রাখল রানা। নিরেনসেনের 'অপ্রিয়' কাজটা করার সময় দূরে সরিয়ে রাখতে চাইল। যেটুকু প্রয়োজন, তার বেশি সময় ওদের কাজের সময় কাছে থাকতে দিতে চায় না।

বেশি খোঁড়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অনেকটা পিরামিডের আকারে বসানো পাথরগুলোতে বরফ জমে এত শক্ত করে ফেলেছে যে, ইস্পাতের তৈরি বরফ খোঁড়ার বেলচা দিয়ে চাড় মেরে আলাদা করতে হলো। নিরেনসেনের সঙ্গে পাথর আলাদা করবার কাজে হাত দিল রানা, মিচেল ও রয় পাথরগুলোকে সরিয়ে রাখছে। প্রথমে একটা পা দেখতে পেল রানা, কিংবা বলা যায়, পায়ের অবশিষ্টাংশ। জুতোটা রয়েছে এখনও পায়ে, কিন্তু প্যান্টের ছেঁড়া কাপড়ের ভিতর দিয়ে জঙ্ঘার হাড় চকচক করছে। ওটা দেখার আগে পর্যন্ত কথাবার্তা চলছিল, কিন্তু তারপর একেবারে বন্ধ। এখন শুধু নীরবতাকে বিদীর্ণ করছে বেলচা দিয়ে বরফ খোঁচানোর শব্দ।

শেষ পাথরটাও সরানো হলো। অগভীর গর্তটায় দুটো লাশ পড়ে থাকার দৃশ্যটা বড়ই মর্মান্তিক। কফিন নেই। দুটো মানবদেহ ঢাকার চেষ্টা করা হয়েছে কিছু ছেঁড়া, পুরানো কাপড় দিয়ে। কঙ্কালের জায়গায় জায়গায় ছিন্নভিন্ন কিছু মাংস এখনও আটকে রয়েছে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে লাশগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করলেন নিরেনসেন, মিচেলের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার ওই ছবি দিয়ে এখানে বিশেষ কাজ হবে না, মিল্যানোর মত নেই কিছু। মিসেস নিভেন নাকি আপনাকে শনাক্ত করার জন্যে আরও কিছু দিয়েছে?'

পারকার জিপার খুলল মিচেল। ভিতর থেকে একটা খাম বের করে বাড়িয়ে দিল নিরেনসেনের দিকে। 'মিস্টার নিভেনের ডেন্টাল রেকর্ড।'

খাম থেকে সাদা একটা কার্ড বের করলেন নিরেনসেন। সেটা নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলেন কবরের কিনারে। ডানের লাশটাকে দেখলেন প্রথমে। তারপর অন্যটা দেখে উঠে দাঁড়ালেন। মাথা ঝাঁকালেন গম্ভীর ভঙ্গিতে। 'হ্যাঁ, ঠিকই আছে।' বাঁয়ের লাশটার দিকে আঙুল তুললেন, 'ওটা নিভেনের। আমার কোন সন্দেহ নেই। আপনিও দেখুন।'

কার্ডটা মিচেলের হাতে দিলেন নিরেনসেন।

সার্জেন্টের মতই একইভাবে হাঁটু গেড়ে বসে লাশগুলো দেখল মিচেল। কার্ডের সঙ্গে লাশের দাঁতের মিল আছে কি না পরীক্ষা করল। যখন উঠে দাঁড়াল, থমথমে হয়ে গেছে চেহারা। কার্ডটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। 'আপনিও দেখুন, মিস্টার রানা, প্লিজ। প্রমাণ করতে হলে আদালতে দুজন নিরপেক্ষ সাক্ষীর দরকার হবে।'

এক হাঁটু গেড়ে বাঁয়ের লাশটার পাশে বসল রানা। দাঁতের মিল পরীক্ষা করে দেখতে মিনিটখানেকের বেশি লাগল না ওর। দাঁত তো মিললই, তিনটে দাঁতে সোনার ফিলিং আর দুটোতে পোর্সেলিন ক্রাউনও পরিষ্কার।

উঠে দাঁড়িয়ে কার্ডটা মিচেলকে ফিরিয়ে দিল ও। 'হুঁ, মিল আছে।'

'তারমানে হয়ে গেল,' নিরেনসেন বললেন।

'বাঁ হাতের মধ্যমায় একটা সোনার আংটি থাকার কথা,' মিচেল বলল। 'আংটির পিছন দিকে খোদাই করে লেখা—ফ্রম মায়া উইথ লাভ—২১-৬-০৭।

আংটিটা পাওয়া গেল, আঙুলে মাংসও আছে, বরফে জমাট বেঁধে শক্ত। টানাটানি করে খোলার চেষ্টা করে বিফল হলো রানা। ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন নিরেনসেন। একটা স্প্রিং-ব্লেড হান্টিং নাইফ বের করে আংটির কাছ থেকে কেটে

আলাদা করে ফেললেন আঙুলটা। মুখটাকে স্বাভাবিক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন আঙুল থেকে আংটিটা খুলে নিয়ে পিছনের লেখা পড়লেন। নীরবে তুলে দিলে রানার হাতে। মিচেল যা বলেছে, ঠিক তা-ই লেখা রয়েছে আংটিতে।

একটা মুহূর্ত চুপচাপ থাকার পর রানা বলল, 'কোটটা ওর নিজের নয়।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালেন নিরেনসেন। 'মানে?'

'জ্যাকেটের ভিতরে যে ট্যাব লাগানো রয়েছে, তাতে দেখুন, নাম লেখা রয়েছে ব্রিক। তাই না, মিচেল?'

মাথা ঝাঁকাল মিচেল। 'পকেটে রিচার্ড ওয়াগনারের নামে আরও কিছু জিনিস পাওয়া যাওয়ার কথা।'

'তারমানে ছদ্মবেশ নিতে গিয়ে যথেষ্ট সাবধান হয়েছিল,' রানা বলল।

কিন্তু তথ্য ফাঁস করল না মিচেল। রানার কথার জবাবে বলল, 'কিছু প্রশ্ন থেকেই যাবে, যেগুলোর জবাব কেউ কোনদিন জানতে পারবে না।'

আগ্রহী মনে হলো নিরেনসেনকে। কিন্তু কী ভেবে কোনও প্রশ্ন করলেন না 'মিসেস নিভেনকে বোধহয় ডাকা যায় এখন।'

ডাকার প্রয়োজন হলো না। ফিরে তাকিয়ে রানা দেখল, মাত্র দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে মায়া। চোখে লাগানো প্রোটেকটিভ গগলস ওগুলোর আড়ালে চোখ দুটোতে কীসের খেলা চলছে, বোঝা কঠিন। তবে মিচেল যখন কাছে গিয়ে হাতের তালু মেলে আংটিটা দেখাল, মুখ সাদা হয়ে গেল ওর দস্তানা খুলে আংটিটা হাতে নিল এমন ভঙ্গিতে, যেন একটু এদিক ওদিক হলেই ওটা ভেঙে যাবে। তারপর টলতে আরম্ভ করল, মিচেল ধরে না ফেললে পড়ে যেত।

'তাঁবুতে চলুন,' কোমল কণ্ঠে বলল মিচেল। 'এখানে থেকে আর লাভ নেই।'

মাথা নাড়ল মায়া। 'না, আমি ওকে দেখব! না দেখে যাব না!'

টান দিয়ে মিচেলের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে গর্তের কিনারে হুমড়ি খেয়ে বসল ও। দশ সেকেণ্ডের বেশি লাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না, লাফিয়ে উঠে তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিচেলের দুই বাহুর মাঝে।

ওকে শান্ত করতে এগোল রয়। মায়াকে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে চলল ও আর মিচেল।

তাকিয়ে আছে রানা। ভাল, সত্যিই ভাল—ভাবছে ও। স্টেজে অভিনয় করলে নাম কামাতে পারত।

নিরেনসেনকে সঙ্গে নিয়ে হিরন বিমানটা পরীক্ষা করে দেখল রানা। নোটবুকে তথ্য লিখে নিতে লাগলেন সার্জেন্ট। ছিঁড়ে যাওয়া ডানাটাতে এখনও আটকে রয়েছে ইঞ্জিন দুটো। ওগুলোই আগে পরীক্ষা করল রানা। এমন অবস্থায় আছে, গোলমালটা কী হয়েছিল, দেখে বোঝা কঠিন। বাকি দুটো ইঞ্জিনও কোন সূত্র দিল না। প্লেনের ভিতরে সব তছনছ হয়ে আছে। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলটা ভেঙে হাজার টুকরো। প্রচুর রক্ত ছড়িয়ে আছে। জমাট বেঁধে বরফ হয়ে গেছে।

পাইলটের সিটে বসে রানাকে পরীক্ষা করতে বললেন নিরেনসেন।

বসল রানা। কোন ধরনের মানসিক সমস্যা না হলেও পেটের ভিতর এক

ধরনের খামচে ধরা অনুভূতি হলো ওর।

'কিছু বুঝলেন?' নিরেনসেন জিজ্ঞেস করলেন।

মাথা নাড়ল রানা। 'নাহ্, ভাঙাচোরা ইন্সট্রুমেন্ট দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ইঞ্জিন থেকেও কোন তথ্য পাওয়া যায়নি, যাতে বোঝা যায়, কী কারণে দুর্ঘটনাটা ঘটেছে।'

'আপনি কিছু অনুমান করতে পারেন না?'

'কী করে করব? তেল ফুরিয়ে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেনি, এটা ঠিক, কারণ অক্সিলারি ট্যাংকগুলোতে তেল আছে। বরং ধসে পড়ার পর কেন বিস্ফোরিত হয়নি, সেটাই বুঝতে পারছি না।'

'বেশ, অন্যভাবে ভেবে দেখা যাক। এখান থেকে আটশো মাইল দূর দিয়ে আটলান্টিক পাড়ি দেয়ার কথা ওদের, এখানে এল কীভাবে?'

'ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের কোনও ধরনের যান্ত্রিক গোলযোগ হতে পারে। এ ছাড়া আর তো কিছু বলতে পারছি না।'

সামান্য মাথা ঝাঁকালেন নিরেনসেন। তালুতে রাখা নোটবুকটা আঙুলের চাপ দিয়ে ঝটাৎ করে বন্ধ করলেন। 'হুঁ। আমারও তা-ই ধারণা। আর কিছু করার নেই এখানে। চলুন, চা খাওয়া যাক।'

প্লেন থেকে নেমে নামল দুজনে। নিরেনসেন তাঁবুর দিকে এগোলেন। ঝুঁকে বাঁ জুতোর ফিতে বাঁধার ভান করল রানা। একটা জিনিস চোখে পড়েছে ওর। একটা হলুদ দাগ। গ্রীনল্যাণ্ড এক্সপিডিশনের ওরা ফেলে যায়নি। তারও অনেক পরের দাগ ওটা, ইদানীংকার। তুষার দিয়ে দাগটা ঢেকে সোজা হলো রানা। এগিয়ে চলল নিরেনসেনের পিছন পিছন।

সাড়া পেয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল মিচেল ও রয়।

'কিছু পেলেন?' রয় জিজ্ঞেস করল।

'না,' জবাব দিলেন নিরেনসেনে। 'গ্রীনল্যাণ্ড এক্সপিডিশনের রিপোর্টের মতই হবে আমারটাও।'

'তা ঠিক।' মাথা ঝাঁকাল মিচেল। 'আমাদের তদন্তের কাজ শেষ করে আসি। যত তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারব, তত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারব।'

অ্যালুমিনিয়ামের মগে রানাকে চা দিল মায়া। আগ্রহের সঙ্গে চা'টা নিল রানা। খুব জরুরি দরকার এখন এ জিনিসটা। চা খেতে খেতে মায়ার দিকে তাকাল ও। মুখ এখনও সাদা। অনেক কষ্টে যেন স্বাভাবিক রেখেছে চেহারাটাকে।

'কীভাবে দুর্ঘটনাটা ঘটেছে, বুঝতে পেরেছেন?' রানাকে জিজ্ঞেস করল ও।

চট করে নিরেনসেনের দিকে তাকাল একবার রানা। মাথা ঝাঁকাল। 'মনে হয়।'

সংক্ষেপে মায়াকে বলল ও। আহামরি কোনও গল্প হয়নি ওটা, বুঝতে পারছে রানা। তবু বলে গেল। মায়ার আগ্রহ জাগানোর জন্য।

'তারমানে, আপনি বলতে চাইছেন, যান্ত্রিক গোলযোগ?' বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মায়া। 'এত সামান্য জিনিসের ওপর মানুষের জীবন নির্ভর করে, প্রাণ চলে যায়, ভাবাও যায় না...উহ্!'

মায়া কান্নায় ভেঙে পড়বে ভেবে শঙ্কিত হলেন নিরেনসেন, তাড়াতাড়ি সামনে ঝুঁকলেন। গভীর সমবেদনার সঙ্গে ওর কাঁধে হাত রাখলেন।

রানা ওর স্কি-র ফিতে বাঁধায় ব্যস্ত হলো।

'কোথায় যাচ্ছেন?' নিরেনসেন জিজ্ঞেস করলেন।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'একটু ঘুরে ফিরে দেখে আসব আশপাশটা। দেরি হবে না।'

বরফের উপর দিয়ে পিছলে আবার প্লেনের কাছে ফিরে এল রানা, নিঃশব্দে। প্লেনটার কাছ থেকে পাঁচ-ছয় ফুট দূরে দাঁড়াল। নিচুস্বরে কথা বলতে শুনল মিচেল ও রয়কে।

'কিন্তু এখানেই কোথাও আছে,' অধৈর্য শোনাল অস্ট্রিয়ান লোকটার গলা। 'আবার খুঁজে দেখা যাক।'

পিছলে আরও ফুট তিনেক এগোল রানা। ঘাপটি মেরে রইল, যাতে কেবিন থেকে ওরা ওকে দেখে না ফেলে। পাইলটের সিটের পিছনের জায়গাটায় খোঁজাখুঁজি করছে ওরা। কেবিনের গদিমোড়া লাইনিং ছিঁড়ে ফেলে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে রয়।

হঠাৎ পাশে তাকিয়ে রানাকে দেখে ফেলল মিচেল। খসে পড়ল ভদ্রতার মুখোশ। ওর চোখে খুনের নেশা দেখল রানা।

যেন কিছুই বোঝেনি এমন ভঙ্গিতে হেসে হাত নাড়ল রানা। 'কাজ করছেন? করুন। বসে থাকলে গা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ভেবে একটু ঘোরাফেরা করছি।'

জবাবের আশা না করে ঘুরে উপত্যকা ধরে ছুটতে শুরু করল রানা। একটা শৈলশিরায় উঠে থামল। কম্পাস দেখে অবস্থান নির্ণয় করল। কোথায় রয়েছে, দেখল। আরও একটা জিনিস দেখতে চায়। আকাশ থেকেই চোখে পড়েছিল, কিন্তু ওটা কী, বুঝতে পারেনি। সে এখন যেখানে রয়েছে, তার থেকে বেশি দূরে নয় জায়গাটা।

ছোট ছোট পাহাড় ও টিলার মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে পথ করে এগিয়ে চলল ও। মিনিট পনেরো পরেই পেয়ে গেল যা খুঁজছিল। পিরিচ-আকৃতির একটা অবতল জায়গা, তিনশো গজ হবে ব্যাস, নতুন তুষারে ঢেকে যাচ্ছে। পুরোটা ঢাকেনি এখনও, সেজন্যই উপর থেকে চোখে পড়েছে। আইস-ক্যাপের উপরে এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা জায়গাতেও স্কি প্লেন নামার দাগ ও চিহ্ন ঢাকতে সময় লাগছে তুষারের।

অবতল জায়গাটার এক প্রান্তে গোটা দুই চিহ্ন পেল রানা। অনেকটাই মুছে গেছে, কেবল ওর বিশেষজ্ঞ চোখ বলেই দাগগুলো দেখে বুঝতে পারল। সাদা বরফে বেশি প্রকট হয়ে আছে বেশ খানিকটা তেলের দাগ। তাড়াতাড়ি তুষার দিয়ে ঢেকে দিল ও।

সোজা হয়ে দাঁড়াতেই নাম ধরে ডাক শুনতে পেল। ফিরে তাকিয়ে দেখে, মিচেল। অবতল জায়গাটার অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। রানা ফিরে তাকাতেই ছুটে আসতে শুরু করল। তেল-পড়া জায়গাটার কাছে ওকে আসতে দিতে চাইল না রানা, তাই নিজেই ছুটে গেল ওর দিকে। কিন্তু দ্রুতগতিতে রানার পাশ কাটাল ও, থামল গিয়ে ঠিক সেই জায়গাটাতে, যেখানে তুষার দিয়ে ঢেকেছে রানা। চোখের

গগলস খুলে তুষার পরিষ্কার করল—মোছার ভান করছে, সন্দেহ হলো রানার, নিরাসক্ত ভঙ্গিতে চারপাশে তাকাল, তারপর আবার ফিরে এল রানার কাছে।

চেহারার বিনীত ভাবটা ফিরে এসেছে। চোখ দুটো চকচকে। তবে যা দেখার দেখে নিয়েছে, কোনই সন্দেহ রইল না রানার।

'খুব ভাল লাগছে, বুঝলেন,' হেসে বলল মিচেল। 'এত খোলামেলা বরফ এখানটায়, স্কি করার চমৎকার জায়গা। ভাবলাম, আপনার সঙ্গে আমিও ঘুরি। ও হ্যাঁ, রয় ওর কাজ সেরে ফেলেছে। এতটা তাড়াতাড়ি পারবে, ভাবিনি।'

'কিছু পেয়েছে?'

'উঁহুঁ। আপনি?'

মৃদু একটা বিনীত ভদ্রতা লেগে রয়েছে মিচেলের হাসিতে। এমনভাবে সামনে বাড়িয়ে রেখেছে মুখটা, যেন সত্যিই রানার কাছে কিছু জানতে চাইছে।

কিন্তু হতাশ করল ওকে রানা। 'নাহ্। আপনি যা জেনেছেন, তারচেয়ে বেশি কিছু না। এটুকু জানার জন্যে নিশ্চয় প্রচুর খেসারত দিতে হয়েছে, মানে, আমি বলতে চাইছি, প্রচুর খরচ হয়েছে আপনার।'

হাসিটা মুছল না মিচেলের। 'ও কিছু না। এ-সবে আমরা অভ্যস্ত। ইনশিওরেন্সের কাজ এমনই।'

আচমকা নড়ে উঠল ও। চলতে শুরু করল। পিছন থেকে তাকিয়ে রইল রানা। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে, বরফের উপর দিয়ে দ্রুত পিছলে চলে যাচ্ছে মিচেল, এ মুহূর্তে রানার কাছে ওকে লাগছে একটা ধূর্ত, বিপজ্জনক, বুনো জানোয়ারের মত।

চিন্তিত ভঙ্গিতে ওর পিছনে চলতে শুরু করল রানা। ওর জায়গায় অন্য যে কেউ হলে মিচেলের এই ভঙ্গিটাকে ভয় না করে পারত না। কিন্তু রানার বেলায় হলো অন্যরকম অনুভূতি। অদ্ভুত এক উত্তেজনা আর আনন্দ বোধ করছে ও। যেন একটা বাচ্চা ছেলে খেলাটায় এরপর কী ঘটে দেখার অপেক্ষায় রয়েছে।

বিকেল ছ'টার সামান্য আগে লেক সিউল-এ যখন পৌঁছুল ওরা। সারাদিনের পরিশ্রম সবার উপর চাপ ফেলতে আরম্ভ করেছে। বৈচিত্র্যহীন ফিরতি যাত্রায় আবহাওয়া গোলমাল করেনি, করলে ভীষণ বিপদে পড়তে হতো। আইস-ক্যাপের মাথায় ছোটখাট একটা তুষারঝড়ও মারাত্মক বিপদে ফেলে দিতে পারত।

দ্রুত মালপত্র তুলে নেয়া হলো। পানিতে প্লেন নামাল রানা। বরফ থেকে উঠে আসা হাড়-মজ্জা শীতল করা বাতাস হঠাৎ করে তুষারের ঘূর্ণি সৃষ্টি করল। কাঁধের উপর দিয়ে ফিরে তাকালেন নিরেনসেন। সূর্য ঢেকে দিয়েছে দিগন্তে জমা মেঘ।

'ঝড় আসছে, রানা,' নিরেনসেন বললেন। 'জলদি পালানো দরকার।'

বলার প্রয়োজন ছিল না, রানাও সেটা বুঝতে পারছে। খারাপ আবহাওয়ায় আধো-অন্ধ হয়ে গিয়ে এই পর্বতমালার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া আত্মহত্যার সামিল। শূন্যে উঠে, বাতাসের অনুকূলে মোড় নিয়ে, ফুল থ্রটল দিল রানা। ঝড়কে পিছনে ফেলার জন্য উড়ে চলল যতটা দ্রুত সম্ভব।

বিপদটা এল চল্লিশ মিনিট পর, যখন আইস-ক্যাপের কিনারে পৌঁছুল ওরা। মাথা

তুলে রাখা পর্বতশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে উড়ে চলেছে। সাগর থেকে আসা বৃষ্টি ধূসর চাদরের মত আঘাত হানল প্লেনের গায়ে। ভীষণভাবে দুলতে থাকল অটার।

স্যাণ্ডভিগ ফিয়র্ডের মাথাটা চোখে পড়তে আর দেরি করল না রানা, ডাইভ দিয়ে নিচু হয়ে উড়ে গেল কুয়াশার ভিতর দিয়ে। তিন-চারশো গজের বেশি দৃষ্টি চলে না, সেটাও কমে আসছে প্রতি মিনিটে।

'কী ভাবছেন?' ইঞ্জিনের গর্জনকে ছাপিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন নিরেনসেন।

'স্যাণ্ডভিগে রাত কাটানো ছাড়া উপায় নেই।' প্লেন নিয়ে দ্রুত নীচে নেমে চলেছে রানা। সময় থাকতে থাকতে ল্যাণ্ড করতে হবে।

বারো

সবুজ পাহাড়ের কোলে একটা শৈলশিরার উপর দাঁড়িয়ে আছে ডট জুনো সিনিয়রের বাড়িটা। ছয়-সাতশো ফুট নীচের গ্রামটার দিকে যেন আঙুল তুলে রেখেছে আদেশের ভঙ্গিতে। এই অঞ্চলের অন্যান্য বাড়িঘরের মতই এটাও তৈরি হয়েছে কাঠ দিয়ে, কারণ শীতকালে এ ধরনের বাড়িগুলোই বেশি আরামদায়ক। ডিজাইনটাও সুন্দর। সত্তর ফুট লম্বা এক হলঘরের মত বাড়ি, বিশ ফুট উঁচু, ভাইকিং পদ্ধতিতে বানানো। পাথরে তৈরি বিশাল ফায়ারপ্লেস।

হলের পিছনের অর্ধেকটা জুড়ে রয়েছে রান্নাঘর। দোতলায় আধ ডজন বেডরুম। ঘরগুলোর সামনে রেলিংঘেরা ব্যালকনি। খুব খাতির করে স্বাগত জানালেন রানা ও নিরেনসেনকে বুড়ো জুনো। শেষ মাথার বেডরুমটা দিলেন থাকার জন্য। জানালেন, গ্লেন আর রুথ গেছে পাহাড় দেখতে, গাইড হিসেবে নিয়ে গেছে একজন মেষপালককে।

ওয়াশস্ট্যাণ্ডের উপর দেয়ালে লাগানো ফাটা আয়নাটার সামনে দাড়ি কামাচ্ছে রানা। বিছানায় শুয়ে তাঁর পালা আসার অপেক্ষায় রয়েছেন নিরেনসেন। সিঁড়ির ল্যাণ্ডিঙে পায়ের শব্দ হলো এ সময়। একটু পরেই ঝটকা দিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেন গ্লেন।

কোমরে ঝোলানো কার্তুজের বেল্ট, বগলের নীচে চেপে ধরে রাখা উইনচেস্টার রাইফেল আর ধূসর দাড়িতে এ-মুহূর্তে তাঁকে লাগছে কর্সিকান দস্যুর মত, পাহাড়ের গোপন আস্তানা থেকে নেমে এসেছেন যেন লুণ্ঠন, রাহাজানি আর নারী-ধর্ষণের জন্য।

'এই যে, রানা, তোমাকে দেখে এত খুশি লাগছে!' চেঁচিয়ে বললেন তিনি। 'পৃথিবীর ছাতে চড়ে তো দেখে এলে। কেমন লাগল? এখনও কি সুস্থ আছেন মিসেস নিভেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এখনও তো আছেন।'

'না, ভালই আছেন।' শোয়া থেকে উঠে বিছানার পাশে পা ঝুলিয়ে বসলেন

নিরেনসেন। 'ওটা ওঁর স্বামীর লাশই। মিস্টার নিভেনের। আঙুলে একটা আংটি পাওয়া গেছে, যেটা স্বামীকে জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন মিসেস নিভেন। তবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হলো ডেন্টাল রেকর্ড। ওই একটা তথ্য, যা মিথ্যে বলতে পারবে না। আর এই দাঁতের রেকর্ড কত খুনিকে যে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে...'

'আমাকে ওসব বলার প্রয়োজন নেই,' বাধা দিয়ে বললেন গ্রেন, 'আমি এ-সব জানি। বহু ছবিতে চোর-পুলিশ খেলার অভিনয় করেছি।' রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'কাল সকালেই তো যাচ্ছ?'

'যদি আবহাওয়া ভাল থাকে।'

হাসলেন গ্রেন। 'দারুণ একটা সন্ধ্যা কাটবে আজ, ভাবতেও ভাল লাগছে। এখন যাই, পরে দেখা হবে।'

মুখ মুছে আয়নার সামনে থেকে সরে এল রানা। কাপড় পরতে পরতে ভাবল—সন্ধ্যাটা সত্যিই দারুণ কাটবে গ্রেনের। কেউ যদি মদ খেয়ে খুশি হতে চায়, তাহলে ডট জুনোর বাড়ির চেয়ে ভাল জায়গা আর পাবে না কোথাও।

ব্যালকনিতে বেরোতেই কানে এল রানার, রান্নাঘরে কারও সঙ্গে গর্জন করছে বুড়ো। হয়তো গ্রাম থেকে আসা কোনও এস্কিমো মহিলার সঙ্গে, যে তাঁর রান্নাবান্না করে দেয়। দড়াম করে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো। রানার নীচ দিয়ে হেঁটে গেলেন তিনি। দুই হাতে দুটো বোতল। মস্ত ফায়ারপ্লেসের সামনে টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

কিছু কিছু মানুষ জন্ম থেকেই অন্যদের চেয়ে আলাদা। তাদের ধমনীতে যেন রক্তের বদলে আগুনের স্রোত বয়ে যায়। কখনোই নিষ্ক্রিয় থাকতে জানে না। ডট জুনোও সে-রকম একজন মানুষ। জীবনের শুরুতে তিরিশটি বছর কাটিয়েছেন সাগরে সাগরে, পঞ্চাশ বছর বয়েসে নাবিকের কাজে ইস্তফা দিয়ে স্যাণ্ডভিগ গাঁয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছেন। ভেড়া পোষেন। এ কাজের জন্য তাঁকে খুব একটা সময় ব্যয় করতে হয় না। লোক রেখে দিয়েছেন, তারাই করে। এখানে তাঁর মূল কাজ, ভাইকিংদের সম্পর্কে গবেষণা করা, তাদের ইতিহাস জানা।

এ মুহূর্তে ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়ানো মানুষটাকে দেখে রানার মনে হচ্ছে—সেই প্রথম ভাইকিং সেট্‌লার এরিক দ্য রেড কিংবা লেইফ দ্য লাকি হিসেবে তাঁকে চালিয়ে দেয়া যায়। লম্বা চুল রেখেছেন কাঁধ ছুঁয়েছে, লম্বা দাড়ি নেমে এসেছে বুকের উপর। মধ্যযুগীয় একজন ভাইকিং যোদ্ধার মতই লাগছে ওঁকে।

রানা সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় ওকে দেখে ফেললেন বুড়ো। ডেনিশ ভাষায় চেঁচিয়ে বললেন, 'ভাগ্যিস কুয়াশা নেমেছিল, তাই তো তোমাদেরকে মেহমান হিসেবে পেলাম এখানে।'

ডট জুনোর নাতির সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল রানার, সেই সুবাদে বুড়োর সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা হলেও ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়নি। আগুনের সামনে একটা চেয়ারে বসল ও। 'আপনাকে দেখে অবাক লাগে আমার, এই বয়েসেও শরীর এত ফিট রাখলেন কী করে? অনেক কম লাগে কিন্তু আপনার বয়েস। রহস্যটা কী?'

'মেয়েমানুষ, রানা, মেয়েমানুষ,' গম্ভীর ভঙ্গিতে জবাব দিলেন ডট। 'তবে অবশেষে ওদের আকর্ষণ কাটিয়ে উঠেছি আমি।'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে রানা। 'তাই? কেন, গ্রাম থেকে কি এস্কিমো মেয়েরা আসে না আর এখন?'

'হপ্তায় দু'তিনবারের বেশি না। কমিয়ে ফেলেছি।' বলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন তিনি। আধ গ্লাস শ্ন্যাপস্ ঢেলে এক চুমুকে সেটা খেয়ে ফেললেন। 'আর তুমি, রানা? তোমার ব্যাপারটা কী? অন্যরকম লাগছে কেন তোমাকে?'

'তাই নাকি? অন্যরকম লাগছে? তা তো বুঝতে পারিনি।'

'দেখো, শরীর যদি ঠিক রাখতে চাও, মেয়েমানুষের দিকে নজর দাও, বয়। ঈশ্বর ওদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেনই পুরুষকে আনন্দ দেয়ার জন্যে। গুড লর্ডের ইচ্ছেই সেটা।'

প্রসঙ্গটা বদল করার জন্য রানা বলল, 'গ্রেনকে কেমন মনে হয় আপনার?'

'ইনটারেসটিং।' গ্লাসে আরও খানিকটা শ্ন্যাপস্ ঢাললেন ডট। 'বিশ বছর বয়েসে একটা ছোট জাহাজের ফার্স্ট মেট হয়েছিলাম, হ্যামবার্গ থেকে গোল্ড কোস্টে যাচ্ছিল ওটা। ফার্নান্দো পো-তে যখন ভিড়ল আমাদের জাহাজ, পীতজ্বর মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়েছে ওখানে।' আগুনের দিকে তাকিয়ে যেন অতীতের স্মৃতিগুলো দেখার চেষ্টা করছেন তিনি। 'সবখানে ছড়িয়ে আছে মৃতদেহ। বন্দরের পানিতে, রাস্তায়। সবচেয়ে করুণ দৃশ্য ছিল ধুঁকতে থাকা মানুষগুলো, যারা আক্রান্ত হয়েছিল, যারা জানত বাঁচার আর কোন আশাই নেই। চেহারাই বলে দিচ্ছিল, এক পা কবরে চলে গেছে। জীবন্মৃতের দল, যদি নাটকীয়ভাবে বলতে চাও।' মাথা নাড়তে লাগলেন তিনি। 'ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়!'

'রোমাঞ্চকর গল্প,' রানা বলল। 'কিন্তু এর সঙ্গে গ্রেনের সম্পর্ক কী?'

'সেই মানুষগুলোর মত একই ছাপ পড়েছে চেহারায়, চোখে-মুখে, সেই একই রকম নৈরাশ্য। তবে সব সময় নয়—একা একা যখন থাকে, তখন—মানুষের সামনে সাবধানে লুকিয়ে রাখে।'

ব্যাপারটা ভাবনায় ফেলল রানাকে। তবে বিষয়টা নিয়ে আর আলোচনার সুযোগ হলো না, সিঁড়ি বেয়ে নামতে দেখা গেল রুথকে।

'এই মেয়েটা—একটা সত্যিকারের মেয়েমানুষ,' ফিসফিস করে বললেন ডট, গ্লাসের মদটুকু দ্রুত গিলে নিয়ে উঠে গেলেন রুথের কাছে। ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন হলো শিকার?'

'পাওয়া যায়নি, তবে চারদিকের দৃশ্য চমৎকার। পাহাড়ে চড়ার কষ্টটা পুষিয়ে দিয়েছে।' রানাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল রুথ। 'হ্যাল্লো, রানা।'

রুথের দিক থেকে রানার দিকে চোখ ফেরালেন ডট। হেসে উঠলেন আচমকা। 'তারমানে—হুঁ, বুঝলাম। গুড, ভেরি গুড। হ্যাঁ, তোমরা কথা বলো। আমি দেখে আসি ডিনারের কী ব্যবস্থা হচ্ছে।'

'একজন অসাধারণ মানুষ,' ডট চলে গেলে রুথ বলল।

মাথা ঝাঁকাল রানা। ভাল করে তাকাল রুথের দিকে। নরওয়েজিয়ান সোয়েটার আর স্কি প্যান্ট পরেছে। এই পোশাকে, এই পরিবেশে খুব আকর্ষণীয় লাগছে ওকে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে হলের শেষ প্রান্তে হেঁটে গেল ও। ওক কাঠে তৈরি মস্ত

কড়িকাঠের দিকে তাকাল একবার। চোখ ফিরিয়ে তাকাল কাঠের দেয়ালের দিকে, যেখানে আড়াআড়ি সাজিয়ে রাখা হয়েছে বল্লম আর পালিশ করা লোহার বর্ম।

'এগুলো আসল?' রানাকে জিজ্ঞেস করল রুথ।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'গোটা হলঘরটাই আসল, ভাইকিং আমলের একটা বাস্তব নমুনা। হাজার বছরের পুরানো এই বাড়ি।'

'ডটকে দেখেও সেই আমলেরই মনে হয়।'

'আসলেই তো তাই।'

হঠাৎ করে নেমে এল ভারী নীরবতা, কেমন অস্বস্তিকর। সেটাকে কাটানোর জন্য রানা বলল, 'প্লেনটাকে খুঁজে পেয়েছি আমরা। মিসেস নিভেন তাঁর স্বামীকে শনাক্ত করেছেন।'

'মিসেস নিভেন আমাকে বলেছেন। একটা বেডরুম শেয়ার করতে হবে আমাদের। আর কিছু?'

'খুব হতাশ হয়েছে মিচেল আর রয়। একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছি, যেখানে ইদানীং একটা স্কি প্লেন ল্যাণ্ড করেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহী হয়ে উঠল রুথ। 'ডেভ?'

'এই উপকূলে আর কারও স্কি প্লেন আছে বলে তো জানি না।'

'তারমানে ডেভ যে পান্নাটা আমাকে দিয়েছে সেটা পেয়েছে ওই পড়ে যাওয়া প্লেনটার মধ্যে, তাই তো বলতে চাচ্ছেন?'

'অনেকটা সে-রকমই। আমার ধারণা, আরও অনেক পাথর ছিল ওখানে।'

'কিন্তু পাথরগুলো ওখানে আছে, ডেভ জানল কী করে?'

জবাব দেয়ার আগে ভাবল রানা। যা বলার নিজেকে বাঁচিয়ে বলতে হবে। 'মায়া নিভেন। ফ্রেডেরিকসবর্গে এসে প্রথম রাতেই ডেভের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ও। ব্যাপারটা অবাক করেছিল আমাকে, সন্দেহ হয়েছিল।'

'মিচেলকে না জানিয়ে গিয়েছিল?'

'যতদূর মনে হয়। আর সন্দেহটা বেশি হয়েছে সে-কারণেই।'

'কী করবেন?'

শ্রাগ করল রানা। 'আমি কিছু করতে যাব কেন? অকারণে অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর কী দরকার? অযথা ঝামেলা পোহানো।'

হাসতে লাগল রুথ। 'মিথ্যে কথা বলছেন আপনি, তাই না? ফ্রেডেরিকসবর্গে আপনি যে কাজটা করছেন—অর্থাৎ ভাড়ায় প্লেন চালানো—সেটা আপনার আসল পরিচয় নয়। আপনাকে দেখে মোটেও বুশ পাইলট মনে হয় না, মিস্টার রানা। আপনি তারচেয়ে অনেক বড় কিছু। ছদ্মবেশে ওই পাথরগুলোর ব্যাপারেই কিছু করতে আসেননি তো?'

'আপনাদের মত? আপনি যেমন ক্যারোলিন ফক্স হয়েও রুথ ম্যাককেইন সেজেছেন?' বলেই বুঝল রানা, ভুল করে ফেলেছে।

হাসি মিলিয়ে গেল রুথের মুখ থেকে। বেদনার ছাপ ফুটল সেখানে। 'আপনি এ কথাটা ভুলতে পারছেন না, তাই না?'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রুথের দিকে তাকিয়ে রইল রানা। এভাবে বলে ফেলার জন্য

আফসোস হচ্ছে। আঘাত না দিলেও চলত। কিন্তু রানাকে 'ছদ্মবেশী' বলাতে সতর্ক হয়ে গেছে ও। ভাবছে, কিছু একটা বলে রুথকে স্বাভাবিক করা দরকার, কিন্তু বলার সুযোগ পেল না। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল মিচেল ও রয়। মুহূর্ত পরেই মায়াকে নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ডট জুনো। একটু পরেই কথার কলরবে হারিয়ে গেল রানার ভাবনা।

খেতে বসল সবাই। সাধারণ খাবার, কিন্তু তৃপ্তিদায়ক। লেনটিল সুপ, ধূমায়িত কড মাছ, আর ভেড়ার মাংসের কাবাব। সবশেষে কফি। এবার আগুনের ধারে গল্প করতে বসল সবাই। গ্রীনল্যাণ্ডের আদিম সেট্‌লারদের নিয়ে।

আগুনের দিকে পিঠ দিয়ে আছেন ডট। হাতে ব্র্যাণ্ডির গ্লাস। রোমাঞ্চকর গল্প শোনালেন। দশ শতকে এরিক দ্য রেড যখন এই বরফে ঢাকা দ্বীপপুঞ্জগুলো আবিষ্কার করেছিলেন, তখনকার। হাজার হাজার আইসল্যাণ্ডার আর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান এসে সেট্‌ল্ করেছিল এখানে। আবহাওয়ার পরিবর্তন ধীরে ধীরে জীবনযাত্রা কঠিন করে তুলেছিল ওদের। আবহাওয়ার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বহু সেট্‌লার ফিরে গিয়েছিল তাদের পুরানো জায়গায়। ১৪১০ সালে ওদের শেষ বোটটা চলে যাওয়ার খবর পাওয়া যায়।

'সবাই চলে গিয়েছিল?' জানতে চাইল মায়া নিভ্রেন।

'বোধহয় না।'

'তা হলে যারা থেকে গিয়েছিল, তাদের ভাগ্যে কী ঘটেছে?'

শ্রাগ করলেন ডট। 'কেউ জানে না। পরের তিনশোটি বছর একেবারে ফাঁকা। আঠারো শতকে মিশনারিরা এসে শুধু এস্কিমোদের দেখেছেন।'

'আশ্চর্য!'

'হ্যাঁ, আশ্চর্যই। এবং রহস্যময়।'

সামান্য নীরবতার পর রয় জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, নরওয়েজীয় বীরত্বগাথায় নর্সম্যানদের আমেরিকা অভিযানের যে সব গল্প লেখা আছে, সেগুলো কী সত্যি, না পুরোটাই রূপকথা?'

বিষয়টা এতই পছন্দ হলো ডটের, সঙ্গে সঙ্গে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাতে। 'না, মোটেও রূপকথা নয়। তার বহু প্রমাণ রয়েছে। এখান থেকেও লোক গিয়েছিল, আমাদের এই গাঁয়ের ফিয়র্ড থেকে রওনা হয়েছিল ওদের বোট। এরিক দ্য রেডের ছেলে লেইফ দ্য লাকি সেই প্রথম ভাগ্যবানদের একজন।' নামগুলো এমনভাবে জোর দিয়ে উচ্চারণ করলেন ডট, কাঠের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল। কেউ কিছু বলছে না। তাকিয়ে আছে বুড়োর দিকে। 'ভিনল্যাণ্ড আবিষ্কার করেছিল ও—ভিনল্যাণ্ড দ্য গুড। ম্যাসাচুসেটস-এর কেপ কোডেরই বোধহয় এই নাম দেয়া হয়েছিল তখন।'

'কিন্তু,' মিচেল বলল, 'নোর্সদের তথাকথিত আমেরিকা আর ক্যানাডা আবিষ্কারের ইতিহাসকে তো গুজব বলে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে, তাই না?'

'উড়িয়ে দিতে চাইলেই তো আর দেয়া যায় না,' ডট বললেন। 'জোর করে সত্যিকে কখনও দাবিয়ে রাখা যায় না। বীরত্বগাথায় পরিষ্কার করে লেখা আছে, লেইফের ভাই থরভ্যাল্ড এরিকসন ইনডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন,

বগলে বিষাক্ত তীর ঢুকে গিয়েছিল তাঁর। ডেনিশ আর্কিওলজিস্ট অ্যাজি রাউসেল থরভ্যাল্ডের ভাইয়ের খামারবাড়িটা খুঁড়ে বের করেছেন স্যাণ্ডনেস গ্রাম থেকে, জায়গাটা এই উপকূলের ধারেই। আরও অনেক জিনিসের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন আমেরিকান ইনডিয়ানদের তৈরি তীরের ফলা। পাথুরে কয়লা পেয়েছেন, যে কয়লা পাওয়া যায় একমাত্র আমেরিকার রোড আইল্যাণ্ডে। এ ধরনের কয়লা কখনোই ছিল না গ্রীনল্যাণ্ডে।'

'রানা বলেছে, পুরানো ইতিহাস নিয়ে নাকি আপনি গবেষণা করেন,' গ্লেন বললেন। 'আপনি কখনও কিছু পেয়েছেন?'

'অনেক জিনিস। বীরত্বগাথায় লেখা আছে, থরফিন কার্লসেফিন ও তার স্ত্রী, গুদ্রিদ দ্য ফেয়ার, কিছুদিনের জন্যে আমেরিকার স্ট্রাউমসিতে সেট্‌ল্ করেছিল, নিঃসন্দেহে সে জায়গাটার বর্তমান নাম আইল্যাণ্ড অভ ম্যানহাটান। ওখানে তাদের একটা ছেলে হয়, নাম স্নোরি, আমেরিকায় জন্মানো প্রথম সাদা মানুষ।'

'আপনি সেটা বিশ্বাস করেন?' মিচেলের প্রশ্ন।

'না করার কোন কারণ নেই। পরবর্তীতে এই স্যাণ্ডভিগে এসে সেট্‌ল্ করে ওরা। ওদের সেই বাড়ির ধ্বংসস্তূপের উপরই নির্মাণ করা হয় আমাদের এই বাড়িটা। বহু বছর ধরে এখানে খোঁড়াখুঁড়ি চালিয়েছি আমি...' প্রবল উৎসাহে কথা বলছেন তিনি।

'কিছু নমুনা আমাদের দেখাতে পারেন?' মিচেল জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়।' গ্লাস রেখে উঠে দাঁড়ালেন ডট। সবাইকে নিয়ে গেলেন হলের উল্টো দিকের শেষ মাথায়, রানা বাদে।

এ-সব বিষয়ে আগ্রহ নেই রানার তা নয়, কিন্তু ডিসপ্লেতে রাখা জিনিসগুলো আগেও দেখেছে ও। তা ছাড়া বাইরের তাজা বাতাসের জন্য প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে ওর। ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে সবার কাছ থেকে সরে গেল ও। আস্তে করে দরজা খুলে বাইরে বেরোল।

এগারোটা বাজে। বছরের এ সময়টায় মধ্যরাতের আগে পুরোপুরি অন্ধকার হয় না। বৃষ্টি আর কুয়াশার কারণে আলোও ততটা নেই, কেবল একটা জ্বলজ্বলে আভা বিরাজ করছে।

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে এখন। পাথরে বাঁধানো চত্বরে পড়ে লাফাচ্ছে বড় বড় ফোঁটাগুলো। মাথা নিচু করে এক দৌড়ে চত্বরের অন্যপাশের গোলাঘরে চলে এল রানা। মস্ত একটা ঘর। নতুন খড়ের গন্ধে ভরা। একপাশে একটা মই উঠে গেছে পাটাতনে। সেটা বেয়ে উপরে উঠে গেল ও।

পাটাতনের উপরেও আরেকটা ঘর। খড় দিয়ে অর্ধেক ভর্তি। উল্টোদিকের একটা দরজা খোলা। বাতাসে বার বার বন্ধ হচ্ছে আর খুলছে ওটা। বৃষ্টির মিহি কণা ঢুকছে ভিতরে। তিরিশ ফুট নীচে পাথরে বাঁধানো চত্বরে নেমে গেছে কাঠের কপিকলে পরানো দড়িতে বাঁধা ভারী হুক। এর সাহায্যে চত্বর থেকে খড়ের আঁটি তোলা হয়। ছোটদের জন্য রীতিমত স্বর্গ পাটাতনের উপরের এই ঘরটা। এখান থেকে পুলির দড়িতে ঝুলে নীচে নামা আর উপরে ওঠার খেলাটা ভাল লাগবে না, এমন কিশোর ছেলে কমই আছে। পুলিতে ঝুলে নীচে নামার প্রবল ইচ্ছেটা অনেক

কষ্টে দমন করল রানা। বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ছোটবেলার কথা ভেবে নসট্যালজিয়ায় ভুগতে লাগল।

নীচতলায় দরজা খোলার শব্দ হলো। মৃদুকণ্ঠে ডাক শোনা গেল, 'রানা?'

পাটাতনের কিনারে এসে নীচে উঁকি দিল রানা। রুথ দাঁড়িয়ে আছে। ডিনারের সময় যে পোশাকটা পরেছিল, সেটাই পরা আছে এখনও। তার উপর গায়ে চড়িয়েছে একটা ভেড়ার চামড়ার কোট।

উপর দিকে তাকিয়ে রানাকে দেখে হাসল ও। 'ওখানে আরেকজনের জায়গা হবে?'

'হবে। চলে আসুন।'

মই বেয়ে উপরে উঠে এল রুথ। দুই হাত পকেটে ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'পালালেন কেন? ডট জুনোর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ভাল লাগবে না ভেবে?'

'লাগবে না মানে? প্রথম যখন এ বাড়িতে এসেছিলাম, দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম,' রানা বলল। 'ঘরের মধ্যে দম আটকে আসছিল। এত ভিড় ভাল লাগছিল না। তাই খানিকটা বাতাস খেতে এসেছি।'

'বেশি মানুষের মধ্যে তো আমিও ছিলাম।'

'ছিলেন, তবে আপনাকে খারাপ লাগছিল না।'

খোলা দরজাটার দিকে এগোল দুজনে। একটা বাক্সের উপর বসে সিগারেট ধরাল। 'সব সময়ই কি এমন লাগে আপনার? বেশি মানুষের ভিড়ে ঠাসাঠাসি লাগে?'

'বেশির ভাগ সময়েই লাগে।'

হেসে মাথা ঝাঁকাল রুথ। 'আপনি আমাকে বলেছেন, গ্রীনল্যাণ্ডে কাজের সন্ধানে এসেছেন, এখানে বেশি টাকা কামাতে পারেন। কথাটা ঠিক নয়, তাই না?'

বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রানা বলল, 'বড় বড় শহরে গাড়িঘোড়ার ভিড়, গাড়ি পার্ক করাটা পর্যন্ত একটা ঝামেলা। আর এখানে কোন ভিড় নেই, কোলাহল নেই, প্রতিটি দিন নতুন লাগে—ম্যান এগেনস্ট ওয়াইল্ডারনেস—এভাবে বলতে পারেন কথাটা। সব সময় মানুষকে সতর্ক থাকতে বাধ্য করে, ঝিমোতে দেয় না। দুনিয়ায় এ রকম জায়গা এখন কমই অবশিষ্ট আছে।'

'কতদিন থাকবে আর?'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল রানা। 'সে-ই তো মুশকিল। টুরিস্টদের আরাম-আয়েশের জন্যে আশপাশের শহর আর দ্বীপগুলোতে যেভাবে হোটেল-মোটেল-এয়ারপোর্ট গড়ে উঠছে, খুব বেশিদিন এ জায়গাটাও ঝামেলামুক্ত থাকবে না। টুরিস্ট যাতায়াত শুরু করলে যে-কোন জায়গা তার আদিম সৌন্দর্য হারায়।'

'আপনি তখন কী করবেন?'

'নতুন জায়গার খোঁজে চলে যাব।'

'নতুন কোনও মিশন নিয়ে, আমার ধারণা?'

ভ্রূকুটি করল রানা। 'বুঝলাম না।'

'সিনেমার ডায়লগ বললাম। একঘেয়েমিতে ভোগা একটা সাংঘাতিক রোগ, মিস্টার রানা। জীবনের কখনও না কখনও সবাই আমরা এই রোগের শিকার

হয়েছি, কিংবা হই। তবে আপনাকে দেখে অন্যরকম মনে হয়, মানে ভোগার সুযোগই পান না আপনি। যতদূর বুঝতে পারছি, আপনি একজন দুর্ধর্ষ বুশ পাইলট, ইস্পাতের স্নায়ু, যে-কোন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারেন, যে-কোন বিপদের মোকাবেলা করতে পারেন।'

'এ ব্যাপারে আপনি কি শিওর হয়ে গেছেন?'

রানার প্রশ্নের জবাব দিল না রুথ। বলে গেল, 'ডট জুনো নিজেকে এখনকার ভাইকিং ভাবেন। গ্লেন জীবনে এত কিছু হতে চেয়েছেন, কোন্‌টা যে চান আর কোন্‌টা চান না, সেটা বোঝাই কঠিন। অভিনয় করতে করতে বাস্তবতাই ভুলে গেছেন। বাস্তবতার সঙ্গে সিনেমাকে মিশিয়ে ফেলেন।'

'আপনি এতসব মানসিক সমস্যার কথা জানলেন কীভাবে?'

'ইউনিভার্সিটিতে বছরখানেক সাইকোলজি আর সোশ্যাল ফিলসফি পড়েছি।'

অবাক হয়ে রুথের দিকে তাকিয়ে রইল রানা। 'আরও পড়লেন না কেন?'

শ্রাগ করল রুথ। 'মনে হলো, এ-সব পড়ালেখা আমার জন্যে নয়। বই মুখস্থ করে করে লেকচারার হওয়াটা জীবনের একটা মস্ত ফাঁকিবাজি।'

মাথা নাড়তে লাগল রানা। 'আশ্চর্য। আমি ভেবেছিলাম, আপনাকে চিনেছি। এখন মনে হচ্ছে কিছুই চিনিনি।'

'আমার সম্পর্কে গ্লেন কী বলেছে আপনাকে?'

'ক্যারোলিন ফক্সের কথা তো? বেচারি! লণ্ডনের ইস্ট এণ্ডে বাসা, টাকার অভাবে সিনেমায় নামতে বাধ্য হয়েছেন, আপনার বাবা মাইল এণ্ড রোডের একজন দরিদ্র দরজি।'

'আরও অনেক কিছু নিশ্চয় বলতে ভুলে গেছে গ্লেন,' মোলায়েম স্বরে রুথ বলল।

শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল রানা। 'কেন ভুলবেন?'

'কারণ ও একটা জটিল চরিত্র। আমার সম্পর্কে আর কিছু বলেছে নাকি বলুন না? যেটা আমার জানা প্রয়োজন?'

মাথা নাড়ল রানা। 'নাহ্‌, তেমন জরুরি কিছু না। আমি বিশ্বাস করিনি।'

'মিথ্যুক বলায় তখন রেগে গিয়েছিলেন,' বিষণ্ন হাসি হাসল রুথ। 'আপনি আসলেই একটা মিথ্যেবাদী, মিস্টার রানা। তবে ঠিকমত বলতে পারেন না, ধরা পড়ে যান। ও আসলে সেক্সের কথা বলেছে। কিন্তু জানেন বোধহয়, পাঁড় মাতালরা কখনও সেক্সে আগ্রহী হয় না।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'শুনেছি। অথচ ওঁর কাছেই এসেছেন—আপনার জন্যে দুঃখ হচ্ছে আমার, রুথ। এটা তো বিশ্বাস করবেন?'

'চেষ্টা করছি।'

'বেশ, তাহলে একটা প্রশ্নের সত্যি জবাব দিন তো, আপনি এখানে কেন?'

রুথ বলল, 'খুব সহজ। আমি একজন অভিনেত্রী হতে চাই, নামকরা অভিনেত্রী, আর টাকা দিয়ে সেটা কেনা যায় না, মেধার প্রয়োজন। গ্লেন আমাকে সিনেমার লাইনে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে চেয়েছে। অনেকখানি সফল হয়েছে ও। লোকে এখন কাজ দিতে আমার বাড়িতে আসে, ওদের পিছনে এখন আর আমাকে

দৌড়ে বেড়াতে হয় না।'

'আর সেজন্যে আপনি গ্লেনের কাছে কৃতজ্ঞ? মনে হয় তাঁর ঋণ পরিশোধ করা দরকার?'

'নতুন যে ছবিটা করতে চাইছে ও, সেটার জন্যে টাকা দরকার। আমি ভেবেছিলাম, বাবাকে কিছু টাকা দিতে রাজি করাতে পারব। যতটা দরিদ্র বলা হয়েছে, আসলে ততটা নয় বাবা। গ্লেন ব্যাপারটাকে কথার কথা ভাবছে।'

'আপনার বাবা কি রাজি হয়েছেন?'

'হতো, কিন্তু গোলমালটা করে দিয়েছে রক সিনাত্রা। ওরা আমাকে সাফ জানিয়ে দিয়েছে, চুক্তি শেষ। বাবার একার পক্ষে এখন পুরো টাকা দেয়া সম্ভব নয়।' বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রুথ। 'বেচারা গ্লেন!'

'এক জীবনে কোটি কোটি ডলার কামাই করে উড়িয়ে দেয়ার যাঁর ক্ষমতা থাকে, তাঁকে আমি বেচারা বলতে রাজি নই,' রানা বলল।

আলোচনাটা আর বেশিদূর এগোতে পারল না, নীচে দরজা খোলার শব্দ হলো। গোলাঘরে নিচুস্বরে কথা শোনা গেল।

ঠোঁটে আঙুল রেখে রুথকে চুপ থাকতে ইশারা করল রানা। পা টিপে টিপে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল পাটাতনের কিনারায়। গ্লেন দাঁড়িয়ে আছেন গোলাঘরের মাঝখানে, এক হাতে মায়া নিভেনের কোমর জড়িয়ে ধরে রেখেছেন। মুহূর্ত পরেই দুই হাতে ওকে তুলে নিয়ে এগোলেন খড়ের গাদার দিকে।

সাবধানে আবার রুথের কাছে ফিরে এল রানা। 'একটু আগে না বললেন, পাঁড় মাতালরা সেক্সে আগ্রহ দেখায় না? আপনার ধারণা ভুল। মায়াকে নিয়ে এইমাত্র খড়ের গাদার দিকে গেলেন গ্লেন।'

হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে হাসি ঠেকানোর চেষ্টা করল রুথ। হাত ধরে ওকে খোলা দরজাটার দিকে টেনে নিয়ে চলল রানা।

'এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলে ওটাই একমাত্র পথ,' কপিকলের দড়িটা দেখাল রানা।

মাথা নাড়ল রুথ। 'অসম্ভব। সার্কাসের দড়াবাজিকরের খেল দেখাতে মোটেও রাজি নই আমি।'

'কী করবেন তাহলে?' ভুরু নাচাল রানা।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর মায়াকে নিয়ে যখন চলে গেলেন গ্লেন, অন্ধকার হয়ে গেছে তখন। রুথকে মই বেয়ে নামতে সাহায্য করল রানা। অন্ধকারের মধ্যে দরজার দিকে এগোল। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে তখনও।

'রেডি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল রুথ। চত্বর দিয়ে দৌড় দিল দুজনে। মূল বাড়ির বারান্দার সিঁড়ির মাথায় উঠে থামল।

ছায়া থেকে ভেসে এল গ্লেনের কণ্ঠ, 'রানা, তোমরা? আমি তো ভেবে অবাক হচ্ছিলাম, তোমাদের আবার কী হলো।'

ঝামেলা করবেন না তো? শঙ্কিত হলো রানা। করলেন না। বরং হালকা স্বরে

বললেন, 'জায়গাটা দেখা হয়ে গেছে আমার। আর ভাল লাগছে না। কাল সকালে তোমাদের সঙ্গে যেতে পারব?'

'আমার কোন অসুবিধে নেই।'

'ঠিক আছে, নাস্তার সময় দেখা হবে।'

ওদের পিছনে আস্তে করে লেগে গেল দরজাটা।

রুথের দিকে তাকাল রানা। 'ব্যাপারটাকে কী বলবেন? প্রেমে পড়েছেন গ্রেন?'

অন্ধকারে ফ্যাকাসে ছায়ার মত লাগছে রুথের মুখ। আবার জিজ্ঞেস করল রানা, 'রুথ, কী মনে হয়?'

'জানি না। আমার ঘুম পেয়েছে। আমি যাই।' চলে গেল রুথ।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল রানা। কানে আসছে মুষলধারা বৃষ্টির শব্দ। বাতাসে ভেজা মাটির গন্ধ। কয়েক মুহূর্ত একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে, মনের ভাবনাগুলোকে যেন ঝাড়া দিয়ে দূর করে আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে সে-ও এগোল বেডরুমের দিকে।

তেরো

খুব ভোরে স্যাণ্ডভিগ থেকে দলবল নিয়ে রওনা হলো রানা। আটটা নাগাদ পৌছল ফ্রেডেরিকসবর্গে। যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি কাজে চলল, আইস-ক্যাপে গিয়ে যেটুকু সময় বেরিয়ে গেছে সেটা যতটা সম্ভব পুষিয়ে নেয়ার জন্য। দুজন খনি-শ্রমিককে ন্যুকে পৌছে দিল ও। সেখান থেকে গভীর সাগরে চলাচলকারী একটা ট্রলারের ইঞ্জিনের জন্য জরুরি যন্ত্রাংশ তুলে নিয়ে ফিরে চলল।

ফ্রেডেরিকসবর্গে পৌছল একটার দিকে। রানাকে দেখে হই-হই করে উঠলেন নিরেনসেন, 'আপনার অপেক্ষাই করছিলাম। আমাকে ড্যানভিগ গ্রামে যেতে হবে এস্কিমোরা ওখানে হারপুন নিয়ে মারামারি শুরু করেছে।' রানাকে পৌছে দিয়ে আসতে অনুরোধ করলেন তিনি।

নামিয়ে দিয়ে ফ্রেডেরিকসবর্গে ফিরে এল রানা। পরদিন বিকেলে গিয়ে আবার নিয়ে আসতে হবে।

এরপর ডক্টর রহমানের সঙ্গে দেখা করল ও ফ্রেডেরিককোস্ট রেস্তোরাঁয়। না-চেনার ভান করে আরও একটা সিডি দিলেন তিনি। সেইসঙ্গে জানিয়ে দিলেন, বাকিটুকু দিতে পারবেন আগামী বছর, এই সময়ে। সিডিটা লণ্ডনে গিল্টি মিয়ার ঠিকানায় পোস্ট করল রানা।

এতক্ষণে ডেভের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হলো। এয়ারস্ট্রিপে চলে এল ও। উঁচু পুলিতে লাগানো দুটো লোহার শিকলে ঝুলে রয়েছে এয়ারমাখিটা। আণ্ডারক্যারেজ মেরামত করছে জিভস ও দুজন মেকানিক।

'ডেভ কোথায়?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'গতকাল রাতের পর থেকে আর দেখিনি,' হেসে বলল জিভস। একটা

তেলকালি লাগানো নেকড়ায় হাত মুছল। 'দেখুনগে, কোনও মেয়েকে নিয়ে হয়তো সারাদিন বিছানায় পড়ে আছে। আরও দুজন লোক ওকে খুঁজে গেছে। দুপরের পর আবার এসেছিল ওরা। মনে হয়, পায়নি ওকে।'

'লোকগুলোর নাম জিজ্ঞেস করেছ?'

'বয়স্ক লোকটার নাম মিচেল। জার্মান মনে হলো।'

'অস্ট্রিয়ান,' রানা বলল। 'যাকগে, কাজ কেমন চলছে তোমার?'

'ভাল। আগামীকাল নিয়ে যেতে পারবে। ডেভের সঙ্গে দেখা হলে জানিয়ে দেবেন, প্লিজ।'

শিকারি কুকুররা শিকারের পিছু নিয়েছে। শঙ্কিত হলো রানা। তাড়াতাড়ি রওনা হলো ডেভের বাড়ির দিকে। ওখানে পৌঁছে দরজায় টোকা দিল প্রথমে। সাড়া না পেয়ে জোরে জোরে থাবা দিতে লাগল। তাতেও জবাব নেই। দুটো ব্যাপার ঘটতে পারে। হয় ডিটাকে নিয়ে হোটেলের ঘরে পড়ে আছেন, নয়তো ফ্রেডেরিককোস্টে মদ খেতে গেছে। হোটেলে যাবার পথেই পড়ে রেস্টুরেন্টটা। তাই ওখানে ঢুঁ মেরে যাবে ঠিক করল রানা।

রেস্টুরেন্টে ঢুকে ডেভকে দেখল না। বারের সামনে উঁচু টুলে বসে ব্ল্যাক কফির অর্ডার দিল রানা। ডেভকে দেখেছে কি না জিজ্ঞেস করল বারম্যানকে।

মাথা ঝাঁকিয়ে বারম্যান বলল, 'দুপুর একটার দিকে এসেছিল গোল্ডবার্গ। লাঞ্চ খাচ্ছিল, এ সময় দুজন লোক এল দেখা করতে। ওদের একজন কাল রাতে আপনার সঙ্গে ছিল। মনে হয় কোন গোলমাল হয়েছে। কী, সেটা বলতে পারব না, তবে তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে গেল গোল্ডবার্গ।'

'কী ধরনের গোলমাল?'

শ্রাগ করল বারম্যান। 'আমি বারের পিছনে ছিলাম, শুনিনি। এখানে ছিল ডিনা। দাঁড়ান, ওকে ডেকে দিচ্ছি।'

রান্নাঘর থেকে একটা অল্প বয়েসী এস্কিমো মেয়েকে নিয়ে এল বারম্যান। সেই মেয়েটা, গতরাতে নির্লজ্জের মত গ্লেনের গায়ের উপর ঢলে পড়েছিল যে। রুটি বানানোর ময়দা মাখছিল, হাতে আটা লেগে আছে। তোয়ালে দিয়ে মুছছে।

টুকটাক ইংরেজি জানে, ছোটখাট কথা বোঝানো যায়, কিন্তু আলোচনা সম্ভব নয়, তাই ডেনিশ ভাষায় ওর সঙ্গে কথা বলল রানা।

রানার কথা শুনে ডিনা জানাল, লোকগুলো ইংরেজিতে কথা বলছিল ডেভের সঙ্গে, তাই ও ওদের কথা বুঝতে পারেনি। তবে বয়স্ক লোকটা প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল। যদিও পাত্তা দেয়নি ডেভ, ওর হাসি দেখেই বোঝা গেছে সেটা। তারপর কী ঘটেছে, আর দেখেনি ডিনা। রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল। তবে একটা চেয়ার উল্টে পড়ার শব্দ শুনেছে। দরজায় উঁকি দিয়ে দেখে, তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে যাচ্ছে ডেভ।

ওকে ধন্যবাদ দিল রানা। রান্নাঘরে ফিরে গেল ডিনা। কফি খেতে খেতে ভাবছে। তারপর টেলিফোনের কাছে উঠে গিয়ে হোটেলে ফোন করে ডিটাকে চাইল।

ফোন ধরে সতর্ক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ডিটা। 'কে?'

'মাসুদ রানা। ডেভ কোথায়?'

সামান্য দ্বিধা করে জবাব দিল ডিটা, 'কোথায় আছে কাউকে বলতে মানা করে দিয়েছে আমাকে। বলেছে, একটু শান্তিতে থাকতে চায়।'

'খুব জরুরি, ডিটা, খুবই জরুরি। কোথায় ও?'

'মাছ ধরতে গেছে।'

'সাধারণত যে জায়গাটাতে যায়?'

'তাই তো বলল।'

'ঠিক আছে। ওখানেই দেখা করব ওর সাথে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ঘড়ি দেখল রানা। সাড়ে পাঁচটা বাজে। মাছ ধরতে যেখানে যায় ডেভ, সে-জায়গাটা ফিয়র্ডের অন্যপাশে, মাইল দুয়েক দূরে। তারমানে একটা নৌকা জোগাড় করতে হবে।

বাইরে বেরিয়ে রানা দেখল বৃষ্টি পড়ছে। মাথা নিচু করে প্রায় ছুটে চলল বন্দরের দিকে।

কুয়াশা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ফিয়র্ডের বাঁকে। একটানা ঝিরঝিরে বৃষ্টি বলে দিচ্ছে, খুব বিশ্রী একটা রাত আসছে। একটা ডিঙি নিয়ে রওনা হলো রানা। আউটবোর্ড মোটর লাগানো রয়েছে। হালকা ডিঙিটাকে তীব্র গতিতে ছুটিয়ে নিয়ে চলল।

সাগরের দিকে রাজকীয় চালে ভেসে চলেছে গোটা চারেক হিমবাহ। মনে হচ্ছে যেন চারটে যুদ্ধ জাহাজ। উজ্জ্বল সাদা, সেই সঙ্গে নীল ও সবুজের ছোঁয়া বরফের গায়ে। সামনে ডান দিকের পানিতে আলোড়ন তুলে ভেসে উঠল একটা ছোট আকারের তিমি, শ্বাস নেয়া হলে সাদা লেজ নেড়ে, চকচকে পেট দেখিয়ে গড়ান দিয়ে তলিয়ে গেল আবার।

চমৎকার দৃশ্য। মুখে বৃষ্টির বরফ-শীতল ফোঁটা ক্রমাগত আঘাত হেনে বিরক্ত না করলে মুগ্ধ হতে পারত রানা। তা ছাড়া ডেভের ভাবনা রয়েছে মন জুড়ে, প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগের মত মানসিক অবস্থা নেই এ-মুহূর্তে।

পুরানো একটা ওয়েইলবোটে বসে মাছ ধরছে ডেভ। নোঙর ফেলেনি। আপনগতিতে ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে বোটটা। বড়শি দিয়ে কড মাছ ধরছে ও। গায়ে অয়েলস্কিন। সিটের নীচে রাখা একটা দোনলা বন্দুক।

কাছে এসে দড়ি ছুঁড়ে দিল রানা।

ডিঙিটা টেনে কাছে নিয়ে গেল ডেভ।

ওয়েইলবোটে উঠল রানা। 'উহ্, তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে জান বেরোনোর দশা। জিভসের সঙ্গে দেখা। ও বলল, আগামীকাল ঠিক হয়ে যাবে তোমার প্লেন। উড়তে পারবে।'

'শুনে খুশি হলাম,' ডেভ হাসিমুখে বললেও কথাটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিল বলে মনে হলো না। ফ্লাস্ক বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'গরম কফি। খাও।'

একটা স্পিনার বোটের পাশ দিয়ে নামিয়ে আবার মাছ ধরায় মনোযোগ দিল ও।

মাথা নেড়ে রানা বলল, 'কখনও শিখবে না তুমি, তাই না? এ-সবের দরকার

তো নেই। সাধারণ একটা বড়শি ফেললেই তো চলে। তলা থেকে খাবার খুঁটে খায় কড। সুতো ধরে বড়শিটা উপরে-নীচে নাচালেই তো হয়ে যায়...এই যে, এভাবে।'

ওর হাত থেকে ছিপটা নিতে হাত বাড়াল রানা। 'দাও, দেখাই।' তারপর জিজ্ঞেস করল, 'পাথরগুলো কী করেছ, ডেভ?'

'পাথর?' শিশুর মত নির্বিকার চেহারা করে রেখে বলল ডেভ। 'কী বলছ তুমি?'

'আইস-ক্যাপের ওপর পড়ে যাওয়া হিরন থেকে যেগুলো পেয়েছ। মায়া নিভেনের কাছ থেকে যেগুলোর কথা জেনেছ তুমি। বার বার তুমি অস্বীকার করতে থাকবে, তাই আগেই বলে নিই, স্কি প্লেনটা যেখানে নামিয়েছ, সে-জায়গাটা আমি দেখে ফেলেছি। প্লেনটা যেখানে পড়েছে তার থেকে আধ মাইল দূরে।'

'দুনিয়ায় স্কি প্লেন কি শুধু আমারই আছে নাকি?'

'দুনিয়ায় বহু আছে, কিন্তু এই এলাকায় একটাই আছে, তোমারটা।'

শক্ত হয়ে গেল ডেভের চোয়াল। 'নিজের চরকায় তেল দিচ্ছ না কেন, রানা?'

কথাটা কানেই তুলল না রানা, নিজের কথা বলে গেল, 'শোনো, সেদিন প্রথম যখন হোটেলের রুম থেকে বেরোতে গিয়ে মায়া নিভেনের সঙ্গে ধাক্কা খেলে, তোমাকে দেখেই বুঝে গিয়েছিল ও, তোমাকে দিয়ে যা খুশি করাতে পারবে। মিচেলের উপর টেক্কা দিয়ে ওকে ঠকানোর এই সুবর্ণ সুযোগটা হারাতে চায়নি ও। তোমাকে সব বলেছে। বলেছে, ওখানে গিয়ে হিরন থেকে রত্নগুলো বের করে নিয়ে এসে সবাইকে বলবে প্লেন নামাতে পারনি, নামানোর জায়গা নেই।'

কিছু তথ্যের উপর নির্ভর করে রানার এই অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়াটা জায়গামত লেগেছে, ডেভের মুখ দেখেই বুঝতে পারল ও। কাজেই বলে গেল, 'আমি যাতে না যাই, সে-চেষ্টাও তুমি করেছ, বলেছ, ফ্লোটপ্লেন নামানোর জায়গা নেই ওখানে। লেক সিউল পুরু বরফে ঢাকা। মায়া নিশ্চয় ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছিল তোমাকে, কিন্তু ওর কথা যে রাখবে না তুমি, বুঝতে পারেনি ও। ভেবেছিল, যা বলবে, তা-ই করবে। একা গিয়ে ফিরে এসে যখন বললে, নামতে পারোনি, হয়তো বিশ্বাস করেছিল—কারণ এ ধরনের ঘটনা ঘটতেই পারে। কিন্তু সেদিন রেস্টুরেন্টে রিভোল্টারকে যখন বললে তাঁকে পৌঁছে দেয়া সম্ভব নয়, পরদিন সকালে সন্দ্রে যেতে হবে জরুরি কাজে, ব্যস, সন্দেহ করে বসল ও। সেই রাতেই সবার অগোচরে এয়ারস্ট্রিপে গিয়ে ট্রাক দিয়ে গুঁতো মেরে তোমার প্লেনটাকে ভেঙে দিয়ে আসে মায়া, যাতে আমরা চলে গেলে পালাতে না পারো।'

চুপচাপ শুনল ডেভ। রানার কথা শেষ হলে বলল, 'গতকাল বিকেলে সন্দ্রে থেকে একটা ক্যাটালিনা প্লেন এসেছিল। ওটাতে করে সন্দ্রে গিয়ে ওখান থেকে ক্যানাডা কিংবা ইয়োরোপে যাবার প্যাসেঞ্জার প্লেন ধরতে পারতাম।'

'না, পারতে না,' মাথা নাড়ল রানা। 'মূল্যবান পাথর সঙ্গে নিয়ে কাস্টমস পেরোনোর ঝুঁকি তুমি নিতে চাওনি, ডেভ। এয়ারমাখিটাই তোমার দরকার। প্লেনের ভিতর হীরা লুকানোর অনেক জায়গা আছে। বুশ পাইলটের লাইসেন্স আছে—মুক্ত বিহঙ্গ—প্লেন নিয়ে যেদিকে খুশি উড়ে যেতে পারবে। এ কারণেই এখনও এখানে আটকে আছো তুমি। উদ্বেগেরও কোন কারণ নেই তোমার। মায়া নিভেন সন্দেহ করলেও শিওর হতে পারেনি, সত্যিই ওর সঙ্গে বেঈমানি করেছ কি না। মিচেলকেও

জানাতে পারবে না। প্লেনটা ভেঙে না দিলে আজ তুমি এখানে থাকতে না। তবে এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। মিচেল আর রয় ওখানে গিয়ে হিরনের ভেতর খোঁজাখুঁজি করে যা বোঝার বুঝে গেছে। ওরা এখন তোমাকে খুন করবে। শুধু আমি না, মিচেলও জানে একটা স্কি প্লেন নেমেছিল আইস-ক্যাপে। দুইয়ে দুইয়ে চার যোগ করতে কোন অসুবিধে হয়নি ওর।'

আর অস্বীকারের চেষ্টা করল না ডেভ। গোমড়া মুখে বলল, 'নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার আছে। তা ছাড়া, তুমি আমার উপকারের জন্যে এমন খেপে উঠলে কেন? ওসবের ভাগ চাই?'

গোঁ ধরে থাকা বোকা ছেলের মত বুঝেও বুঝতে চাইছে না ডেভ। রানা বলল, 'কিছুই চাই না আমি। দোহাই তোমার, ডেভ, আমার কথা বিশ্বাস করো। ওরা পেশাদার লোক। খুনি। জীবনে তোমার মত বহু তেড়া লোককে সোজা করেছে।'

ভয় ও রাগ একইসঙ্গে দেখা দিল ডেভের চোখে। হয় রানার কথা পছন্দ হয়নি ওর, কিংবা যতটা ভাব দেখায় ততটা পছন্দ করে না ও রানাকে; আর সে-কারণেই হঠাৎ বিস্ফোরিত হলো, 'আমাকে উপদেশ দেবার তুমি কে, রানা? কী করব না করব, তোমার কাছে শিখতে হবে নাকি? নিজের চরকায় তেল দাও, রুথের কাছে যত খুশি দাদাগিরি ফলাও গিয়ে।' সিটের নীচ থেকে টান দিয়ে শটগানটা বের করে আনল ও। 'আসুক না কে আসবে। টের পাবে কত ধানে কত চাল।'

রানা বুঝল, কিছুই করার নেই ওর, ডেভ ওর কথা শুনবে না। ওকে ঠেকানোর কোন উপায় দেখল না। নিরেনসেনকে বলতে পারে, কিন্তু প্রমাণ ছাড়া কিছুই করতে পারবে না সার্জেন্ট। রানার হাতে কোন প্রমাণ নেই। তা ছাড়া এই ব্যাপারটাতে জড়িতও হতে চায় না ও। তাতে অকারণ বিপদ ডেকে আনা হবে। যে কাজে ফ্রেডেরিকসবর্গে এসেছে ও, সেটা নিয়েই ঝামেলায় পড়ে যাবে। বুঝতে পারছে, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে আসছে।

হঠাৎ টান পড়ল ছিপে। তুলে আনল রানা। ছটফট করছে বড়শিতে গাঁথা একটা পাউণ্ড তিনেক ওজনের কড। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে বাড়ি মেরে মাছটাকে মেরে ফেলল ডেভ।

'নাও, তোমার রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলাম,' হেসে পরিবেশটাকে হালকা করতে চাইল রানা। 'এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা উচিত হবে না। কুয়াশা বাড়ার আগেই পালানো দরকার।'

জবাব দিল না ডেভ। চুপচাপ বসে রইল। মুখ সাদা। শটগানটাকে বুকের কাছে চেপে ধরে রেখেছে। চোখে ভয়।

আর ওকে বোঝানোর চেষ্টা করল না রানা। ডিঙিতে নামল। খুঁতখুঁত করছে মন। ডেভ না বুঝলেও, রানা তো বুঝতে পারছে, কতখানি বিপদের মধ্যে রয়েছে ও।

কিন্তু কিছুই করার নেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্টার্টার টিপে ইঞ্জিন চালু করল রানা। ঘনিয়ে আসা কুয়াশার ভিতর দিয়ে দ্রুত ছুটে চলল বন্দরের দিকে।

বন্দরে যখন পৌঁছল রানা, ধূসর রঙের একটা ভেজা চাদরের মত জড়িয়ে ফেলেছে

যেন ওকে কুয়াশা। তবে নিরাপদেই নোঙর ফেলল, ডিঙিটাকে বাঁধল, জেটির সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল উপরে।

ফগহর্ন বেজে উঠল, কোথাও সাবধানে এগিয়ে চলেছে একটা ট্রলার। এ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। পুরোপুরি নৈঃশব্দ্যের রাজত্ব বিরাজ করছে যেন।

উপরে উঠে অটারটার দিকে এগোল। স্লিপওয়ের শেষ মাথায় রেখেছে। তেল ভরতে হবে। স্টকপাইল থেকে দুটো জেরিক্যানে করে তেল এনে এনে ট্যাংকে ভরতে লাগল। মিনিট বিশেক লাগল কাজ সারতে। ঘামে ভিজে গেছে শরীর। পায়ের শব্দ শোনা গেল। কুয়াশার ভিতর থেকে ভূতুড়ে ছায়ামূর্তির মত বেরিয়ে এল কেউ—নাবিক একজন, জেটিতে চলেছে, কোন কথা না বলে হারিয়ে গেল আবার কুয়াশায়। রানার মনে হলো, এ মুহূর্তে মৃত এক পৃথিবীতে যেন একমাত্র ও-ই বেঁচে রয়েছে।

তেল ভরা শেষ করে, অটারটাকে রিং বোল্টে বাঁধতে শুরু করল। হঠাৎ ফিরে তাকাল পিছনের কুয়াশার দিকে। কোন শব্দ শোনেনি, কিন্তু ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ করে দিয়েছে ওকে, বলে দিচ্ছে অদৃশ্য থেকে কেউ ওর উপর নজর রাখছে।

ভুলও হতে পারে ওর, কী জানি! আবার নিজের কাজে মন দিল। কিন্তু অনুভূতিটা যাচ্ছে না। নড়াচড়া টের পেল পিছনে। সোজা হতে শুরু করল। কিন্তু দেরি করে ফেলল। ঘাড়ের উপর পড়ল লাঠির আঘাত। এতই দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাটা, বাধা দেয়ারও সময় পেল না। উপুড় হয়ে পড়ে গেল ও। একটা মুহূর্ত গাল চেপে রইল ভেজা কংক্রিটে। ভেজা ভেজা, মাছের গন্ধওয়ালা কী যেন গ্রাস করে ফেলল ওকে। তারপর শুধুই অন্ধকার।

রানার মনে হলো গভীর পানি থেকে ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসছে। কয়েক পরত অন্ধকারের পর্দা পেরিয়ে এসে যেন এবড়ো-খেবড়ো ধূসর মেঘের ভিতর দিয়ে চোখে পড়ল ভোরের আবছা আলো। মাথার ভিতর দপদপে ব্যথা। কোথায় আছে, কী করছে, মনে করতে পারল না প্রথমে। মাছের কড়া গন্ধ নাকে ঢুকছে। নরম কোন কিছুতে চিত হয়ে আছে ও। ভেজা জালের স্তূপের উপর পড়ে রয়েছে, বুঝতে সময় লাগল না।

আরও বুঝল, একটা জাহাজের খোলের মধ্যে রয়েছে ও। সম্ভবত, কোন ট্রলার। যতখানি দেখতে পাচ্ছে, তাতে অবশ্য সে-রকমই মনে হচ্ছে। আলো এত কম, ভিতরের জিনিসপত্রগুলোর শুধু অবয়ব দেখছে। মাথার উপর দিয়ে কারও হেঁটে যাওয়ার দুম দুম শব্দ হলো। উঠে বসল রানা।

মাথার ভিতর যেন বিস্ফোরিত হলো ব্যথা। নিজের অজান্তেই চোখ বুজে এল ওর। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল। বড় বড় দম নিয়ে ব্যথাটা কমানোর চেষ্টা করল।

ব্যথা কিছুটা কমে এলে উঠে দাঁড়াল ও। হোঁচট খেতে খেতে এগোল আবছা অন্ধকারের ভিতর দিয়ে। সামনে বাড়িয়ে রেখেছে দুই হাত।

মাথার উপর হ্যাচওয়েটা চোখে পড়তে থেমে গেল। ঢাকনাটা ঠিকমত বসেনি ফোকরে, সামান্য ফাঁক হয়ে আছে বলে সেখান দিয়েই আলো আসছে। মাথার

অন্তত পাঁচ ফুট উপরে রয়েছে ওটা। নাগাল পাওয়া যায় না, খোলাও সম্ভব নয়। চুপচাপ অনির্দিষ্টকাল বসে না থেকে চেঁচাতে শুরু করল ও প্রাণপণে।

ডেকে আবার শোনা গেল পদশব্দ। টান দিয়ে হ্যাচের ঢাকনা তুলে নীচে উঁকি দিল একটা মুখ। ওর দিকে তাকিয়ে আছে একজন নাবিক। তেল-ময়লা লেগে থাকা উলের ক্যাপ মাথায়। মুখের চামড়া কোঁচকানো। লম্বা, ঝোলা গোঁফ। দেখেই চিনতে পারল রানা। গত পরশু ফ্রেডেরিকসকোস্টে যে মারামারি হয়েছিল, সে-রাতে তেজো ডুয়েরোর সঙ্গে এই লোকটাকে দেখেছে।

ব্যাপারটা বুঝতে পারল না রানা। কোন্ কারণে ওকে এখানে ধরে এনেছে তেজো ডুয়েরো? মার খাওয়ার প্রতিশোধ নিতে? এ ছাড়া আর কোনও কারণ দেখল না রানা।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা। তারপর আবার হ্যাচের ঢাকনা লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল।

রানার মাথার ভিতরে যেন হাতুড়ি পিটাচ্ছে কেউ। যন্ত্রণা সইতে না পেরে দুই হাতে মাথা চেপে ধরে বসে পড়ল। লম্বা দম নিয়ে ব্যথা কমানোর চেষ্টা করছে আবার। কিন্তু লাভ হলো না। ব্যথা, অন্ধকার আর এই বদ্ধ জায়গায় চিরস্থায়ীভাবে লেগে থাকা মাছের গন্ধ এতটাই অসহ্য হয়ে উঠল—বিষাক্ত লাগল ওর, পেটের মধ্যে পাক দিতে থাকল। বমি ঠেকাতে পারল না।

বমি করার পর কিছুটা আরাম পেল। ঘড়ির দিকে তাকাল। এখনও চালুই আছে ঘড়িটা। অন্ধকারেও সবুজ ফসফরাসের মত জ্বলছে ডিজিটাল নম্বরগুলো। সাতটা বাজে।

ঘণ্টাখানেক পর আবার ফিরে এল লোকটা। হ্যাচ খুলল। সঙ্গে এবার তেজো ডুয়েরোও রয়েছে।

হাঁটু গেড়ে বসে নীচে তাকাল তেজো। দাঁতের ফাঁকে সিগার চেপে ধরা। চোখে অসহায় ইঁদুরকে বাগে পাওয়া বিড়ালের কুটিল চাহনি।

ফিরে তাকিয়ে সঙ্গীকে কিছু বলল ও। একটা মই এনে হ্যাচ দিয়ে নীচে নামিয়ে দিল লোকটা, ইঙ্গিতে উপরে ওঠার নির্দেশ দিল। এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে রানা, মই বেয়ে উঠতে গিয়েও পা কাঁপতে লাগল। কোনমতে উঠে এসে ধপ করে বসে পড়ল ডেকে। হাঁ করে মুখ দিয়ে ফুসফুসে টানছে সাগরের ভেজা বাতাস।

হাঁটু গেড়ে রানার পাশে বসে পড়ল তেজো। উদ্বিগ্ন ভঙ্গি। 'আপনার অবস্থা তো ভাল ঠেকছে না, মিস্টার রানা। খুব কষ্ট?'

'ভীষণ দুর্বল লাগছে,' নিস্তেজ কণ্ঠে জবাব দিল রানা।

মাথা ঝাঁকাল তেজো। ধীরে-সুস্থে দাঁতের ফাঁক থেকে সিগারটা দুই আঙুলে ধরে নামিয়ে আনল, জ্বলন্ত মাথাটা চেপে ধরল রানার গালে।

ঝটকা দিয়ে গাল সরিয়ে নিল রানা। একটা দুর্বল হাত তুলল তেজোকে ঘুসি মারার জন্য। তৈরি ছিল তেজোর সঙ্গী। চোখের পলকে পকেট থেকে পিস্তল বের করে চেপে ধরল রানার ঘাড়ে।

হা-হা করে হাসল তেজো। 'আহা, রাগ করেন কেন, মিস্টার পাইলট? দুর্বলতার ওষুধ দিলাম। অনেকটা সেরে উঠেছেন। দুর্বলতা কমেছে না?' পর্তুগিজ

ভাষায় ওর সহকারীকে কিছু বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল।

ঘাড়ে পিস্তলের নলের চাপ বাড়িয়ে রানাকে উঠতে ইশারা করল লোকটা। ওকে ঠেলে নিয়ে চলল তেজোর পিছন পিছন।

পিছনের কম্প্যানিয়নওয়ে দিয়ে রানাকে নীচে নামানো হলো। একটা কেবিনের দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল তেজো। সহকারীর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

ধাক্কা দিয়ে ওকে কেবিনের ভিতর ঠেলে দিল পিস্তলধারী লোকটা। ঝট করে পা বাড়িয়ে দিল তেজো। ওর জুতোয় পা বেধে প্রায় উড়ে গিয়ে কেবিনের মেঝেতে পড়ল রানা।

উপুড় হয়ে পড়ে আছে ও। আবার আঁধার নেমে আসছে চোখে। দ্রুত হয়ে গেছে নিঃশ্বাস। কানে এল একটা পরিচিত কণ্ঠ, 'আহ্-হা, খুবই খারাপ অবস্থা করে ফেলেছে দেখছি আপনার, মিস্টার রানা।' রানাকে টেনে তুলে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল রয় ফ্লেচার।

মাথা ঝাড়া দিয়ে ঘোলা মগজ সাফ করতে চাইল রানা। কয়েকবার চোখের পাতা খুলল, বন্ধ করল। অন্ধকার ভাবটা কেটে যেতেই ভাল করে চোখ মেলে তাকাল। একটা টেবিলের সামনে বসানো হয়েছে ওকে। অন্যপাশে চেয়ারে বসে আছে মিচেল।

চোদ্দো

রানার গালের পোড়া জায়গাটায় যেন আগুন জ্বলছে, যেখানে সিগারেটের আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে তেজো। মাথার ভিতর ভোঁতা দপদপানি। মৃদু কাঁপছে দুই হাত। ফিরে আসছে চিন্তাশক্তি।

লোকগুলো ওকে নিয়ে কী করবে ভাবছে। পায়ে ভার বেঁধে সাগরে ফেলে দেবে? কেউ জানবে না, ওর কী হয়েছে। কেউ কিছু বুঝতেও পারবে না।

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল ও। কথা বলতে গিয়ে কোলাব্যাঙের স্বর বেরোল গলা দিয়ে, 'ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

'বোকার মত কথা বলছেন,' মিচেলের কণ্ঠ বরফের মত শীতল। 'এখানে কেন আনা হয়েছে আপনাকে, খুব ভাল করেই জানেন।'

হঠাৎ করেই ডেকে শুরু হলো হট্টগোল—রাগত চিৎকার, ঘুসি মারার শব্দ, মাতাল কণ্ঠ, তর্কাতর্কি শোনা যাচ্ছে। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল তেজো।

মিচেলকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'শেষে এই বাজে লোকটার সাহায্য দরকার হলো আপনাদের?'

'এদের ব্যবহার করাই তো ভাল। এগুলোকে টাকা দিলেই কাজে লাগানো যায়। আমি বললে এখন সামান্য দ্বিধা না করে হাত-পা বেঁধে পানিতে ফেলে দেবে আপনাকে। নিশ্চয় বুঝতে পারছেন?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ভারী নীরবতা যেন ঝুলে রইল ওদের মাঝে। তারপর মিচেল

বলল, 'গতকাল হিরন বিমানটায় আমাদের কিছু জিনিস খুঁজে পাব ভেবেছিলাম। প্লেনের ভেতর লুকানো ছিল। খোয়া গেছে ওগুলো। কীসের কথা বলছি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন?'

মাথা নাড়ল রানা। 'কোন ধারণাই নেই।'

'তা হলে স্কি প্লেন নামার ব্যাপারটা চাপা দিতে চেয়েছিলেন কেন?'

মনে মনে বিশ্বাসযোগ্য জবাব খুঁজছে রানা। না পেরে প্রশ্ন করল, 'সত্যিই কি লুকাতে চেয়েছিলাম?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রয়। 'আপনি আসলে ভীষণ বোকা, মিস্টার রানা।'

হাতে সেই কালো দস্তানা পরা আছে লোকটার, ব্যাপারটা ভাল লাগল না রানার, বিশেষ করে ঘুরে গিয়ে যখন ওর পিছনে দাঁড়াল রয়।

মিচেল বলল, 'আপনি বলেছেন, এই এলাকায় মাত্র একটা স্কি প্লেনই আছে।'

অস্বীকার করে লাভ নেই। সে-চেষ্টা করলও না রানা। 'বলেছি।'

'তারমানে জায়গাটা দেখে ফিরে এসে আমাদের কাছে মিথ্যে বলেছে গোল্ডবার্গ। ওখানে নাকি নামার জায়গা নেই। কেন বলল?'

'সেটা ওকে জিজ্ঞেস করছেন না কেন?'

'করেছি। কিন্তু জবাব দেবার মেজাজে নেই ও। আপনার সঙ্গে কথা বলার পর আবার জিজ্ঞেস করব।' টেবিলে রাখা বোতল থেকে গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে নিয়ে চেয়ারে হেলান দিল মিচেল। 'আবার জিজ্ঞেস করছি আপনাকে, ওখানে নেমেও কেন মিথ্যে কথা বলেছে গোল্ডবার্গ?'

'বেশ, এতই যখন জানার ইচ্ছে, শুনুন,' রানা বলল, 'ও আমার বন্ধু, এটা ঠিক। গোপনে কী করে বেড়াচ্ছে ও, আমি জানি না। কিন্তু ওকে বিপদে পড়তে দিতেও চাই না। সুতরাং ওর সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত মুখ বন্ধ রাখব ঠিক করেছি।'

'দেখা হয়েছে?'

'কখন করব? সুযোগই পাইনি। সারাটা দিন তো আজ উড়েই বেড়ালাম।'

ব্র্যাণ্ডির গ্লাসটা আলোর দিকে তুলে ধরে ভিতরের তরল পদার্থের দিকে তাকিয়ে রইল মিচেল। মাথা নাড়ল। 'না, মিস্টার রানা, এতে চলবে না। আপনার জবাব খুশি করতে পারল না আমাকে।' চুমুক না দিয়েই ঠকাস করে গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখল ও। 'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। কোন কিছু লুকোচ্ছেন।'

ওর কথা শেষ হতে না হতেই পিছন থেকে প্রচণ্ড জোরে মাথায় ঘুসি মারল রয়। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল রানা। চুল খামচে ধরে হ্যাঁচকা টানে চেয়ার থেকে তুলে ফেলে বাহু দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরল। কানের কাছে বলল, 'উঁহুঁ, পিছন দিকে পা চালাবেন না। আমার কাছে পিস্তল আছে।'

'আবার প্রথম থেকে শুরু করা যাক,' মিচেল বলল রানাকে। 'স্কি প্লেন নিয়ে আইস-ক্যাপের ওপর নেমেছে গোল্ডবার্গ। পড়ে থাকা হিরন বিমানটার কাছে গিয়ে জিনিসগুলো বের করে নিয়েছে, যেগুলোর জন্যে গ্রীনল্যাণ্ডে এসেছি আমরা। এই কথাটাকে কি যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে আপনার?'

'ভিতরে কী জিনিস ছিল, সে-সম্পর্কে কীভাবে জানল ডেভ, আমি জানি না,' রানা জবাব দিল।

এ প্রশ্নটা মিচেলের মনেও জেগেছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। এতই ভারী নীরবতা, যেন ছুরি দিয়ে কাটা যাবে। ধীরে ধীরে রয় বলল, 'ও ঠিকই বলেছে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে,' রয়ের কথার প্রতিধ্বনি করল যেন মিচেল। সামনে ঝুঁকল। 'কে, রানা? কে বলতে পারে ওকে?'

'সেটা নিজেই ভেবে বের করুন। নিশ্চয় এমন কেউ বলেছে, যে জিনিসগুলোর কথা জানে, তাই না?' আপনার ঘনিষ্ঠ কোনও মানুষ।' রয়কে দেখাল রানা। 'একে সন্দেহ করলে কেমন হয়? কতদিন ধরে আপনার সঙ্গে আছে ও?'

চোখের পলকে রয়ের একটা মুষ্টিবদ্ধ হাত উঠে গিয়ে সজোরে নেমে এল রানার মাথার একপাশে। মারতে জানে লোকটা। আরেকটু হলেই জ্ঞান হারিয়ে চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিল রানা। দুই হাতে মাথা চেপে ধরে সামনে টলে পড়ল ও। কানে এল মিচেলের চিৎকার, 'এত জোরে মারছ কেন, গাধা কোথাকার! জলদি হুঁশ ফেরাও! ওর সঙ্গে কথা এখনও শেষ হয়নি আমার।'

কাঁচে কাঁচে ঠোকাঠুকির টুং টাং শব্দ হলো—বোতল থেকে গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢালছে রয়। রানার চুল খামচে ধরে মাথাটা পিছন দিকে এলিয়ে মুখটা উঁচু করল। সামান্য ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁটে গ্লাস ঠেকিয়ে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে দিল মুখের ভিতর। কেশে উঠল রানা। এবারও অ্যালকোহল সহ্য করতে পারল না পাকস্থলী, ভয়ানকভাবে পাক দিয়ে উঠল পেট, মোচড় খেতে থাকল দেহটা। ঠেকাতে পারল না ও। হড়হড় করে আবার বমি করে দিল, রয়ের কাপড়ে-চোপড়ে। বিরক্তিতে চিৎকার করে উঠে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে রানাকে চেয়ার থেকে ফেলে দিল ও। গড়িয়ে গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা খেল রানার দেহটা, দরজার পাশে। জ্যাকেটের বোতাম খুলতে শুরু করেছে ততক্ষণে রয়। অর্ধেক খোলা হয়েছে। হাঁ করে দম নিতে নিতে কোনমতে উঠে দাঁড়াল রানা। আচমকা হাত বাড়িয়ে দিয়ে দরজার হাতল চেপে ধরল। এক টানে পাল্লা খুলে বাইরে লাফিয়ে পড়ল।

কম্প্যানিয়নওয়েতে রানাকে ধরে ফেলল রয়। রানা রয়েছে উপরে, রয় ওর নীচে। রয়ের মুখে লাথি মারল রানা। এক লাথিতে গড়িয়ে ফেলে দিল সিঁড়ির নীচে। ঘাড় মটকে মরে গেল কি না লোকটা, দেখার সময় নেই। লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি বেয়ে ডেকে উঠে এল ও।

তিন-চার ফুট দূরে দাঁড়িয়ে দুজন নাবিককে বকাঝকা করছে তেজো ডুয়েরো। শব্দ শুনে ফিরে তাকাল। রানাকে দেখে বোয়াল মাছের মত হাঁ হয়ে গেল মুখ। বাধা দিতে এগিয়ে এল। ঠাস করে চড় মারল রানা। এমন শব্দ হলো, যেন হাতুড়ি দিয়ে কংক্রিটের দেয়ালে মারা হয়েছে। পাল্টা আঘাতের সুযোগ দিল না ওকে রানা। দ্রুত দু'তিন বার ওঠানামা করল ওর হাত দুটো। পরক্ষণে ডেকে গড়াগড়ি খেতে দেখা গেল তেজোকে। ওর সঙ্গীরা বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বাধা দিতে এগোনোর আগেই ছুটে গিয়ে চোখের পলকে রেলিং ডিঙিয়ে ঝাঁপ দিল রানা পানিতে। ডিগবাজি খেয়ে পড়ল বরফ-শীতল সাগরে। এতই ঠাণ্ডা, মনে হলো বুকের ভিতর থেমে যাবে হৃৎপিণ্ডটা। মরিয়া হয়ে দুই পা চালিয়ে মাথা তুলল উপরে, পাগলের মত সাঁতরে চলল কুয়াশার ভিতর দিয়ে।

ওরা জানে, এই ঠাণ্ডা পানিতে বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না রানা, যত দ্রুত সম্ভব ওঠার চেষ্টা করবে, তাই ওর আগেই জেটির কাছে গিয়ে বসে থাকবে। কাজেই সেদিকে না গিয়ে জেটির উল্টোদিকে চলল ও।

দশ মিনিটের বেশি লাগল না পৌছতে। কিন্তু এই দশটা মিনিট পার করতে গিয়েই রানার মনে হলো অনন্তকাল পেরিয়ে যাচ্ছে। কুয়াশার মধ্যে দেখা যাচ্ছে না কিছু, এগোতে গিয়ে হাঁটু বাড়ি খেল ডুবো পাথরে। তীক্ষ্ণ ব্যথা উঠে এসে ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত শরীরে। কয়েক সেকেণ্ড পর হামাগুড়ি দিয়ে ডাঙায় উঠে এল ও। মুখ গুঁজে দিল নুড়িভর্তি সৈকতে।

ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে গেছে দেহ। কিন্তু পড়ে থাকলে চলবে না। তা হলে জমে বরফ হয়ে মরতে হবে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল ও। টলতে টলতে এগোল একটা বেড়ার দিকে। কংক্রিটের তৈরি বড় বড় ব্লক দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বেড়াটা, শীতকালীন ঝড় থেকে এয়ারস্ট্রিপট্যাকে রক্ষা করার জন্য। সাগরের প্রচণ্ড আক্রোশেভরা ঢেউয়ের আঘাত সইতে না পেরে জায়গায় জায়গায় ব্লক ধসে গিয়ে বেড়া ভেঙে পড়েছে।

ঘড়ি দেখল রানা। ন'টা বাজতে দেরি নেই। ফিয়র্ডের অন্যপাশে ডেভের সঙ্গে দেখা করে আসার পর প্রায় তিন ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। এতক্ষণে নিশ্চয় ফিরে এসেছে ও। আবহাওয়া খারাপ দেখে রানা আসার পর হয়তো দেরি করেনি আর।

গা গরম রাখার জন্য দৌড়াতে আরম্ভ করল রানা। দৌড়ে পেরোল এয়ারস্ট্রিপটা। হ্যাঙারে কোন মানুষকে দেখা গেল না, একেবারে নির্জন। পুরানো একটা জীপে উঠল ও। ডেভকে আরেকবার সাবধান করা দরকার। বোঝানো দরকার, কতটা ভয়ঙ্কর মানুষকে শত্রু বানিয়েছে। কুয়াশার মধ্যে যতটা জোরে সম্ভব জীপ চালিয়ে ছুটে চলল রানা।

ডেভের বাড়ির সরু গলিটায় ঢুকে জীপ রাখল ও। হেঁটে এল বাড়িটার কাছে। সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠছে, হঠাৎ দড়াম করে একপাশের ছোট গেটটার পাল্লা লাগানোর শব্দ হলো। কুয়াশার ভিতর দৌড়ে পালাচ্ছে কেউ। পলকের জন্য ডিটা জুনোর আতঙ্কিত মুখটা দেখতে পেল রানা। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। এক ঝলক ওকে দেখতে পেল রানা, পরক্ষণে কুয়াশার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

সামনের দরজায় জোরে জোরে থাবা দিতে লাগল রানা। জবাব নেই। জানালার পর্দা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। এক চিলতে আলো আসছে সেখান দিয়ে। আবার দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডেভের নাম ধরে ডাকতে লাগল রানা। লাভ হলো না। কোন সাড়াশব্দ এল না ভিতর থেকে। বাড়ির পাশ ঘুরে এসে রান্নাঘরের দরজা খোলার চেষ্টা করল ও। নব ধরে মোচড় দিতেই খুলে গেল।

ভিতরে পা রেখেই বুঝে গেল ও, কী দেখতে পাবে। এ ধরনের নীরবতার একটাই মানে। স্তব্ধ হয়ে গেছে যেন সমস্ত পৃথিবী, দম নিতে ভুলে গেছে। বাতাসে স্থির হয়ে আছে বারুদের গন্ধ।

ঝড় বয়ে গেছে যেন লিভিং রুমের উপর দিয়ে। দেয়ালের সকেটের কাছ থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে টেলিফোনের তার, সমস্ত ড্রয়ার মাটিতে, গদিগুলো ছেঁড়া,

মেঝেতে ছড়িয়ে আছে বইপত্র। সেই সঙ্গে রক্তের চিহ্ন—তাজা রক্ত। দেয়ালে, দেয়াল ঘেঁষে মেঝেতে, ছোপ ছোপ রক্ত।

একটা কাউচে চিত হয়ে পড়ে আছে ডেভ। মুখের বেশির ভাগটাই নেই, উড়ে গেছে শটগানের গুলিতে। ওর সেই বন্দুকটা—ফিশিং বোটে যেটা দেখিয়েছিল রানাকে—ওর গায়ের কাছে পড়ে আছে। ডেভকে খুন করে ওখানেই ফেলে রেখে গেছে খুনী।

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে রানা। কেমন অবাস্তব লাগছে দৃশ্যটা।

বাতাসে দড়াম করে বাড়ি খেল আবার সেই পাল্লাটা, গালে চড় মেরে বাস্তবে নিয়ে এল যেন রানাকে। লাশটা পরীক্ষা করল একবার। বন্দুকটার দিকে তাকিয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। হাত দিল না। ছাপ ফেলে গেলে ওকেই খুনী ভেবে হাজতে ভরতে পারেন সার্জেন্ট নিরেনসেন।

আর কিছু দেখার নেই এখানে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল রানা।

হোটেলের পিছনের চত্বরে জীপ রেখে পিছনের সিঁড়ি দিয়েই উপরে উঠে গেল রানা। নিজের ঘরে ঢুকল। জানালার কাছে বসে থাকতে দেখল রুথকে, বই পড়ছে।

চোখ তুলে তাকিয়েই একটা ধাক্কা খেল যেন রুথ। হাসি মুছে যাচ্ছে মুখ থেকে। বিস্ময় আর উদ্বেগ একইসঙ্গে ফুটে উঠল চেহারায়।

টলে উঠল রানা। বোঁ করে চক্কর দিয়ে উঠল মাথাটা। মনে হলো, আবার জ্ঞান হারাচ্ছে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে যাচ্ছে।

লাফ দিয়ে উঠে এল রুথ। দুই হাতে জড়িয়ে ধরে রানার পতন ঠেকাল।

কিছুক্ষণ পর গরম পানির শাওয়ার নিয়ে, কাপড় বদলে, কিছুটা সুস্থ হয়ে রুথকে সব কথা বলল রানা। তারপর দুজন চলে এল ডিটার ঘরে। দরজাটা ভিতর থেকে তালা দেয়া। জোরে জোরে ধাক্কা দিল, নাম ধরে ডাকল রানা; অবশেষে খুলে দিল ডিটা। চোখে ভয় নিয়ে তাকাল রানার দিকে। কেঁদে কেঁদে চোখ-মুখ ফুলিয়ে ফেলেছে। থরথর করে কাঁপছে যেন প্রচণ্ড জ্বরে।

প্রথমে রানার দিকে, তারপর রুথের দিকে তাকাল ডিটা। চোখে এসে পড়া কয়েক গাছি চুল হাত দিয়ে সরিয়ে দিল একপাশে। 'সরি, মিস্টার রানা, আমার এখন ভাল লাগছে না, কথা বলতে পারব না। রাতে ছুটি নিয়েছি। এখন ঘুমাব।'

আস্তে করে ঠেলে ওকে সরিয়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা। পিছনে এল রুথ।

'আমি তোমাকে বেরোতে দেখেছি, ডিটা,' রানা বলল।

'বেরোতে দেখেছেন?' ডিটা অবাক। 'কিছুই বুঝলাম না।'

'ডেভের বাড়ি থেকে বেরোতে দেখেছি। দৌড়ে পালাচ্ছিলে। আমি তখন ঢুকছিলাম।'

ধসে গেল যেন ডিটার মুখ। ঝটকা দিয়ে ঘুরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়। ফোঁপানির দমকে দুলে দুলে উঠতে লাগল দেহ। পাশে বসে আলতো করে ওর পিঠে হাত রাখল রানা। 'শান্ত হও, ডিটা। পুলিশকে জানিয়েছ?'

কান্নাভেজা মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল ও। 'বিশ্বাস করুন, আমি ওকে খুন

করিনি, সত্যি বলছি। আমি ঢুকে দেখি মরে পড়ে আছে।'

'বিশ্বাস করছি,' রানা বলল। 'ভয় পেয়ো না, ডিটা।'

'কিন্তু আমি আর ডেভ প্রায়ই ঝগড়া করতাম—অনেকেই জানে সেটা। সার্জেন্ট নিরেনসেনও জানেন।'

'তিনি এটাও জানেন কোন্‌টা সম্ভব আর কোন্‌টা নয়। যেভাবে একেবারে কাছে থেকে গুলি করা হয়েছে ডেভকে, দুটো নল খালি করা হয়েছে, সেটা দেখেই অনেক কিছু অনুমান করতে পারবেন সার্জেন্ট।' ডিটার দুই হাত শক্ত করে ধরল রানা। 'এখন বলো তো, কী হয়েছিল?'

'চল্লিশ মিনিট আগে ডেভ আমাকে ফোন করেছিল। একটা প্যাকেট রেখে গিয়েছিল আমার কাছে, সেটা নিয়ে যেতে বলেছিল। ও জানত আমার তখন ডিউটির সময়, কিন্তু তারপরেও নিতে বলেছিল—নেয়াটা নাকি খুবই জরুরি, জীবন-মৃত্যুর সামিল।'

'প্যাকেটে কি আছে জানো তুমি?'

মাথা ঝাঁকাল ডিটা। 'পর্বতে পাওয়া খনিজ পদার্থের নমুনা। এ-জিনিস নাকি ওকে মস্ত ধনী বানিয়ে দেবে। নিরাপদ জায়গায় সাবধানে রাখতে বলেছিল প্যাকেটটা। বলেছিল, আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এর ওপর।'

'কী ভবিষ্যৎ?'

'ও আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, মিস্টার রানা।'

'সে-তো জানি।'

আবার কাঁদতে শুরু করল ডিটা। চোখ মোছার জন্য রুমাল বের করে দিল রানা। ডিটার পাশে বসে একহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে রাখল রুথ। উঠে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল রানা। বেচারি! মায়া লাগছে মেয়েটার জন্য। এত বিশ্বাস করেছে একটা ঠগবাজ মানুষকে। নানাভাবে ওকে ফাঁকি দিয়েছে যে-লোক। প্যাকেটটাতে কী আছে, সেটাও সত্যি বলেনি।

কিছুক্ষণ কেঁদেকেটে নিজেকে কিছুটা সামলে নিল ডিটা।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে প্যাকেটটা নিয়ে ওখানে গিয়েছিলে তুমি?'

মাথা নাড়ল ডিটা। 'না। চুরি হয়ে যাবার ভয়ে ওটা সরিয়ে ফেলেছি। ইদানীং স্টাফ কোয়ার্টারগুলোতে চুরির ঘটনা বাড়ছে। তা ছাড়া ডেভকে তো চেনেন, একটা পয়সাও পকেটে রাখতে পারত না, জুয়ো খেলে উড়িয়ে দিত। ভয় ছিল, প্যাকেটের জিনিসগুলোও না বাজি রেখে খোয়ায়। তাই আমার নামে পার্সেল করে স্যাণ্ডভিগে আমার দাদার খামারে পাঠিয়ে দিয়েছি। সাপ্লাই বোটে করে কাল সকালেই ওখানে পৌঁছে যাবে।'

'ফোনে ডেভকে বলেছ এ কথা?'

মাথা ঝাঁকাল ডিটা।

'ডেভ শুনে কী বলল?'

'পাগলের মত হাসতে আরম্ভ করল। এমন হাসি, যেন কী মস্ত এক রসিকতা করে ফেলেছি। তারপর হঠাৎ ডেড হয়ে গেল ফোনটা।'

রুথের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কেউ একজন ছিল তখন ডেভের

সঙ্গে, সে-ই ফোনের তারটা ছিঁড়েছে।'

'আমি খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম,' ডিটা বলল। 'তাড়াতাড়ি কোটটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ডিউটির সময় যে তখন, এ কথাটাও মাথায় ছিল না।'

'ওর বাড়িতে ঢুকে দেখলে ও মরে পড়ে আছে।'

শূন্যের দিকে তাকিয়ে রইল ডিটা। আতঙ্ক ফুটল চেহারায়। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'রাস্তা থেকেই গুলির শব্দ শুনেছি। সামনের দরজা বন্ধ ছিল, তাই পিছন দিয়ে ঢুকেছি। তারপর লিভিং রুমে ঢুকে দেখি...এত রক্ত...উহ্, মা-গো!'

আবার কাঁদতে লাগল ও। সামলানোর ভার রুথের উপর ছেড়ে দিয়ে জানালার কাছে ফিরে এল রানা। কিছুক্ষণ পর রুথও রানার পাশে এসে দাঁড়াল। 'অযথাই এত কাণ্ড।'

'হ্যাঁ, অযথাই এত কাণ্ড করল ডেভ,' রানা বলল। 'ও যে মরে গেছে, কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। এত্ত প্রাণবন্ত ছিল মানুষটা!'

রানার বাহুতে হাত রাখল রুথ। 'পুলিশকে জানানো দরকার, রানা।'

'এখন না,' রানা বলল। 'আগে আরেকজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাকে।'

'মায়া নিভেন?'

'হ্যাঁ। ডেভের মৃত্যুর খবর শুনে ওর কী প্রতিক্রিয়া হয়, দেখা দরকার। ঘরে আছে নাকি কে জানে।'

'অকারণ সময় নষ্ট করতে যাবেন, ও এখন কথা বলতে পারবে না,' রুথ বলল। 'যদ্দূর জানি, সারাটা সন্ধ্যা গ্লেন আর ও একসঙ্গে ছিল।'

'তারমানে গ্লেনের ঘরে আছে বলছেন? কাঁচা ঘুম ভাঙাব?' ডিটাকে দেখাল রানা। 'আপনি ওর কাছে থাকুন। আমি আসছি।'

'না, আমিও যাব,' রানার পাশ কাটিয়ে ওকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে দরজার কাছে চলে এল রুথ। দরজা খুলল। 'খবরটা শুনে মেয়েমানুষটার চেহারা কেমন হয়, দুনিয়ার কোন কিছুর বিনিময়েই সেটা দেখা থেকে বঞ্চিত হতে রাজি নই আমি।'

গ্লেনের দরজার তালা লাগানো। পাল্লায় টোকা দিল রানা। সাড়া নেই। এরপর টোকা দিল, তারপর থাবা। সাড়া না পাওয়া পর্যন্ত দিতেই থাকল। অবশেষে নড়াচড়ার শব্দ হলো ভিতরে। খুলে দিলেন গ্লেন। ড্রেসিং গাউনের বেল্ট বাঁধেননি এখনও। এলোমেলো হয়ে আছে চুল। রানাকে দেখে বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার?'

ওঁর পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা। পিছনে রুথ।

রানা বলল, 'ওকে এখানে আসতে বলুন, গ্লেন।'

হাঁ করে রানার দিকে তাকিয়ে রইলেন গ্লেন। তারপর দড়াম করে দরজা লাগালেন। 'শোনো, রানা...'

বেডরুমের দরজার কাছে গিয়ে টান দিয়ে পাল্লা খুলল রানা। রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'মিসেস নিভেন, এ-ঘরে একটু আসতে হবে, জরুরি!'

দরজাটা আবার লাগিয়ে দিয়ে অন্য দুজনের কাছে ফিরে এল রানা। টেবিলে রাখা বাক্স থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে লাগাল রুথ। গ্লেন তাকিয়ে আছেন

রানার দিকে, ঝুলে পড়েছে দুদিকের গাল।

'রাত দুপুরে রসিকতা করতে এলে, রানা?'

'না, বিশ্বাস করুন, একটা মার্ডার হয়েছে একটু আগে।'

সাইড টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন গ্লেন। ট্রেতে রাখা কতগুলো বোতল থেকে একটা নিয়ে তা থেকে মদ ঢাললেন গ্লাসে। 'তোমার ধারণা এতে মায়াও জড়িত?'

'সে-রকমই তো মনে হচ্ছে।'

রানার পিছনে বেডরুমের দরজাটা খুলে গেল।

ফিরে তাকাল রানা। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে মায়া। সাদা হয়ে গেছে মুখ। পরনে বোতামওয়ালা একটা জার্সি। তাড়াহুড়া করে পরে এসেছে। চুলে চিরুনি চালানোর সময় পায়নি, এলোমেলো হয়ে সারা মাথায় ছড়িয়ে রয়েছে চুল।

'কী জরুরি ব্যাপার, মিস্টার রানা?' মায়া জিজ্ঞেস করল।

'ভাবলাম, একটু আগে ডেভ খুন হয়েছে, এই খবরটা জেনে আপনি খুশি হবেন।'

দুই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল মায়ার। 'কী বললেন? খুন?'

'হ্যাঁ,' রানা বলল, 'ও মারা গেছে। ওর বন্দুকটা দিয়েই কেউ ওকে গুলি করে মেরেছে। পয়েন্ট-ব্ল্যাংক রেঞ্জে গুলি করে মুখটা উড়িয়ে দিয়েছে।'

টলে উঠল মায়া। ধরার জন্য ছুটে গেলেন গ্লেন। ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। দুর্বল কণ্ঠে ওঁকে ধন্যবাদ দিল মায়া।

একটা গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে মায়ার হাতে দিল রানা। 'মিচেল আর রয় ধরতে পারলে আপনাকেও ছাড়বে না। ওদের সঙ্গে বেঈমানি করেছেন আপনি, তাই না? পড়ে যাওয়া প্লেনটার কেবিনের ছাতে, পাইলটের সিটের মাথার ওপর একগাদা হীরা-চুনি-পান্না লুকানো ছিল। আপনি সেটা ডেভকে জানিয়েছেন। আপনি ওকে চাপাচাপি করে প্লেন নিয়ে ওখানে যেতে বাধ্য করেছেন। কথা ছিল, দু'জনে ভাগাভাগি করে নেবেন হীরাগুলো। কিন্তু ডেভও আপনার সঙ্গে বেঈমানি করেছিল। ফিরে এসে বলেছিল, প্লেন নামানোর জায়গা নেই।'

'হ্যাঁ, বলেছিল,' দুই হাতে ব্র্যাণ্ডির গ্লাসটা ধরে ঠোঁটের কাছে নিয়ে গেল মায়া। 'আমাকে মিথ্যে বলেছিল।'

'কিন্তু আপনি শিওর হতে পারছিলেন না, তাই না? আমরা আইস-ক্যাপে চলে গেলে ও যাতে পালাতে না পারে, সেজন্যে রাতের বেলা গিয়ে ট্রাক দিয়ে গুঁতো মেরে ওর প্লেনটা ভেঙে দিয়েছিলেন।'

সাবধানে মাথা ঝাঁকাল মায়া। 'হ্যাঁ, ভেঙেছি, স্বীকার করছি। আরও স্বীকার করছি, মিচেল মোটেও ভাল মানুষ নয়। অবৈধ, অন্যায় কোন কাজ করতে পিছ-পা হয় না ও।'

'লণ্ডন অ্যাণ্ড ইউনিভার্সাল ইনশিওরেন্স কোম্পানির ব্যাপারটা কী?'

'ওটা ঠিকই আছে। ঠিক আছে বলছি এ কারণে, আমার স্বামীর মৃত্যুর পর বীমার সমস্ত টাকা শোধ করে দিয়েছিল ওরা—মিচেল আপনাকে আগেই বলেছে।'

'আপনার স্বামীর কথা বলুন।'

'শুরুতে ব্রাজিলিয়ান ইন্টারনাল এয়ারলাইনে প্লেন চালাত ও। তারপর আরেকটা বড় কোম্পানিতে ঢোকে। ওখানে থাকতে পরিচয় হয় রবার্ট ক্রুজেনারের সঙ্গে, স্যান পাউলোর এক বারে। কথায় কথায় ক্রুজেনার জানায়, এক ধনী ব্রাজিলিয়ানের কাছ থেকে একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড হিরন প্লেন কিনেছে ও। কিন্তু এক্সপোর্ট লাইসেন্স না পাওয়ায় বের করে নিয়ে যেতে পারছে না প্লেনটা। বেআইনীভাবে প্লেনটাকে বের করে নিয়ে গিয়ে মেক্সিকোর একটা ছোট এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিতে পারলে জেরিকে দশ হাজার ডলার দেবে বলেছে। ওখানে রেজিস্ট্রেশন নম্বর বদলে প্লেনটা নিয়ে আমেরিকা আর ক্যানাডা হয়ে ইয়োরোপে চলে যাবে সে। ক্রুজেনার বলেছে, আয়ারল্যাণ্ডে একজন ক্রেতা ঠিক করেছে, যে প্লেনটার জন্য ডবল দাম দিতে রাজি।'

'গোলমালটা হলো কোথায়?'

'একরাতে ক্রুজেনার মাতাল হয়ে জেরির কাছে ফাঁস করে দিল, প্লেনের ভিতরে প্রায় পঞ্চাশ লাখ ডলারের দামি পাথর লুকানো আছে। হীরা-চুনি-পান্না।'

'তখন আপনার স্বামী কী করলেন?'

'মিচেলকে জানিয়ে দিল ও খবরটা।'

'মিচেল বলল: সোজা আমার কাছে উড়িয়ে নিয়ে এসো প্লেনটা?'

'হ্যাঁ।' মায়া ভরা, করুণ চোখে রানার দিকে তাকাল মায়া। 'আমাকেও বলেছিল ও। জানতাম, কাজটা অন্যায়, তবু লোভটাকে সামাল দিতে পারিনি। আমি লণ্ডনে ছোট-খাট একটা চাকরি করি। আমাদের ছেলে দুটোকে দেখাশোনা করেন আমার শাশুড়ি। খুব কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলছিল আমাদের।'

'মিচেল নিশ্চয় আপনার স্বামীকে ক্রুজেনার যা দিতে চেয়েছিল তারচেয়ে বেশি টাকা দিতে চেয়েছিলেন?'

'না দিয়ে উপায় ছিল না মিচেলের। এক লাখ ডলার চেয়েছিল জেরি। সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, লণ্ডনে আমার হাতে টাকাটা পৌঁছে না দেয়া পর্যন্ত প্লেনটা নিয়ে যাবে না ও।'

'মিচেল কী বলল?'

শ্রাগ করল মায়া। 'না মেনে উপায় ছিল না মিচেলের। দিল।'

'আর টাকাটা কীভাবে কোত্থেকে এল, সে-সব নিয়ে নিশ্চয় আপনার কোনও মাথাব্যথা ছিল না?' রুথ বলল।

'স্মাগলিঙের চেয়ে খারাপ কাজ করেও লোকে টাকা কামায়,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল মায়া। 'আসলে, এ-সব কথা ভেবে নিজেই নিজেকে বুঝিয়েছি। বাচ্চা দুটোর ভবিষ্যৎ চিন্তা করেছি।'

সবাইকে অবাক করে দিয়ে জোরে হাততালি দিয়ে উঠল রানা। 'বা-বা-বা-বা, দারুণ অভিনয়! সত্যিই চমৎকার!'

'আহ্, রানা, ওকে এবার রেহাই দাও না!' গ্লেন বললেন। 'অনেক হয়েছে!'

'আপনার কেন কষ্ট লাগছে, বুঝতে পারছি, গ্লেন,' রানা বলল। 'একটা কথা শুনলে এখনই আপনার সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যাবে। শুনবেন? আসলে উনি মিসেস নিভেন নন।'

ধরে পিনপতন নীরবতা। একবার বজ্রপাতের পর আবার বাজ পড়ার আগে যেমনটি হয়। বিমূঢ় হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছেন গ্রেন। মায়াকে দেখে মনে হচ্ছে, ভূতে তাড়া করেছে ওকে, মুক্তির সমস্ত দুয়ার বন্ধ।

সামনে ঝুঁকল রুথ। সামান্য কুঁচকে গেছে দুই ভুরুর মাঝখানটা। মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কী করে জানলেন?'

'খুব সহজ।' দুই হাত দু'দিকে ছড়াল রানা। রহস্যময় কণ্ঠে বলল, 'কারণ, আমিই ছিলাম হিরন প্লেনটার পাইলট। ধসে পড়ার আগে আমিই ওটা চালাচ্ছিলাম, আমারই ছদ্মনাম জেরি নিভেন। অথচ আমার স্ত্রী, আমার দুই সন্তানের গর্ভধারিণী মায়া নিভেনকে আমি চিনতেই পারছি না, জীবনে দেখিনি!'

পনেরো

ডেভই এই ঘটনার সূত্রপাত করেছে—বলে চলেছে রানা। গত বছর জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে গ্রীনল্যাণ্ডে মৌসুমের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল ওর। তখন ক্যানাডায় চলে গিয়েছিল নতুন কাজের সন্ধানে। শীতকালে তুষারপাত শুরু হবার আগে ওখানে কিছু কাজ করতে পারলে বাড়তি টাকা আসবে।

গুজ বে-তে তিন দিন ঘুরে বেড়ানোর পর দুজন জিওলজিস্ট ওকে ভাড়া করল। কারসন মেডোর মিচিক্যামাউ লেকের পশ্চিমে ছোট্ট একটা এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছে দিল সে ওদেরকে। খরচ বাদে চারশো ডলার পেল ডেভ।

পরদিন শহরের একমাত্র হোটেলের বারে বসে কালো কফি খাচ্ছে ও, এ সময় সেখানে ঢুকল আঁরি গ্রেগ নামে ওর এক বন্ধু। লোকটা ফ্রেঞ্চ-ক্যানাডিয়ান, সে-ও বুশ পাইলটের কাজ করত, ডেভ আমাকে বলেছে। একটা ফ্লোট-প্লেন চালাত। ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার মাসখানেক পরে প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়।

যাই হোক, বারে ঢুকল আঁরি। ডেভকে দেখে এগিয়ে গিয়ে ওর পাশে বসল। জিজ্ঞেস করল, 'ডেভ, গ্রীনল্যাণ্ডে কেমন কাটছে দিনকাল?'

'এই মোটামুটি। প্লেন নিয়ে দিনের পর দিন উড়ে বেড়ালে কত আর ভাল থাকা যায়, বলো? তুমি তো জানোই। কাজটাজ পেলে তা ও একটু ভাল লাগে।'

'কেন, কাজ নেই নাকি তোমার?'

'আপাতত বেকার।'

আঁরি বলেছে, 'আমি একটা কাজ দিতে পারি। গ্র্যাণ্ট বে-তে রবার্ট ক্রুজেনার নামে এক লোক একজন পাইলট খুঁজছে। অগজিলারি ট্যাংক লাগানো একটা হিরন প্লেন আছে ওর। ওটা নিয়ে ওর সঙ্গে আয়ারল্যাণ্ডে যেতে হবে।'

'ওর পাইলট নেই?'

'না। টরোণ্টো থেকে ও নিজেই উড়িয়ে নিয়ে এসেছে। সহজ পথ হওয়ায় পেরেছে। কিন্তু আটলান্টিক পাড়ি দেয়ার ক্ষমতা নেই ওর।'

'কত দেবে?'

'দশ হাজার ডলার প্লাস খরচাপাতি।'

'তুমি করছ না কেন?'

'এর মধ্যে অপরাধের গন্ধ পাচ্ছি আমি,' আঁরি বলেছে।

'বেআইনী কিছু?'

'হ্যাঁ।' কিছুক্ষণ পর 'দুপুরে ফ্লাইট আছে' বলে চলে গেছে আঁরি।

দশ হাজার ডলার, অনেক টাকা। লোভটা ছাড়তে পারল না ডেভ। ক্রুজেনারের সঙ্গে দেখা করতে যাবার কথা ভাবল। কিন্তু হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়ল ও। জ্বর, সর্দি আর সেই সঙ্গে পেটে ব্যথা। তখন আমাকে এসে ধরল কাজটা করে দিতে। আমিও তখন গুজ বে-তে। বিশ্রাম নিচ্ছি। আমি বললাম, 'তোমার কাজ করে দিয়ে আমার কী লাভ? তা ছাড়া বেআইনী কাজ আমি করব না।'

অন্য পথ ধরল তখন ডেভ। ডিটার প্রতি আমার দুর্বলতার কথা জানে ও। মেয়েটাকে আমি ছোট বোনের মত ভালবাসি, তা-ও জানে। বলল, 'আমিও করতাম না, রানা। কিন্তু টাকা দরকার আমার। বিয়ের জন্যে চাপাচাপি করছে ডিটা। আমি ওকে বলেছি, টাকা ছাড়া বিয়ে করতে পারব না। দশ হাজার ডলার জমাব আগে, তারপর বিয়ে। কিন্তু আমার স্বভাব তো তুমি জানো। দশটা ডলার হাতে রাখতে পারি না, দশ হাজার জমাব কী করে? এই কাজটা করতে পারলে একসঙ্গে টাকাটা এসে যেত।' গজগজ করতে লাগল ও, 'শালার অসুখে ধরারও আর সময় পেল না।'

ডিটার কথা বলে আমাকে দুর্বল করে ফেলল ডেভ। শান্ত ছোট্ট বারটায় বসে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে ক্রুজেনার আর ওর হিরন বিমানটার কথা ভাবতে লাগলাম। যতদূর জানি, পুরানো মডেলের হলেও এই প্লেনগুলো খুব মজবুত আর নির্ভরযোগ্য। অগজিলারি ট্যাংক লাগানো থাকায় সাগর পাড়ি দিতেও অসুবিধে হবে না। কফির দাম দিয়ে বেরিয়ে এসে দ্রুত ফিরে এলাম এয়ারস্ট্রিপে।

গুজ থেকে গ্র্যান্ট বে দুশো মাইল দক্ষিণে। একটা খনি শহর। রওনা হলাম ওখানে। কিছুদূর যেতেই প্রবল বৃষ্টি শুরু হলো। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের জেণ্ডারে না থেকে গ্র্যান্ট বে-র মত একটা জায়গায় কেন গেল ক্রুজেনার, ভেবে অবাক লাগল। সন্দেহ হলো, সত্যি সত্যি একজন পাইলট খুঁজছে কি না তাই বা কে জানে।'

একটা ছোট টাওয়ার, আধ ডজন হ্যাঙার আর তিনটে রানওয়ে আছে ওখানে। ল্যাণ্ড করার অনুমতি পেলাম। অটারটাকে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে পার্ক করলাম প্রথম হ্যাঙারটার পাশে। ভিতরে কয়েকটা প্লেন দেখলাম, কিন্তু কোন হিরন নেই।

অবশেষে হ্যাঙারের অন্যপাশে দেখতে পেলাম ওটাকে, ভারী বৃষ্টির মধ্যে একা দাঁড়িয়ে আছে। বিমানটার চারপাশে ঘুরে দেখতে লাগলাম। ফিউজিলাজের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেলাম। রঙ দিয়ে লেখা ক্যানাডিয়ান রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে উঠে যাচ্ছে। আঙুল দিয়ে ডলা দিতেই আরও খানিকটা উঠে গেল। ভিতরে আরেকটা রেজিস্ট্রেশন নম্বর লেখা। ব্যাপারটা সন্দেহজনক। বুঝলাম, আঁরির কথাই ঠিক, বেআইনী কিছু করছে ক্রুজেনার।

শহরের একমাত্র হোটেলে পাওয়া গেল ওকে।

ঘরের দরজায় টোকা দিতে খুলে দিল লম্বা, সুদর্শন একজন ইংরেজ।

'মিস্টার ক্রুজেনার?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'শুনলাম, আপনি একজন পাইলট

খুঁজছেন।'

'ও, হ্যাঁ,' ও বলল। 'কার কাছে শুনলেন?'

'আঁরি গ্রেগ,' জবাব দিলাম। 'বারে বসে একজনের সঙ্গে আলোচনা করছিল। আমি শুনে ফেলেছি।

ঘরে ঢোকার জায়গা করে দিয়ে সরে দাঁড়াল ক্রুজেনার। ভিতরে ঢুকলাম। ঘরটা খুবই সাধারণ। অবশ্য ওরকম একটা জায়গায় হোটেলে এরচেয়ে ভাল ঘর আশাও করা যায় না। একটা কাঠের ওয়োরড্রোব, একটা পুরানো বিছানা, লোম ওঠা পাতলা হয়ে আসা কার্পেট। ড্রেসারের কাছে গিয়ে ড্রয়ার থেকে আধবোতল উইস্কি আর ওয়াশবেসিনের উপর থেকে একটা গ্লাস নিয়ে এল ও। আমাকে জিজ্ঞেস করল 'খাবেন?'

মাথা নাড়লাম। গ্লাসে মদ ঢেলে আমার দিকে তাকাল ক্রুজেনার। 'পাইলটের লাইসেন্স তো নিশ্চয় আছে আপনার?'

মাথা ঝাঁকিয়ে পকেট থেকে ওয়ালেট বের করলাম। গ্র্যান্ট বে-তে কেউ চেনে না আমাকে। আর এই সুযোগটা নেয়ার কথা ভাবলাম আমি। এই ঘটনার কিছুদিন আগে জেরি নিভেন নামে আমার এক ক্যানাডিয়ান বন্ধু হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছিল। হাসপাতালে আমি তখন ওর সঙ্গে ছিলাম। কোনও আত্মীয়-স্বজন না থাকায় ওর জিনিসপত্রগুলো আমার জিম্মায় চলে এল। জিনিসপত্র বলতে তেমন কিছু ছিল না, দামি কিছু তো নয়ই। প্রায় সবই ফেলে দিতে হলো। তবে ওর পাইলটের লাইসেন্সটা ফেলতে গিয়েও ফেলিনি, বন্ধুর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে দিয়েছিলাম। ওয়ালেট থেকে সেটা বের করে ক্রুজেনারকে দেখালাম।

হাতে নিয়ে দেখে আমাকে ফিরিয়ে দিল ওটা ক্রুজেনার। বলল, 'হুঁ, মনে হয় সব ঠিকই আছে, মিস্টার নিভেন। এয়ার ফিল্ডে একটা হিরন আছে আমার, টরোন্টোতে খুব কম দামে কিনেছি। নিজেই উড়িয়ে এনেছি এখানে, কিন্তু আটলান্টিক পাড়ি দেবার সাধ্য আমার নেই। আয়ারল্যাণ্ডে একজন ক্রেতা ঠিক করে রেখেছি, নিয়ে গেলেই ডবল টাকা। এ সপ্তাহের শেষে নিয়ে যেতে হবে। আপনি ইন্টারেস্টেড?'

'কত দেবেন?'

'দশ হাজার ডলার, আর শ্যানন থেকে ফিরে আসার ভাড়া।'

'বিশ হাজার,' আমি বললাম। 'বিশ হাজার, সেই সাথে ফিরতি ভাড়ার টাকা।'

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল ও।

আমি বললাম, 'এখনও দুদিন সময় আছে আপনার হাতে, আর কোনও পাইলট আসে কি না অপেক্ষা করে দেখতে পারেন। তবে আমার সন্দেহ আছে। বছরের এ সময়ে কাউকে পাবেন বলে মনে হয় না। যা-ই হোক, সেটা আপনার ব্যাপার। আরেকটা কথা, হিরনটা ওখানে বেশিক্ষণ ওভাবে থাকলে ফিউজিলাজের রঙ পুরোটাই উঠে যাবে বৃষ্টিতে, নীচের পুরানো রেজিস্ট্রেশন নম্বর বেরিয়ে পড়বে—নাকি ওটা নিয়েও কোন মাথাব্যথা নেই আপনার?'

ভালমত ধাক্কা খেল ক্রুজেনার। 'ঠিক আছে, মিস্টার নিভেন, বিশ হাজারই দেব। বিশ হাজার প্লাস ফিরতি ভাড়া। মনে হচ্ছে দুজনে মিলে ভালই কাজ করতে

পারব আমরা।

'টাকাটা নগদ চাই,' আমি বললাম। 'এখান থেকে রওনা দেবার আগেই।

'কবে পারবেন?'

ইতিমধ্যেই আমি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি গুজ-এ ফিরে গিয়ে অটারটা ওখানেই রেখে আসব। আর কিছু না পেলে মেইল প্লেনে করে ফিরে আসতে পারব। কতটা সময় লাগবে হিসেব করে জবাব দিলাম, 'আবহাওয়ার রিপোর্ট ভাল থাকলে কাল বিকেলে রওনা দিতে পারব। চলবে?'

'খুব ভালমত। কাল সকালে প্লেনের ইঞ্জিন চেক করিয়ে রাখব আমি।

'ঠিক আছে।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে এয়ারস্ট্রিপে ফিরে এলাম। কাজটা নেয়ার জন্য পস্তানো শুরু করে দিয়েছি ততক্ষণে। কিন্তু ফেরার পথ নেই আর, কথা দিয়ে ফেলেছি। তা ছাড়া এতক্ষণে ডিটাকে নিশ্চয় জানিয়ে দিয়েছে ডেভ যে, আমি কাজটা করছি। আশা করে বসে থাকবে মেয়েটা। ডিটার জন্যই কাজটা করছি আমি—বলে আবার নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম।

পরদিন বিকেলে যখন রওনা হলাম আমরা, তখনও বৃষ্টি হচ্ছিল। তবে আবহাওয়ার রিপোর্টে খারাপ কিছু নেই। বলছে: সাগরপাড়ি দিতে কোন অসুবিধে হবে না। কাস্টমস কন্ট্রোল নেই ওখানে, আর গ্র্যান্ট বে-তে নিয়মকানুন যতটা সম্ভব সহজ আর ঢিলেঢালা করে রাখা হয়েছে। আর এ কারণেই, ওখান থেকে যে কোনদিকে যেতে সুবিধে হবে ভেবে হিরনটা ওখানে নিয়ে গিয়েছিল ক্রুজেনার। আমি যখন গিয়ে পৌঁছলাম, কাগজপত্র সব ঠিক করেই রেখেছিল ও। ইঞ্জিন চেক করেছিল যে দুজন মেকানিক, ওরাও আমার চেহারার দিকে ভালমত তাকানোর প্রয়োজন মনে করেনি। তাতে খুবই সুবিধে হয়েছে আমার।

আমার পাওনা পরিশোধ করে দিল ক্রুজেনার। খামে ভরে টাকাগুলো জেনারেল ডেলিভারির কেয়ারে আমার নামে গুজ বে-তে পাঠিয়ে দিলাম। কাজ সেরে পরে টাকাগুলো তুলে নিয়ে গিয়ে হাতে হাতে ডিটাকে দিয়ে আসব।

সব ঠিকঠাক। তেলের হিসেব করে দেখলাম—নরম্যাল ট্যাংকের তেল দিয়ে অর্ধেক পথ যেতে পারব, বাকিটা পার হব অগজিলারি ট্যাংকের তেল দিয়ে। পাইলটের সিটে বসে ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেল চেক করছি, এ সময় আমার পাশে এসে বসল ক্রুজেনার।

নতুন একটা ফ্লাইং-সুট পরেছে ও। বেশ খোশমেজাজে আছে।

'রেডি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'রেডি। ও, একটা কথা।' চার্ট বোর্ডে ক্লিপ দিয়ে আটকানো একটা ম্যাপ বাড়িয়ে দিল আমার দিকে ক্রুজেনার। 'এটা দেখুন। তা হলেই বুঝতে পারবেন গন্তব্য বদল করেছি।

দেখলাম। গ্র্যান্ট বে থেকে সরাসরি উত্তর-পশ্চিমে কোর্স ঠিক করা হয়েছে। গ্রীনল্যাণ্ডের মাথা ছুঁয়ে আইসল্যাণ্ডের রেকিয়াভিকে গিয়ে শেষ হয়েছে। ষোলোশো মাইলের ধাক্কা।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইলাম।

এক পকেট থেকে একটা খাম বের করল ও। আমাকে দিয়ে বলল, 'এখানে আরও দুই হাজার আছে।'

খুলে দেখলাম, ঠিকই আছে। খামটা ফ্লাইং জ্যাকেটের ভিতরের পকেটে ভরলাম। এগুলোও ডিটাকে দিয়ে দেব।

হাসল ও। 'কোর্স বদলানোর কথা টাওয়ারকে জানানোর কোন প্রয়োজন নেই। আমরা কোথায় নামব সেটা আমাদের ব্যাপার।

'আপনি বস, যা বলবেন তা-ই হবে।' ট্যাক্সিইং করে রানওয়েতে উঠলাম।

আকাশে যখন উড়লাম, তখনও বৃষ্টি হচ্ছে। সীসার মত রং, আর সীসার মতই ভারী হয়ে আছে যেন আকাশটা। সাগরের উপর বেশ খানিকটা চলে আসার আগে কোর্স বদল করলাম না। খুব সুন্দর কাজ করছে প্লেনের ইঞ্জিন, কোনরকম ঝামেলা করছে না। দূর দিগন্তে মেঘের প্রান্তে রঙের ছোঁয়া। আরাম করে বসেছি। আমার হাত আলতোভাবে কন্ট্রোলে রাখা। উপভোগ করতে আরম্ভ করেছি যাত্রাটা।

দুই ঘণ্টায় পেরিয়ে এলাম পাঁচশো মাইল। কন্ট্রোলের ভার কয়েক মিনিটের জন্য ক্রুজেনারের হাতে দিয়ে প্লেনের লেজের কাছে ল্যাভেটরিতে চললাম। টান দিয়ে দরজার পাল্লাটা খুলেই চমকে গেলাম। গ্র্যান্ট বে-তে দুই মেকানিকের পরনে যে রকম পোশাক দেখেছিলাম সে-রকম পোশাক পরা একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। ডান হাতে একটা লুগার অটোমেটিক পিস্তল।

'কী, চমকে গেলেন নাকি? বসে থেকে থেকে অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম। আপনি আসতে আরেকটু দেরি করলে আমি নিজেই হাজির হয়ে যেতাম ককপিটে।' পিস্তলটা আমার পেট বরাবর তাক করে ধরল ও। 'চলুন, শুনি, জনাব ক্রুজেনার আমাকে দেখে কী বলেন।'

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, আমার সঙ্গে মশকরা করছে না ও।

'আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না,' আমি বললাম। 'তবে দয়া করে ওই জিনিসটা সরান, আমি কিছু করব না। আমি পাইলট। আমাকে ছাড়া চলবে না আপনার। ক্রুজেনার প্লেন চালাতে জানে, কিন্তু আটলান্টিক পাড়ি দেয়ার ক্ষমতা নেই ওর। তাই আমাকে ভাড়া করেছে।'

'মাই ডিয়ার মিস্টার পাইলট, আপনার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, চোখ বুজে দুনিয়ার যে কোনও জায়গায় এই প্লেনটা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব আমি। অতএব আপনাকে ছাড়া চলবে না, এই কথাটা ঠিক নয়।'

তবে আমাকে কিছু করল না ও। কেবিনের কাছে ফিরে এলাম। টান দিয়ে দরজা খুললাম। আমি এসেছি ভেবে হাসিমুখে ফিরে তাকাল ক্রুজেনার। কিন্তু আমার পিছনে তাকিয়ে দ্রুত হাসি মুছে গেল ওর মুখ থেকে। ব্রেয়ার!'

'হ্যাঁ, আমি।' লুগারের নল দিয়ে আমার কাঁধে টোকা দিল ব্রেয়ার। 'যান, আপনার সিটে গিয়ে বসুন।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ক্রুজেনারের মুখ। তবে সামলে নিয়েছে অনেকটা।

'ঘটনাটা কী, দয়া করে বলবেন আমাকে?' জিজ্ঞেস করলাম।

মাথা নাড়ল ব্রেয়ার। 'সেটা আপনার না জানলেও চলবে। শুধু কয়েকটা তথ্য

জানতে চাই। গ্র্যান্ট বে থেকে শ্যানন পর্যন্ত কোর্স সেট করেছেন কীভাবে?'

ক্রুজেনারের দিকে তাকালাম। মাথা ঝাঁকাল ও। আমি বললাম, 'শ্যাননে যাচ্ছি না আমরা। আমাদের গন্তব্য আইসল্যাণ্ডের রেকিয়াভিক।'

'বা-হা, তাই নাকি!' ব্রেয়ার বলল, 'এ রকম তো কথা ছিল না। যাকগে, কতদূর এলেন?'

'ছয়শো মাইলের কিছু বেশি।

উজ্জ্বল হলো ব্রেয়ারের মুখ। হাসল। 'আচ্ছা! অসুবিধে নেই, আইসল্যাণ্ড হলেও চলবে আমার।' ক্রুজেনারের দিকে তাকাল ও। 'রবার্ট, তুমি একটা আস্ত গাধা। যা করার তো করে ফেলেছ। এখন আমি আমার ভাগ চাই।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে!' দ্রুত হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল ক্রুজেনার। 'এখানে আর কিছু বলার দরকার নেই। চলো, অন্য কোথাও বসে কথা বলি।'

কেবিন থেকে পিছিয়ে বেরিয়ে গেল ব্রেয়ার। ক্রুজেনারও উঠে চলে গেল। পিছনে লাগিয়ে দিয়ে গেল দরজাটা। পুরো পাঁচ মিনিট ওদের কথার শব্দ কানে এল আমার। কিন্তু কী বলছে, প্লেনের ইঞ্জিনের শব্দে বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ গুলির শব্দ শুনলাম। পর পর দু'বার। সামান্য বিরতি দিয়ে আবার, এবার তিন বার। উইণ্ডস্ক্রিন ফুটো করে বেরিয়ে গেল দুটো বুলেট।

প্লেনের নিয়ন্ত্রণ অটোম্যাটিক পাইলটের উপর ছেড়ে দিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলাম। সিট ছেড়ে সবে উঠেছি, ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। আমার বাড়ানো দুই হাতের উপর এসে পড়ল ক্রুজেনার। পাশের সিটটাতে বসিয়ে দিলাম ওকে। ওর ফ্লাইং সুটটা খুলে দিতে লাগলাম। আমার জ্যাকেট আঁকড়ে ধরে রাখল ও। দেখলাম, ওর মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। সিটের পিছনে নেতিয়ে পড়ল ওর মাথাটা। একপাশে কাত হয়ে গেল। চোখ দুটো নিষ্প্রাণ। শূন্য দৃষ্টি।

মেইন কেবিনে দরজার কাছে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখলাম ব্রেয়ারকে। চিত করে দেখি ও-ও মরে গেছে। দুটো গুলি খেয়েছে। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, কী ভয়ানক বিপদে পড়েছি। আমার ঘাড়ে দুটো লাশ—কী নিয়ে ঝগড়া ওদের জানি না—নিজেদের মধ্যে গোলাগুলি করে মরেছে দুটোই।

গ্যালিতে চলে এলাম। ফ্লাস্ক থেকে এক কাপ গরম কফি ঢেলে খেয়ে নিলাম। তারপর আরেক কাপ ঢেলে নিয়ে ভাবতে বসলাম।

কী করব এখন আমি? সাগরে ফেলে দিতে পারি। লাশের ঝামেলা থেকে বাঁচব। কিন্তু কোথাও না কোথাও নামতে হবে আমাকে। কৈফিয়ত কী দেব? তদন্ত হবেই। ভালমত ফেঁসে যাব তখন। একটা কাজই করতে পারি, প্লেনটাকে নিরুদ্দেশ করে দেয়া। পানিতে ফেলতে পারব না। তা হলে আমি বাঁচব কী করে? একটা কাজ করা যেতে পারে। ডাঙার কোন নির্জন বুনো জায়গায় নিয়ে গিয়ে, প্লেনটা যাতে মাটিতে ধসে পড়ে, সেই ব্যবস্থা করে রেখে প্লেন থেকে প্যারাশুট নিয়ে ঝাঁপ দিতে পারি। অগজিলারি ট্যাংকে যে পেট্রল আছে, তাতে বারুদে জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি পড়ার মত জ্বলে উঠবে প্লেনটা। পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

অন্য কোনখানে হলে ব্যাপারটা অসম্ভব হতো, কিন্তু আমি যে জায়গায় রয়েছি, সেটা এতই নির্জন, বিমানটা ধসে পড়ার কথা কেউ জানতেই পারবে না। তবে বেশি

দূরে ফেললে চলবে না। এমন কোথাও ফেলব, আমি যাতে নেমে লোকালয়ে পৌঁছতে পারি।

সুসমাধান একটা পেয়েই স্বস্তিতে আপন মনে হেসে উঠলাম। দ্রুত ফিরে এলাম পাইলটের কেবিনে। সিটে বসে চার্ট দেখলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে গেলাম যা খুঁজছিলাম। গ্রীনল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে স্যাণ্ডভিগ নামে ছোট একটা গ্রাম আছে। গ্রামটা যে ফিয়র্ডের, সেই ফিয়র্ডটা মূল ভূখণ্ডের ভিতরে ঢুকে পর্বতকে কেটে দিয়ে চলে গেছে পর্বতের অন্যপাশে আইস-ক্যাপের দিকে। ওই আইস-ক্যাপটা অসম্ভব নির্জন একটা জায়গা। গত কয়েক বছরে বহু প্লেন নিখোঁজ হয়েছে ওটা পেরোনোর সময়। সে-সব নিখোঁজ প্লেনের সঙ্গে হিরনটাও যুক্ত হবে। শ্যাননে যখন পৌঁছবে না ওটা, অফিশিয়ালি তদন্ত হবে, সবাই ধরে নেবে অ্যাক্সিডেন্টের শিকার হয়েছে বিমানটা, তলিয়ে গেছে আটলান্টিক মহাসাগরে।

সাবধানে উপকূলের দূরত্ব আর তেলের হিসেব করলাম। যেখানে রয়েছি, সেখান থেকে আরও সাড়ে চারশো মাইল যেতে হবে। মেইন ট্যাংকে তেল যা অবশিষ্ট আছে, তাতে পাঁচশো মাইলমত চলবে। ওই উপকূলে পৌঁছে প্লেনটাকে অটো-পাইলটের উপর ছেড়ে দিয়ে, অগজিলারি ট্যাংকের সুইচ অন না করেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমি নামার পরেও প্লেনটা আরও পঞ্চাশ মাইল উড়ে যাবে। মেইন ট্যাংকের তেল ফুরিয়ে গেলে নীচে খসে পড়বে। মুহূর্তে অগজিলারি ট্যাংকের তেলে আগুন ধরে গিয়ে বিস্ফোরিত হবে।

এখানে কঠিন কাজটা হলো শূন্য থেকে ঝাঁপ দেয়া। হিসেবের গোলমাল হলে, সঠিক জায়গায় না পড়লে, ভীষণ বিপদ হতে পারে। তবে এ ঝুঁকিটা নিতেই হবে।

সঠিক জায়গায় নামতে পারলে লোকালয়ে হেঁটে যেতে পারব আমি। স্যাণ্ডভিগ গাঁয়ে ডট জুনোর বাড়িতে যাব ঠিক করলাম। কোথা থেকে ওঁর বাড়িতে গেলাম—একটা বিশ্বাসযোগ্য গল্প বানিয়ে বলতে হবে। তবে সেটা তেমন কঠিন হবে না। ফ্রেডেরিকসবর্গ থেকে স্যাণ্ডভিগে যাওয়ার একটা রাস্তা আছে। আমি বলতে পারি, জীপ নিয়ে শিকারে বেরিয়েছিলাম। অ্যাক্সিডেন্টে গাড়িটা সহ সমস্ত মাল-সামান হারিয়েছি।

পরিকল্পনা ঠিক করে সিটে হেলান দিলাম। পাশে বসা ক্রুজেনারের লাশটার দিকে তাকালাম একবার। দৃশ্যটা মোটেও সুখকর নয়। তবে বেশিক্ষণ আর এই দৃশ্য দেখতে হবে না আমাকে।

সামনে ডাঙা দেখা যেতে সাগরের তিন হাজার ফুট উপরে প্লেন নামিয়ে আনলাম। চাঁদের উজ্জ্বল সাদা আলোয় গ্রীনল্যাণ্ড আইস-ক্যাপ মুক্তোর মালার মত জ্বলছে।

কেপ ডেজোলেশনের পূর্বদিকে অবস্থিত জুলিয়ান বাইট ধোঁয়াটে কুয়াশায় ঢাকা পড়ে ঘোষণা করছে বাতাসের জোর একেবারেই নেই, বড়জোর পাঁচ নট। ভালই হলো আমার জন্য। আর কিছু না হোক, অন্তত একটা সুবিধে হবে, ফিয়র্ডের মাথার কাছে উপত্যকায় নামার সুযোগ পাব।

ভাঙা উইণ্ডস্ক্রিন দিয়ে হিমশীতল বাতাস ঢুকে কেবিনটাকে ঠাণ্ডা করে ফেলেছে। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের অসংখ্য আলো দৃষ্টিকে কেমন বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে। মাঝে

মাঝে আলোগুলো সব মিলেমিশে একাকার, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে তারপর আবার স্পষ্ট হচ্ছে।

দূরে, কুয়াশার ওপাশে জ্যোৎস্নায় ঝলমল করে উঠল রুপালী-সাদা ফিয়র্ড। তার ওপাশে আইস-ক্যাপের প্রতিটি আদল তীক্ষ্ণ করে তুলেছে চাঁদের আলো।

সময় হয়েছে। গতি কমালাম। প্লেনের নিয়ন্ত্রণ অটোপাইলটে ছেড়ে দিয়ে সেফটি বেল্ট খুললাম। পরিচিত দৃশ্যটা লাফ দিয়ে উঠে এল আবার চোখের সামনে। অসীম শূন্যের দিকে স্থির নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা দেহটা কো-পাইলটের সিটে অলস ভঙ্গিতে পড়ে আছে। ইন্সট্রুমেন্টস প্যানেলের আলোর কারসাজিতে মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যাচ্ছে মুণ্ডুটা।

মেইন কেবিনের অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেলাম। হোচট খেতে খেতে এসে এক হাঁটুতে ভর দিয়ে বসলাম অন্য দেহটার পাশে। হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখলাম বরফ-কঠিন ঠাণ্ডা মুখটা। নাহ্, মরেই গেছে, কোন সন্দেহ নেই। উঠে দাঁড়িয়ে এগোলাম আবার অন্ধকারের দিকে। হাতড়ে খুঁজে বের করলাম এগ্জিট্ হ্যাচের কুইক রিলিজ হ্যাণ্ডেলটা।

রাতের আকাশে উড়ে চলেছে প্লেন। নির্দ্বিধায় শূন্যে ঝাঁপ দিলাম। তীব্র ঠাণ্ডা যেন গিলে নিল আমাকে। ডিগবাজি খেয়ে পড়তে পড়তে মাথার উপর দিয়ে পুবদিকে উড়ে যেতে দেখলাম প্লেনটাকে, চাঁদের আলোয় ভূতুড়ে লাগছে ওটাকে।

প্যারাশুট খোলার রিঙের দিকে হাত বাড়ালাম। জায়গামত পেলাম না জিনিসটা। চমকে উঠলাম। নেই নাকি! সর্বনাশ!

একটা বিট মিস করল হৃৎপিণ্ডটা। গলার ভিতরটা শুকিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে খুঁজলাম আবার। এবার হাতে ঠেকল রিংটা। টান দিতেই স্বস্তিকর শব্দটা কানে এল, প্যারাশুট খোলার। মাথার উপর ব্যাঙের ছাতার মত খুলে গেল প্যারাশুট, সাদা একটা মস্ত ফুল তৈরি করে দুলে দুলে নামতে থাকল নীচে। নীচের পাহাড় আর ফিয়র্ড দেখে নিশ্চিত হলাম, ঠিক জায়গাতেই ঝাঁপ দিয়েছি।

ষোলো

জানালায় আঘাত হানছে বৃষ্টির ফোঁটা। কাঁচের শার্সির ভিতর দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকাল রানা।

'নামার পর কী করলেন?' জানতে চাইলেন গ্লেন।

'চাঁদের আলোয় হেঁটে পাড়ি দিলাম বারো মাইল পথ,' রানা বলল। 'বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে খারাপ লাগছিল না। ডট জুনোকে বললাম, পর্বতের ওদিকে শিকারে গিয়েছিলাম। জীপ চালাচ্ছিলাম। হঠাৎ বরফে পিছলে গেল চাকা। কোনমতেই সামলাতে পারলাম না। রাস্তার পাশে গভীর খাদে পড়ে গেল ওটা। নীচে পড়ার আগে কোনমতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বেঁচেছি আমি। যেখানে পড়েছে, সেখানে পাতলা বরফের নীচে পানি আছে, জীপটা তলিয়ে গেছে সে-পানিতে।' একটু থেমে

রানা বলল, এ ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটে এই অঞ্চলে। একটুও সন্দেহ করলেন না জুনো। পরদিন একটা ফিশিং বোটে করে ফ্রেডেরিকসবর্গে ফিরে এলাম। ডলারগুলো ডিটার হাতে দিয়ে সেই দিনই একটা ক্যাটালিনা ফ্লাইং বোটে করে নিউফাউণ্ড্ল্যাণ্ডে ফিরে গেলাম। ঈস্ট ক্যানাডা এয়ারওয়েজের ওই বোটগুলো গ্রীষ্মকালে এখানকার উপকূলে চলাচল করে, শীতকালে চলে যায়।'

'তারপর একটা বছর পেরিয়ে গেছে, তার পরেও ডিটাকে বিয়ে করেনি গোল্ডবার্গ?' জানতে চাইল রুথ।

'না। ওর কাছ থেকে নানান ছুতোয় টাকাগুলো হাতিয়ে নিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে জুয়া খেলে।'

বিছানার কিনারে বসে আছে মায়া নিভেন। রুমালটা পাকিয়ে বল বানিয়ে শক্ত করে ধরে রেখেছে মুঠোর মধ্যে। মুখ থেকে সমস্ত রঙ চলে গেছে।

ধীরে ধীরে ওর দিকে ফিরে তাকালেন গ্লেন। 'আমাকে তুমি ভীষণ বোকা বানিয়েছ, এইঞ্জেল। কে তুমি, এখন সত্যি কথাটা বলো তো।'

'তাতে কি আর কিছু এসে-যায় এখন?' মায়া জিজ্ঞেস করল।

'না, তা যায় না।' গ্লাসে আবার মদ ঢাললেন গ্লেন।

একটা চেয়ার টেনে মায়ার সামনে বসল রানা। 'এবার সত্যি কথাটা বলুন তো। আমি সব জানতে চাই।'

'বেশ,' ক্লান্তকণ্ঠে বলল মায়া। 'কী জানতে চান?'

'প্রথমেই ওই পাথরগুলোর কথা বলুন। ওগুলোর আসল মালিক কে?'

'ব্রাজিলের একটা জুয়েল কোম্পানি। ওই রত্নগুলো দেশের ভিতরের কোনখান থেকে হিরন প্লেনটাতে করে সাউ পাউলোতে পাঠানো হচ্ছিল। স্থানীয় অপরাধীদের সহায়তায় প্লেনটা হাইজ্যাক করেছিল ক্রুজেনার। ব্রেয়ার ওকে উড়িয়ে নিয়ে আসার জন্যে গ্র্যান্ট বে-তে অপেক্ষা করছিল।'

'আর সবকিছুর পিছনে ছিল মিচেল?

'হ্যাঁ।'

'আপনি ঢুকলেন কীভাবে?

শ্রাগ করল মায়া। 'আমি মিচেলের কাজ করি। বহু বছর ধরে ওর সঙ্গে আছি'।

'হিরনটা নিখোঁজ হওয়ার পর মিচেলের প্রতিক্রিয়া কী রকম ছিল?'

'মেনে নিয়েছিল। বলেছিল, এ ব্যবসায় এ রকম ঘটনা ঘটতেই পারে।

'রহস্যময় মিস্টার নিভেনকে নিয়ে মাথা ঘামায়নি?'

মাথা নাড়ল মায়া। 'নাহ্। ব্রেয়ার প্রায়ই ছদ্মনাম ব্যবহার করত। মিচেল ভেবেছিল, ব্রেয়ারই নিভেন নামে প্লেনে উঠেছে।'

আবার গ্লাসে মদ ঢাললেন গ্লেন। রানার দিকে তাকালেন। 'তারমানে, ক্রুজেনার ব্রেয়ারকে ফাঁকি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু ব্রেয়ার ওকে ধরে ফেলেছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। মায়াকে বলল, 'নিভেনের বিধবা স্ত্রী হিসেবে আপনাকে চালিয়ে দেয়ার বুদ্ধিটা খারাপ না। আরেকটা কথা বলুন—ডেন্টাল রেকর্ড আর আংটিটা আসলে কার ছিল?'

'ব্রেয়ারেরই। আংটিটা ওকে দিয়েছিল ওর বউ মায়া।

'হুঁ।' গ্লেনের দিকে তাকাল রানা। 'ডেন্টাল রেকর্ড জোগাড় করতে অসুবিধে হয়নি মিচেলের। আর আংটিটার কথাও জানা ছিল ওর।'

বিস্মিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন গ্লেন। 'একটা কথা বুঝতে পারছি না—রত্নগুলোর কী হলো?'

'প্যাকেটটা হিরণ থেকে নিয়ে এসে ডিটাকে দিয়েছিল ডেভ লুকিয়ে রাখতে ডিটা কীভাবে ওগুলো নিজের নামে স্যাণ্ডভিগে পাঠিয়ে দিয়েছে, বলল না রানা। কিন্তু হঠাৎই পরিষ্কার বুঝতে পারল, টেলিফোনের বদৌলতে খুবসম্ভব ডেভের খুনিরা জানে ওগুলো কোথায় পাঠিয়ে দিয়েছে ডিটা। এখন যে-কোনও মুহূর্তে আক্রমণ আসবে ডিটা ও তার দাদুর উপর।

মোলায়েম শিস দিলেন গ্লেন। 'এখন নিশ্চয় নিরেনসেনকে জানানোর সময় হয়েছে?'

'পাবেন কোথায়? উনি এখন একশো মাইল দূরের একটা গাঁয়ে রেইনডিয়ার শিকারিদের ঝগড়া মেটাচ্ছেন,' রানা বলল। 'কাল বিকেলের আগে ফিরবেন না। আমারই গিয়ে নিয়ে আসার কথা।'

'কিন্তু আর তো নিশ্চয় যেতে পারছ না তুমি?'

'মনে হচ্ছে না।

জানালার কাছে এসে বাইরে তাকাল রানা। কুয়াশা ঘন হয়েছে আরও, কিন্তু বৃষ্টি কমে এসেছে অনেক। ফিরে তাকাতেই দেখল, কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে রুথ।

অস্বাভাবিক বড় লাগছে রুথের চোখ দুটো, মুখের চামড়া অন্যরকম হয়ে গেছে, বয়স্ক দেখাচ্ছে ওকে। 'সত্যি আপনি এখান থেকে চলে যেতে চান? ঝড় থামার আগেই?'

'তা-ই তো করা উচিত,' রানা বলল। 'ঝড় থামার অপেক্ষায় বসে থাকলে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে।'

একটা কথা বলুন। আপনি যদি মুখ বন্ধ রাখেন, ক্রুজেনার আর ব্লেয়ার যে গুলি খেয়ে মরেছে, সেটা কি কেউ জানতে পারবে?'

'কী করে জানবে?' রানা জবাব দেয়ার আগেই গ্লেন বললেন, 'রুথ ঠিকই বলেছে, রানা। তোমার কাছে যা বর্ণনা শুনলাম. তাতে মনে হচ্ছে লাশ দুটোর অবস্থা খুবই খারাপ।'

'তা হলে মুখ বন্ধ রাখছেন না কেন?' আবার বলল রুথ। 'আপনি যে প্লেনে ছিলেন, জানতেই পারবে না পুলিশ।'

'পুলিশ জানবে,' বলল রানা। মায়ার দিকে তাকাল, 'ইনি যে-ই হোন, এঁর পেট থেকে সবকথা বের করে নেবে মিচেল—রত্নগুলো উদ্ধার করতে না পারলে পুলিশকে জানাবে। আসলে, শেষপর্যন্ত কিছুই কখনও চাপা থাকে না,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে জবাব দিল রানা। 'মনে হচ্ছে পালানোই উচিত আমার।'

মৃদু হাসি ফুটল রুথের মুখে। 'কিন্তু আপনি পালাবেন না, মিস্টার রানা। ওটা আপনার স্বভাব নয়।'

রানাও জানে সেটা। হেসে বলল, 'বেশ সবাই যখন বলছেন, নাহয় থেকেই

গেলাম। কিন্তু থেকে কী করব? এই ঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে গিয়ে ধরার চেষ্টা করব রয় আর মিচেলকে? শুধু ওদেরকে ধরলে চলবে না, তেজো আর তার গুণ্ডাপার্টিকেও ধরতে হবে, একা।'

জানালার কাছে এসে বাইরে উঁকি দিলেন গ্রেন। 'না, তা করতে বলছি না। বললেও তোমার একার পক্ষে সেটা সম্ভবও নয়। আমার প্রশ্ন, এমন দুর্যোগের মধ্যে কোথায় যেতে পারে ওরা?'

রানাও ভাবছে সেটা। আবহাওয়া ভাল না হলে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই ওদের। তা ছাড়া জাহাজ নিয়ে সাগরে বেরোলে অর্ধেকটা দিনও পালিয়ে থাকতে পারবে না তেজো ডুয়েরো, তাড়া করে ধরে ফেলবে সাগরে টহলরত ডেনিশ নেভি। হঠাৎ করেই মনে হলো রানার, সমস্ত ব্যাপারটা চুকে গেছে। মিচেল আর রয়েরও মুক্তি নেই, ডেভ খুন হয়ে যাওয়ার পরমুহূর্ত থেকেই ওরাও ভালমত ফেঁসেছে। মস্ত বোকামি করে ফেলেছে ওরা। মিচেলের মত লোকের অন্তত এই কাজটা করা উচিত হয়নি। তবে সহকারীদের বোকামিতে অনেক সময় অতি চালাক লোকও ফেঁসে যায়।

'ডেভের ব্যাপারে কী করতে চান?' রুথ জিজ্ঞেস করল রানাকে।

শ্রাগ করল রানা। 'কী করব? আমাদের কী করার আছে? যেভাবে রয়েছে লাশটা, সেভাবেই থাক, নিরেনসেন ফিরে এসে যা করার করবেন। আমরা কিছু না করলেই খুশি হবেন তিনি।

টোকা পড়ল দরজায়। খুলে দিল রানা। ডিটা দাঁড়িয়ে আছে। কেঁদে কেঁদে ফুলিয়ে ফেলেছে মুখ-চোখ। তবে অনেকটা সামলে নিয়েছে নিজেকে।

'মিস্টার রানা, আমার একটা উপকার করবেন?'

'কী?'

'আপনার প্লেনটা আমি ভাড়া করতে চাই। সকালবেলা আমাকে স্যাণ্ডভিগে দিয়ে আসতে পারবেন? এখান থেকে পালাতে চাই আমি—যত তাড়াতাড়ি পারা যায়।'

'কিন্তু কাল বিকেলে ফিরে এসে তোমাকে না দেখলে মোটেও খুশি হবেন না নিরেনসেন,' রানা বলল।

'আমাকে তাঁর দরকার হলে সহজেই গিয়ে স্যাণ্ডভগে দেখা করতে পারবেন তিনি।' রানার একটা হাত আঁকড়ে ধরল ডিটা। 'প্লিজ, মিস্টার রানা!

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে, ডিটা, আমি তোমাকে নিয়ে যাব। কিন্তু সব কিছু নির্ভর করছে আবহাওয়ার ওপর। বসে বসে দোয়া করতে থাকো, এই কুয়াশা যেন তাড়াতাড়ি কেটে যায়।'

'থ্যাংক ইউ, মিস্টার রানা।' সত্যিকারের স্বস্তি দেখা গেল ডিটার চেহারায়। দরজার দিকে এগোল। তারপর দ্বিধা করে ফিরে তাকাল। 'ডেভ যে প্যাকেটটা আমাকে দিয়েছে, তাতে আসলে কী আছে, মিস্টার রানা?'

'অনেকগুলো দামি হীরা-চুনি-পান্না,' রানা বলল। 'লক্ষ-কোটি টাকার জিনিস। ওগুলো হজম করতে পারলে এত ধনী হয়ে যেত ডেভ, যা কল্পনারও অতীত। মাথা গরম তো আর সাধে হয়নি!'

'তার মানে ওগুলোর জন্যেই ও খুন হয়েছে।
মাথা ঝাঁকাল রানা।
'কে করেছে, জানেন?'
'সেটা জানার ভার পুলিশের ওপর ছেড়ে দেয়াই ভাল। আমাদের অনুমান করতে যাওয়ার কোন মানে হয় না। কেন জিজ্ঞেস করছ?'
'না, এমনি,' শান্ত হয়ে এসেছে ডিটা। 'কোন কিছুই আর ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না এখন, তাই না?'
বেরিয়ে গেল ডিটা। সেদিকে তাকিয়ে থেকে ঢোক গিলল রানা। খুব খারাপ লাগছে। মেয়েটার জন্য, ডেভের জন্য। এ ধরনের খারাপ লাগাগুলোকেই মানুষ মদ খেয়ে দূর করতে চায়, জানে ও।
রানা ঘুরে দাঁড়াতেই উঠে দাঁড়াল মায়া। গত আধ ঘণ্টায় কোটরে বসে গেছে চোখ। ফ্যাকাসে মুখ। তিন দিন আগে যে সুন্দরী মহিলাকে দেখেছিল রানা, তার সঙ্গে এই মহিলার যেন কোন মিলই নেই।
'কারও যদি কোনও আপত্তি না থাকে, আমি এখন যাব, ঘুমোতে হবে,' মায়া বলল।
রানার দিকে তাকালেন গ্লেন। তাঁর চোখে সমবেদনা। বললেন, 'ছেড়ে দাও ওকে, রানা। পালাবে আর কোথায়?'
'আমি কাউকে আটকে রাখিনি,' বলল রানা। 'তবে মিচেল ওকে পালাতে দেবে বলে মনে করি না। আমাকে টরচার করে কিছুই বের করতে পারেনি ও, কারণ তখন পর্যন্ত তেমনকিছুই জানতাম না আমি। এখন ওরা জানে, ডেভকে রত্নগুলোর সন্ধান দিয়ে কে বেঈমানি করেছে ওদের সঙ্গে। কীভাবে আত্মরক্ষা করবেন, সেটা ওঁর নিজের ব্যাপার।'
'তা হলে আমি যেতে পারি?'
মুখে কিছু না বলে নীরবে মাথা ঝাঁকাল রানা। বেরিয়ে গেল মায়া। পিছনে আস্তে করে করে লাগিয়ে দিয়ে গেল দরজাটা।
'এখন কী?' রানার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন গ্লেন।
হঠাৎ করেই পেটের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠল রানার। খিদে টের পেল। ঘড়ি দেখল ও। দশটার বেশি বাজে। 'ডিনারের সময় পেরিয়ে যায়নি এখনও। কেউ আমার সঙ্গে আসতে চান?'
'এতক্ষণে একটা কথার মত কথা বললে,' গ্লেন বললেন। 'দাঁড়াও, চট করে কাপড়টা বদলে নিই।' বেডরুমে চলে গেলেন তিনি।
'ভাবছি, আপনার কী হবে?' রুথ বলল রানার দিকে তাকিয়ে।
'কীসের কী হবে?'
'এই যে, প্লেনটা যে ফেলে দিলেন, ধরা যাক কোনও কারণে জেনে গেল পুলিশ, কী করবে?'
'ও। কী আর করবে। ধরে নিয়ে গিয়ে আদালতে হাজির করবে। ডেনিশ আদালত অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ। আমার সমস্যাটা বুঝবে। আর যদি জেলও দেয়, বেশি দিন দেবে না। ডেনিশ জেল দুনিয়ার সবচেয়ে ভাল জেল। মোটেও কষ্ট হবে

না আমার।'

'তাই?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। ও যদি ধরা দিতে না চায় দুনিয়ার কোন পুলিশই যে ওকে আটকে রাখতে পারবে না, এ কথাটা আর বলল না রুথকে।

প্রচুর খেল রানা, পেট ভরে। সেদিন সকালে স্যাণ্ডভিগ থেকে ফিরে আসার পর শুধু একটা স্যাণ্ডউইচ ছাড়া আর পেটে কিছু পড়েনি। খাওয়ার ব্যাপারে গ্রেনও কম গেলেন না। তবে রুথ কিছু খেতে পারল না। শুধু কফির কাপ সামনে নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দুজনের খাওয়া দেখল।

খাওয়ার পর আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক রেস্টুরেণ্টে বসে রইল ওরা। আলোচনা করল। রানা কফি নিল। আর গ্রেন গ্লাসের পর গ্লাস মদ গিলতে লাগলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বললেন, ডিটাকে স্যাণ্ডভিগে পৌঁছে দিয়ে ফেরার সময় জহরতগুলো নিয়ে আসতে পারে রানা। তিনি বলার আগে কথাটা মাথায় ঢোকেনি ওর। ওগুলো পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারলে ওর দোষ কেটে যাবে অনেকটা।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ উপরে উঠে এল ওরা। মায়া কেমন আছে রুথকে দেখে আসতে বলল রানা। ও নিজে গ্রেনের সঙ্গে তাঁর ঘরে ঢুকল।

মিনিট দুয়েক পরেই রুথ ফিরে এসে বলল, 'মায়া ঘুমোচ্ছে। আমিও শুতে যাচ্ছি। সকালে দেখা হবে।'

গ্লাসে মদ ঢালছেন গ্রেন।

রুথকে দরজার কাছে এগিয়ে দিল রানা। ও বেরিয়ে গেলে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে এসে বসল।

রানার কাছে এসে আরেকটা চেয়ারে বসলেন গ্রেন। চুপচাপ চুমুক দিতে থাকলেন গ্লাসে।

কিছুই করার নেই আর দুজনের। তাস খেলার চেষ্টা করল। জমল না। শেষে বিরক্ত হয়ে উঠে নিজের ঘরে চলে গেল রানা। বিছানায় শুয়ে ছাতের দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে কখন ঘুম এসে গেছে, জানে না।

দরজা খোলার শব্দে জেগে গেল। বেডসাইট টেবিলে রাখা ঘড়িটার দিকে চোখ পড়ল প্রথমে। রাত সাড়ে তিনটে। ফিরে তাকাল দরজার দিকে।

গ্রেন ঢুকেছেন। রানার বিছানার পাশে এসে বললেন. 'ও চলে গেছে।

'কে? মায়া নিভেন?'

মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'এইমাত্র দেখে এলাম।'

এত রাতে মায়ার ঘরে কেন গিয়েছিলেন তিনি, সেটা বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। তবে ও নিয়ে কোন কথা বলল না। বিছানা থেকে নামল। 'রুথ ঘরে আছে?'

'আছে। কাপড় পরছে। এখুনি চলে আসবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল রানা। ডিটার ঘরের দরজা খুলল।

'মিস্টার রানা, আপনি?' বিছানায় ফেলে রাখা দুটো সুটকেস দেখিয়ে বলল

ডিটা, 'ঘুম আসছিল না। বিছানায় গড়াগড়ি করে শেষে উঠে সুটকেস গোছালাম।'

'একটা কাজ করতে পারবে?' রানা বলল, 'মিসেস নিভেন ঘরে নেই। হোটেলের নাইট স্টাফদের সঙ্গে কথা বলে দেখো, কোথায় গেছে কিছু জানতে পারো কি না। এমনভাবে জিজ্ঞেস করবে, যাতে ওদের সন্দেহ না হয়। পারবে না?'

মাথা ঝাঁকাল ডিটা। উত্তেজনা ফুটেছে চেহারায়।

ঘর থেকে বেরিয়ে পিছনের সিঁড়ির দিকে এগোল রানা। নেমে এল চত্বরে। দুটো ল্যাণ্ড-রোভার গাড়ি আছে হোটেলের। পিছনের চত্বরের ওপাশে গ্যারেজে রাখা হয়। একটা গাড়ি নেই, নিশ্চয় বাইরে রাখা হয়েছে জরুরি কাজের জন্য। বাকি গাড়িটা গ্যারেজ থেকে বের করে আনল ও। কুয়াশার মধ্য দিয়ে যত জোরে সম্ভব ছুটে চলল।

বন্দরের রাস্তাটা একেবারেই নির্জন। ক্যানিং ফ্যাক্টরির কাছে এনে গাড়ি রাখল ও। জেটি পর্যন্ত বাকি পথটা হেঁটে গেল। অকারণেই সময় নষ্ট করেছে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য এসেছিল। যা সন্দেহ করেছিল, তা-ই। খারাপ আবহাওয়ার পরোয়া করেনি তেজো ডুয়েরো। কুয়াশার মধ্যেই জাহাজ নিয়ে কেটে পড়েছে।

আবার যখন হোটেল-চত্বরে ফিরল রানা, চারটে বাজে। কুয়াশার চাদর ভেদ করে ফুটতে আরম্ভ করেছে ভোরের আলো। পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে এখন বাড়িটার অবয়ব।

গ্লেনের রুমে পৌঁছে দেখল, ওর জন্য অপেক্ষা করছে রুথ আর ডিটা। গ্লেন অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। হাতে মদের গ্লাস।

রানার সাড়া পেয়ে ঘুরে এগিয়ে এলেন। 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'জেটিতে গিয়েছিলাম, তেজোর জাহাজটা আছে কি না দেখার জন্যে। চলে গেছে। মিচেল, রয়, মায়া—সবাইকে নিয়ে গেছে, আমার ধারণা। পাগল হয়ে গেছে। সবখানে আইসবার্গের ছড়াছড়ি।'

'ভুল করেছ তুমি, রানা,' গ্লেন বললেন। 'বসো। ডিটা কী বলে শোনো।

'নাইট ক্লার্কের সঙ্গে কথা বলেছি আমি,' ডিটা বলল। 'এগারোটা নাগাদ একটা ফোন কল পায় মায়া। ক্লার্ক বলেছে, পুরুষের গলা, ইংরেজিতে কথা বলছিল। ফোন নামিয়ে রেখে ক্লার্ককে ফ্রেডেরিকসবর্গ থেকে স্যাণ্ডভিগ যাওয়ার রাস্তার কথা জিজ্ঞেস করে মায়া। ওই এলাকার একটা ম্যাপ জোগাড় করে দিতে অনুরোধ করে। ম্যাপ জোগাড় করে মায়ার ঘরে পাঠিয়ে দেয় ক্লার্ক।'

'আর কিছু?' রানা জানতে চাইল।

'হ্যাঁ। মাঝরাতে তিনজন লোককে চত্বরে ঢুকতে দেখে নাইট পোর্টার। দুজনকে চেনে ও, মিচেল আর রয়। তৃতীয় লোকটাকে চেনে না। হোটেলের একটা ল্যাণ্ড-রোভার ভাড়া করে ওরা। গ্যারেজ থেকে গাড়িটা বের করে নিয়ে মায়ার জন্যে অপেক্ষা করে। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে গাড়িতে চড়ে মায়া। ওকে চুমু খায় মিচেল। তারপর গাড়িটা নিয়ে চলে যায় ওরা।'

'বাপরে, কী দ্রুত দল বদল করতে পারে মহিলা,' রুথ বলল।

'এখনও কী তোমার মনে হচ্ছে, রানা, ওরা তেজোর জাহাজে করে

পালিয়েছে?' গ্লেন জিজ্ঞেস করলেন।

'না। কোথায় গেছে, বোঝা যাচ্ছে,' রানা বলল। 'গাড়ি নিয়ে স্যাণ্ডভিগে পৌছতে ওদের ঘণ্টা ছয়েক লাগবে। মাঝরাত, অর্থাৎ রাত বারোটায় যদি রওনা দিয়ে থাকে, ভোর পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটার আগে কোনমতেই পৌছতে পারবে না।'

'স্যাণ্ডভিগে টেলিফোন আছে?' রুথ জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়ল ভিটা। ট্রেডিং পোস্টে একটা রেডিও আছে। কিন্তু মালিক ওখানে ঘুমায় না। পাহাড়ের ওপর ওর একটা খামারবাড়ি আছে। সকাল আটটার আগে দোকান খোলে না। মেসেজ থাকলে তখন পাঠানো যাবে।'

'অনেক দেরি হয়ে যাবে তখন,' গ্লেন বললেন।

অবাক হয়ে রুথ বলল, 'পালানোর জন্যে একটা আজব রাস্তা বেছে নিয়েছে ওরা। কেমন অর্থহীন মনে হচ্ছে না? স্যাণ্ডভিগে নাহয় পৌছল ওখান থেকে বেরোবে কী করে?'

ঠিক এই কথাটাই রানাও ভাবছে। জবাব দিল, 'একটাই উপায় আছে। তেজোর সঙ্গে নিশ্চয় প্ল্যান করে রেখেছে। স্কুনারটা নিয়ে ওখানে চলে যাবে তেজো।'

'কিন্তু সময়মত যদি পৌছতে না পারে ও?' প্রশ্ন তুললেন গ্লেন। 'তুমি বললে, এই কুয়াশার মধ্যে বরফের চাঙড় ভর্তি সাগরে জাহাজ চালানো পাগলামি।'

'এখন যা পরিস্থিতি, আর কিছু করারও নেই ওদের। আরেকটা রাস্তা আছে অবশ্য। নারসারসুয়াক এয়ারপোর্টে যদি যায়। স্যাণ্ডভিগ থেকে মোটরবোটে দুই ঘণ্টার পথ। বহু জেলে আছে, টাকা পেলে খুশি হয়েই ওদেরকে পৌছে দেবে। ওখান থেকে আইসল্যাণ্ড হয়ে ইয়োরোপে যেতে পারবে ওরা। ইচ্ছে করলে ক্যানাডা কিংবা আমেরিকায়ও যেতে পারবে।'

'তারমানে, ওদেরকে ঠেকানো যাচ্ছে না।

মাথা নাড়ল রানা। 'না, তা নয়। প্লেনে করে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে স্যাণ্ডভিগে চলে যেতে পারি আমি। আমার একটা অটার প্লেন আছে, ভুলে যাচ্ছেন কেন?'

'এই কুয়াশার মধ্যে?' আচমকা হেসে উঠলেন গ্লেন। 'বোকা পেয়েছ আমাকে? বিশ গজ দূরেও দেখতে পাবে না, প্লেন চালাবে কী করে? পানি থেকে উড়তেই পারবে না।'

'ওড়া কঠিন না। বরং ওখানে গিয়ে ল্যাণ্ড করা কঠিন। আপনি লক্ষ করেছেন কি না জানি না, স্যাণ্ডভিগ ফিয়র্ডের একদিকের একটা পাথুরে দেয়াল হাজার ফুট উঁচু।'

মাথা নাড়লেন গ্লেন। 'রানা, শোনো, আমাকে শিখিয়ো না। আমার একটা লাইসেন্স আছে, আমিও উড়তে জানি। বহু ছবিতে আমি নিজে প্লেন চালিয়েছি, আমি জানি। এই কুয়াশার মধ্যে তুমি ওখানে যেতে পারবে না, রানা।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন ' রানা বলল। 'কিন্তু চেষ্টা না করে তো আমি হাল ছাড়ব না।'

রানার দিকে তাকিয়ে আছে রুথ।

কাউকে আর কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল রানা।

নিজের ঘরে এসে ফ্লাইং বুট পরে নিল ও। অন্যান্য পোশাকও পরল। এতবড় ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে, মনে মনে যে একটা আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে না, তা নয়, তবে সেটাকে বাড়তে দিল না। ঘর থেকে বেরিয়ে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল আরেকবার। চত্বর ধরে গ্যারেজের দিকে এগোল।

ল্যাণ্ড-রোভারের পিছনে নিজের ব্যাগটা রাখতে গিয়ে দেখল, ডিটার সুটকেস দুটো ইতিমধ্যেই রাখা হয়ে গেছে ওখানে। বাক্সে ভরা গ্লেনের উইনচেস্টার হান্টিং রাইফেলটাও আছে। ফিরে তাকাল রানা। ছায়া থেকে বেরিয়ে এল তিনটে ছায়ামূর্তি।

'পচা সকাল,' হাসি হাসি কণ্ঠে বললেন গ্লেন।

'আপনি আসলে কী করতে চাইছেন, বলুন তো?' রানা জিজ্ঞেস করল।

ব্যাপারটা যেন ভেবে দেখার ভান করলেন গ্লেন। 'বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে গেছি। শরীরটাকে একটু নাড়াচাড়া করা দরকার।'

'পাগলামি করছেন... 'বলতে গেল রানা।

'শুরুটা তো আপনিই করলেন,' শান্তকণ্ঠে কথাটা বলে রানার পাশ কাটিয়ে গিয়ে ল্যাণ্ড-রোভারে উঠল রুথ।

জেটি থেকে একটা আউটবোর্ড মোটর লাগানো ডিঙি নিয়ে ঘুরে দেখতে বেরোল রানা। স্লিপওয়ের শেষ মাথা, যেখান দিয়ে প্লেন পানিতে নামে সেখান থেকে শুরু করে ফিয়র্ডের ভিতরে অনেকখানি এগিয়ে বরফের অবস্থা দেখল।

ফিরে এসে দেখে প্লেনের ইঞ্জিন চালিয়ে গরম করে ফেলেছেন গ্লেন।

পাইলটের সিটে বসে মেয়েদের দিকে তাকাল রানা। 'চোখ বন্ধ করে থাকুন। ওড়াটা দেখতে ভাল লাগবে না।'

এ রকম ভয়ঙ্কর কাজ রানাও কমই করেছে। কুয়াশার মধ্যে না দেখে কোনভাবে গিয়ে যদি ফিয়র্ডের ধূসর দেয়ালে একটা ধাক্কা মারতে পারে—কী হবে, সেটা আর ভাবতে চাইল না ও। থ্রটল পুরো বাড়িয়ে দিয়ে সময় হওয়ার আগেই শূন্যে উঠে পড়ল।

বিশ সেকেণ্ড পর পানি কামড়ে থাকা কুয়াশার ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল প্লেন। মোড় নিল দক্ষিণে।

নীচের সাগরকে লাগছে কুয়াশায় ঢাকা উপত্যকার মত। পুবে উপকূল ঘেঁষে যাওয়া পাহাড়শ্রেণী মাথা তুলে রেখেছে যেন রাজকীয় ভঙ্গিতে।

'সাংঘাতিক, তাই না?' গ্লেন বললেন। মুখে হাসি। চোখে আলোর ছটা। অদ্ভুত এক উত্তেজনায় ভুগছেন যেন তিনি।

'এখানে কেমন লাগছে, সেটা বড় কথা নয়,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল রানা। 'স্যাণ্ডভিগের অবস্থা ভাল হলেই হয়।'

'দুশ্চিন্তা হচ্ছে?'

'সত্যি কথা বলতে কী, ভয় লাগছে। ওখানেও যদি এখানকার মত হয়, নামব কীভাবে? পরমেশ্বরকে ডাকতে থাকুন!'

শুনে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ডিটার মুখ। সিটের হাতল আঁকড়ে ধরল। ওকে একটা সিগারেট দিতে চাইল রুথ। হাসিমুখে বলল, 'মিস্টার রানা আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন । চিন্তা কোরো না। প্লেনটা উনি ঠিকই নামিয়ে ফেলবেন।'

'যাক, আমার ওপর এতটা আস্থা আছে জেনে খুশি হলাম,' সামনের দিকে তাকিয়ে বলল রানা। ভবিষ্যতের কথা ভেবে মোটেও খুশি হতে পারছে না ও। সবাই নিশ্চিন্তে নির্ভর করে আছে ওর উপর। অথচ ও নিজেই জানে না, কতটা কী করতে পারবে।

পরের আধ ঘণ্টা একটি কথাও না বলে চুপচাপ রইল রানা। মাঝে মাঝে কন্ট্রোল নাড়াচাড়া করছে, যদিও সেটার খুব একটা প্রয়োজন হচ্ছে না। ও আসলে গোটা বিষয়টা নিয়ে ভাবছে।

মিচেল ভেবেছিল, এখানে এসে সব কিছু সহজেই সেরে ফেলবে। সেরে ফেলতে পারতও। কিন্তু ওর সমস্ত পরিকল্পনা গড়বড় করে দিয়েছে দুজন লোক—রানা ও মায়া নিভেন। মায়া যে এভাবে বেঈমানি করে বসবে, নিশ্চয়ই কল্পনা করেনি মিচেল।

ডেভের কথা ভাবল রানা। কাউচের উপর বীভৎস ভঙ্গিতে পড়ে থাকা ওর রক্তাক্ত লাশটা ভেসে উঠল মনের পর্দায়, সারা দেয়ালে রক্ত ছিটানো। বেচারা! ও ঠিকই বলেছিল, যা করার আজই করে নাও, কালকের ভরসায় থেকো না। কাল কী হবে কেউ জানে না।

বাহুতে হাতের স্পর্শ পেয়ে চমকে ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এল রানা। ইশারায় নীচে দেখালেন গ্লেন। রানা দেখল, হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেছে কুয়াশা। সামনে বৃষ্টি হচ্ছে। আশ্চর্য, তার ওপাশে সাগর পরিষ্কার।

ভারী বর্ষণের মধ্যে ঢুকে পড়ল প্লেন। বৃষ্টির কারণে দৃষ্টিশক্তি বাধা পেলেও কুয়াশার মত অত খারাপ নয়। ফিয়র্ড চোখে পড়ছে অস্পষ্টভাবে। ডট জুনোর খামারবাড়িটাও দেখা যাচ্ছে। এখনও হালকা ফিতের মত কুয়াশা উড়ছে পাহাড়ের উপর বাড়িটাকে ঘিরে। তবে ল্যাণ্ড করা কঠিন হবে না।

চওড়া চক্কর দিয়ে ঘুরে এল একবার রানা। ফিয়র্ডের উঁচু দেয়ালটাকে একপাশে দুশো গজ দূরে রেখে সমান্তরালভাবে উড়ে চলল। ক্রমেই নীচে নামাচ্ছে প্লেন। ঝাঁপ দিল এক সময়।

সতেরো

ফিয়র্ডের পানিতে ধীরে ধীরে ভেসে এসে থেমে গেল প্লেন।

'যাক, নামলাম অবশেষে,' ফোঁস করে চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ছেড়ে দিল

রানা।
গ্লেনের মুখ দেখে মনে হলো হতাশ হয়েছেন, ল্যাণ্ড করতে না পারলেই যে খুব খুশি হতেন তিনি। হাসলেন। জোর করে হাসছেন মনে হলো। 'নামালেই ত হলে, রানা।'
আবার রঙ ফিরেছে ডিটার মুখে।
রুথ বলল, 'আমি তো বলেইছিলাম, নামাবেন।'
কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা। হঠাৎ ওর বাহুতে হাত রাখলেন গ্লেন। 'আস্তে কী যেন শুনলাম মনে হলো।'
জানালা খুলে দিল রানা। বৃষ্টির ছাট আসছে ভিতরে। চুপচাপ কান পেতে বসে রইল সবাই। মাঝেসাঝে ফ্লোটের গায়ে বাড়ি দেয়া আলতো ঢেউয়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা গেল না।
রুথকে উইনচেস্টারটা দিতে বললেন গ্লেন।
রাইফেলের বাক্সটা নিয়ে ফিতে খুলতে শুরু করলেন তিনি।
জানালা দিয়ে কাত হয়ে তাকাল রানা।
এবার সে-ও শুনতে পেল। একটা মোটরবোটের ইঞ্জিনের শব্দ। কাছেই কোথায় রয়েছে। ডেনিশ ভাষায় কথা বলল কেউ। বৃষ্টির ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এল একটা ছোট ডিঙি। সামনের গলুইয়ে বসা ট্রেডিং পোস্টের মালিক ইমারসন ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে ভেসে এগোল ও। ফ্লোটের গায়ে এনে ডিঙি থামাল।
ওর দিকে তাকিয়ে হাসল রানা।
ইমারসনের দাড়িতে পানির কণা লেগে আছে। ডেনিশ ভাষায় বলল, 'মর্নিং রানা। আপনার ভাগ্য ভাল। আধ ঘণ্টা আগেও ঘন কুয়াশায় ছেয়ে ছিল ফিয়র্ড হঠাৎ করে বৃষ্টি এসে ধুয়ে নিয়ে গেছে।'
'ফ্রেডেরিকসবর্গ থেকে আমরা রওনা দেয়ার সময় ওখানেও অবস্থা খুব খারাপ ছিল,' রানা বলল।
সামনে ঝুঁকল ডিটা। 'গুড মর্নিং, মিস্টার ইমারসন। আমার দাদু কেমন আছে?'
'ভাল, মিস জুনো। পরশু দিনও তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে।'
ডিটাকে দেখে অবাক হয়েছে ইমারসন। কিন্তু ওকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই তাড়াতাড়ি রানা বলল, 'তারপর আর দেখেননি? কাল বিকেলে তাঁর নামে ডাকে কোন পার্সেল আসেনি?'
'তা তো জানি না,' ইমারসন বলল। 'কুয়াশার কারণে বোট আসতে দেরি হয়েছে, রাত করে ফেলেছে, আমিও স্টোর বন্ধ করে দিয়েছিলাম, তাই ডাকে কী এসেছে আর দেখা হয়নি। যা এসেছে, মেইলব্যাগেই রয়ে গেছে এখনও।'
'ও,' মনে মনে খুশি হলো রানা। 'ওটা খুললে ডিটার দাদুর নামে একটা পার্সেল পাবেন। ওটা নিয়ে আর ফার্মে যেতে হবে না আপনাকে। চলুন, আপনার কষ্টটা বাঁচিয়ে দেয়া যাক।'
'কিন্তু আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না,' অবাক হলো ইমারসন।
'বোঝার দরকারও নেই। শুধু বোটটা ঘুরিয়ে নিয়ে চলতে থাকুন, আমরা

পিছন পিছন আসছি।'

শ্রাগ করল ইমারসন। ডিঙির পিছন দিকে চলে গেল ইমারসন। ইঞ্জিন স্টার্ট দিচ্ছে। রানা এদিকে গ্লেন আর রুথকে ইংরেজিতে জানাল, ইমারসন কী বলেছে।

'ওই প্যাকেটটা নিয়ে তারপর কী করবে?' গ্লেন জিজ্ঞেস করলেন রানাকে।

'ইমারসনের পুরনো জীপটা নিয়ে ডট জুনোর বাড়িতে চলে যাব। সাবধান করতে ওঁকে। মিচেল আর তার বন্ধুদের জন্যে একটা রিসিপশন পার্টি তৈরি করে রাখতে হবে। ছয়-সাতজন এস্কিমো মেষপালক আছে ডটের। ডেকে আনাতে হবে ওদের। "বুড়ো দাদু"র ওপর হামলা হতে দেখলে কাউকেই ছেড়ে কথা বলবে না, শত্রু যত ভয়ঙ্করই হোক।'

মাথা নাড়ল ডিটা। 'কিন্তু দাদুকে এখন পাওয়া যাবে বলে তো মনে হয় না। আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন, মিস্টার রানা, মৌসুমের এ সময়টায় কাজের লোকদের নিয়ে পাহাড়ে চলে যায় দাদু, ভেড়াগুলোকে খুঁজে বের ক'রে উপত্যকায় নিয়ে আসার জন্যে। শীত এসে গেলে সেটা আর পারা যায় না।' রুথের দিকে তাকাল ও। 'আর চার সপ্তা, বড়জোর পাঁচ সপ্তা পরেই শীত নামবে। এমন হঠাৎ করে শুরু হয়ে যায়, টেরই পাওয়া যায় না।'

'পাহাড় থেকে ডেকে আনতে হবে ওঁকে,' রানা বলল। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল ও।

রাইফেলের বাঁটে হাত বোলাচ্ছেন গ্লেন। 'আসুক। ব্যাটাদের এমন শিক্ষা দেব, সারা জীবন মনে রাখবে—অবশ্য মনে রাখার জন্যে যদি বেঁচে থাকে। গোলাঘরের পাটাতনের উপরে যে ঘরটা আছে, ওটার দরজার কাছে রাইফেল নিয়ে বসে থাকব। ওখান থেকে চমৎকার নিশানা হয়ে যাবে জীপটা।'

গ্লেনের ঠোঁটের কোণে ঝোলানো সিগারেট, দুই হাঁটুর উপর কোলের কাছে রাখা উইনচেস্টার হান্টিং রাইফেল, কপালে এসে পড়া লম্বা অগোছালো চুল, চোখে বেপরোয়া দৃষ্টি, সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে, যেন অ্যাকশন ছবিতে ক্যামেরার সামনে অভিনয় করছেন।

রানা বলল, 'বোকামি করবেন না, গ্লেন। এটা বাস্তব। এখানে কেউ গুলি খেয়ে মারা গেলে "কাট" বললে আর উঠে দাঁড়াবে না।'

জ্বলে উঠল গ্লেনের চোখের তারা। রাইফেলের বাঁটে চেপে বসল আঙুল। রাগত স্বরে বললেন, 'আমাকে শিখিয়ো না, রানা। তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট। আমি জানি, এটা অভিনয় নয়। সারা জীবন শুধুই অভিনয় করিনি, বহুবার বাস্তবের মুখোমুখিও হয়েছি আমি। মরতে মরতে বেঁচেছি। গুলি খেয়েছি। হাসপাতালে থাকতে হয়েছে বহুদিন।'

জবাব দিল না রানা। গ্লেনের এই বেপরোয়া ভাবভঙ্গি ভাল লাগছে না ওর। চোখের কোণ দিয়ে রুথের দিকে তাকাল। রুথ তাকিয়ে আছে গ্লেনের দিকে। ওর চোখেও শঙ্কার ছায়া। গ্লেনকে নিয়ে সে-ও দুশ্চিন্তা করছে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে আস্তে করে থ্রটল ধরে টান দিল রানা। ট্যাক্সিইং করে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ডিঙিটার পিছন পিছন।

রানা।

গ্লেনের মুখ দেখে মনে হলো হতাশ হয়েছেন, ল্যাণ্ড করতে না পারলেই যেন খুব খুশি হতেন তিনি। হাসলেন। জোর করে হাসছেন মনে হলো। 'নামালেই তা হলে, রানা।'

আবার রঙ ফিরেছে ডিটার মুখে।

রুথ বলল, 'আমি তো বলেইছিলাম, নামাবেন।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা। হঠাৎ ওর বাহুতে হাত রাখলেন গ্লেন। 'আস্তে। কী যেন শুনলাম মনে হলো।'

জানালা খুলে দিল রানা। বৃষ্টির ছাট আসছে ভিতরে। চুপচাপ কান পেতে বসে রইল সবাই। মাঝেসাঝে ফ্লোটের গায়ে বাড়ি দেয়া আলতো ঢেউয়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা গেল না।

রুথকে উইনচেস্টারটা দিতে বললেন গ্লেন।

রাইফেলের বাক্সটা নিয়ে ফিতে খুলতে শুরু করলেন তিনি।

জানালা দিয়ে কাত হয়ে তাকাল রানা।

এবার সে-ও শুনতে পেল। একটা মোটরবোটের ইঞ্জিনের শব্দ। কাছেই কোথায় রয়েছে। ডেনিশ ভাষায় কথা বলল কেউ। বৃষ্টির ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এল একটা ছোট ডিঙি। সামনের গলুইয়ে বসা ট্রেডিং পোস্টের মালিক ইমারসন। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে ভেসে এগোল ও। ফ্লোটের গায়ে এনে ডিঙি থামাল।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল রানা।

ইমারসনের দাড়িতে পানির কণা লেগে আছে। ডেনিশ ভাষায় বলল, 'মর্নিং, রানা। আপনার ভাগ্য ভাল। আধ ঘণ্টা আগেও ঘন কুয়াশায় ছেয়ে ছিল ফিয়র্ড। হঠাৎ করে বৃষ্টি এসে ধুয়ে নিয়ে গেছে।'

'ফ্রেডেরিকসবর্গ থেকে আমরা রওনা দেয়ার সময় ওখানেও অবস্থা খুব খারাপ ছিল,' রানা বলল।

সামনে ঝুঁকল ডিটা। 'গুড মর্নিং, মিস্টার ইমারসন। আমার দাদু কেমন আছে?'

'ভাল, মিস জুনো। পরশু দিনও তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে।'

ডিটাকে দেখে অবাক হয়েছে ইমারসন। কিন্তু ওকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই তাড়াতাড়ি রানা বলল, 'তারপর আর দেখেননি? কাল বিকেলে তাঁর নামে ডাকে কোন পার্সেল আসেনি?'

'তা তো জানি না,' ইমারসন বলল। 'কুয়াশার কারণে বোট আসতে দেরি হয়েছে, রাত করে ফেলেছে, আমিও স্টোর বন্ধ করে দিয়েছিলাম, তাই ডাকে কী এসেছে আর দেখা হয়নি। যা এসেছে, মেইলব্যাগেই রয়ে গেছে এখনও।'

'ও,' মনে মনে খুশি হলো রানা। 'ওটা খুললে ডিটার দাদুর নামে একটা পার্সেল পাবেন। ওটা নিয়ে আর ফার্মে যেতে হবে না আপনাকে। চলুন, আপনার কষ্টটা বাঁচিয়ে দেয়া যাক।'

'কিন্তু আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না,' অবাক হলো ইমারসন।

'বোঝার দরকারও নেই। শুধু বোটটা ঘুরিয়ে নিয়ে চলতে থাকুন, আমরা

পিছন পিছন আসছি।'

শ্রাগ করল ইমারসন। ডিঙির পিছন দিকে চলে গেল ইমারসন। ইঞ্জিন স্টার্ট দিচ্ছে। রানা এদিকে গ্লেন আর রুথকে ইংরেজিতে জানাল, ইমারসন কী বলেছে।

'ওই প্যাকেটটা নিয়ে তারপর কী করবে?' গ্লেন জিজ্ঞেস করলেন রানাকে।

'ইমারসনের পুরনো জীপটা নিয়ে ডট জুনোর বাড়িতে চলে যাব। সাবধান করতে ওঁকে। মিচেল আর তার বন্ধুদের জন্যে একটা রিসিপশন পার্টি তৈরি করে রাখতে হবে। ছয়-সাতজন এস্কিমো মেষপালক আছে ডটের। ডেকে আনাতে হবে ওদের। "বুড়ো দাদু"র ওপর হামলা হতে দেখলে কাউকেই ছেড়ে কথা বলবে না, শত্রু যত ভয়ঙ্করই হোক।'

মাথা নাড়ল ডিটা। 'কিন্তু দাদুকে এখন পাওয়া যাবে বলে তো মনে হয় না। আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন, মিস্টার রানা, মৌসুমের এ সময়টায় কাজের লোকদের নিয়ে পাহাড়ে চলে যায় দাদু, ভেড়াগুলোকে খুঁজে বের ক'রে উপত্যকায় নিয়ে আসার জন্যে। শীত এসে গেলে সেটা আর পারা যায় না।' রুথের দিকে তাকাল ও। 'আর চার সপ্তা, বড়জোর পাঁচ সপ্তা পরেই শীত নামবে। এমন হঠাৎ করে শুরু হয়ে যায়, টেরই পাওয়া যায় না।'

'পাহাড় থেকে ডেকে আনতে হবে ওঁকে,' রানা বলল। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল ও।

রাইফেলের বাঁটে হাত বোলাচ্ছেন গ্লেন। 'আসুক। ব্যাটাদের এমন শিক্ষা দেব, সারা জীবন মনে রাখবে—অবশ্য মনে রাখার জন্যে যদি বেঁচে থাকে। গোলাঘরের পাটাতনের উপরে যে ঘরটা আছে, ওটার দরজার কাছে রাইফেল নিয়ে বসে থাকব। ওখান থেকে চমৎকার নিশানা হয়ে যাবে জীপটা।'

গ্লেনের ঠোঁটের কোণে ঝোলানো সিগারেট, দুই হাঁটুর উপর কোলের কাছে রাখা উইনচেস্টার হান্টিং রাইফেল, কপালে এসে পড়া লম্বা অগোছালো চুল, চোখে বেপরোয়া দৃষ্টি, সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে, যেন অ্যাকশন ছবিতে ক্যামেরার সামনে অভিনয় করছেন।

রানা বলল, 'বোকামি করবেন না, গ্লেন। এটা বাস্তব। এখানে কেউ গুলি খেয়ে মারা গেলে "কাট" বললে আর উঠে দাঁড়াবে না।'

জ্বলে উঠল গ্লেনের চোখের তারা। রাইফেলের বাঁটে চেপে বসল আঙুল। রাগত স্বরে বললেন, 'আমাকে শিখিয়ো না, রানা। তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট। আমি জানি, এটা অভিনয় নয়। সারা জীবন শুধুই অভিনয় করিনি, বহুবার বাস্তবের মুখোমুখিও হয়েছি আমি। মরতে মরতে বেঁচেছি। গুলি খেয়েছি। হাসপাতালে থাকতে হয়েছে বহুদিন।'

জবাব দিল না রানা। গ্লেনের এই বেপরোয়া ভাবভঙ্গি ভাল লাগছে না ওর। চোখের কোণ দিয়ে রুথের দিকে তাকাল। রুথ তাকিয়ে আছে গ্লেনের দিকে। ওর চোখেও শঙ্কার ছায়া। গ্লেনকে নিয়ে সে-ও দুশ্চিন্তা করছে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে আস্তে করে থ্রটল ধরে টান দিল রানা। ট্যাক্সিইং করে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ডিঙিটার পিছন পিছন।

মেইলব্যাগে ডিটার প্যাকেটটা পাওয়া গেল। টান দিয়ে প্যাকেটের উপরের কাগজ ছিঁড়ে ফেলল ও। ভিতরে পেস্টবোর্ডের তৈরি একটা জুতোর বাক্স। ডালা লাগিয়ে সাবধানে স্কচ টেপ দিয়ে আটকানো হয়েছে, নাড়াচাড়ায় যাতে বাক্স খুলে ভিতরের জিনিস পড়ে না যায়।

'ঠিক এভাবেই আমার হাতে দিয়েছে এটা ডেভ,' ডিটা বলল।

একটা ভাঁজ করা চাকু বের করে দ্রুত ঢাকনার চারপাশ কেটে ফেলল রানা। ভিতরে ধূসর রঙের ক্যানভাসের তৈরি একটা মানি বেল্ট, প্রতিটি থলে ফুলে রয়েছে। একটা থলে খুলে হাতের তালু মেলে উপুড় করল ও। ঝরে পড়ল বড় আকারের কয়েকটা লাল চুনি।

'এগুলোতে ফিনিশিং টাচ দেয়া হয়নি এখনও,' গ্লেন বললেন। 'দিলে আসল রূপ বেরোবে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। চুনিগুলো আবার থলেতে পুরল ও। নিজের কোমরে বাঁধল বেল্টটা। ইমারসনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার জীপটা ধার নিতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।' লোকটা বুঝে গেছে, অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে। 'আমাকে কিছু করতে হবে?'

'আপাতত না।'

রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠলেন গ্লেন, 'অকারণে সময় নষ্ট করছি আমরা, রানা। চলো, যাই।'

স্টোর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। রুথকে নিয়ে বেরোনোর সময় দরজার কাছে থামল রানা, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা কী? উনি এমন করছেন কেন?'

উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে রুথকে। 'কী জানি, বুঝতে পারছি না। মাঝে মাঝে এ রকম হয়ে যায়, অস্থির, উত্তেজিত। হঠাৎ করেই রেগে যায়। আমার মনে হয় মদের জন্যে এমন করছে, অনেকক্ষণ মদ খায় না তো।'

'বহুত খেয়েছেন গত কয়েক দিনে,' কিছুটা বিরক্ত কণ্ঠেই বলল রানা। 'মদের ওপরই তো ছিলেন। আর কত?'

বাইরে এসে ওরা দেখল, জীপের ড্রাইভিং হুইলে বসে আছেন গ্লেন। রাইফেলটা পাশে রাখা। জ্বলন্ত চোখে রানার দিকে তাকালেন। 'কোন আপত্তি আছে?'

'না, চালাতে ইচ্ছে করছে, চালান, আপত্তি কীসের।'

পিছনের সিটে উঠে বসল রানা। কোথায় বসবে দ্বিধা করছে রুথ। সমস্যার সমাধান করে দিল ডিটা। প্যাসেঞ্জার সিটে গ্লেনের পাশে উঠে বসল ও।

'তুমি এমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন?' রুথের দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠলেন গ্লেন। 'যাবে না আমাদের সঙ্গে?'

জবাব না দিয়ে চুপচাপ পিছনের সিটে উঠে বসল রুথ। দুই হাত কোলের উপর রেখে সোজা সামনে তাকিয়ে রইল।

চলতে শুরু করল গাড়ি।

বৃষ্টি কিছুটা কমে এসেছে, যদিও খুব বেশি না, তবে পঞ্চাশ গজ পর্যন্ত দৃষ্টি চলছে এখন। আঁকাবাঁকা কাঁচা রাস্তা ধরে পাহাড়ের উপর উঠে যাচ্ছে গাড়ি। ওদের বাঁ পাশে পাহাড়টা নেমে গেছে ফিয়র্ডে। ওলডার ঝোপ জন্মে রয়েছে ঢালের গায়ে সর্বত্র, সেইসঙ্গে রয়েছে উইলোর জটলা আর দশ ফুট উঁচু বার্চ গাছ। ডানে টকটকে লাল আইসল্যাণ্ড-পপি ফুটে আছে শ্যাওলায় ছাওয়া পাথরের ফাঁকে ফাঁকে। অ্যালপাইন, স্যাক্সিফ্রেজ, এমনকী বাটারকাপও যেন পাল্লা দিচ্ছে ঢালের সৌন্দর্য বাড়ানোর কাজে, যেন বৃষ্টিস্নাত এই সকালটাকে স্বাগত জানাচ্ছে।

অতিরিক্ত দ্রুত গাড়ি চালাচ্ছেন গ্লেন। বৃষ্টিভেজা, উঁচুনিচু এই পাহাড়ি রাস্তায় ভীষণ বিপজ্জনক। কিন্তু কিছু বলতে গেলে চটে উঠতে পারেন, তাই চুপ করে রইল রানা।

অর্ধেক পথ যাওয়ার পর পাহাড়ের মোড় ঘুরে ভয়ঙ্কর গতিতে ছুটে আসতে দেখা গেল হোটেলের ল্যাণ্ড-রোভারটাকে।

একটা মুহূর্তের জন্য সময় যেন স্থির হয়ে রইল। পুরো দৃশ্যটাই স্টিল ছবির মত অনড় হয়ে গেল। তারপর সামান্যতম গতি না কমিয়ে আচমকা সাঁই করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে পুরানো জীপটাকে রাস্তার বাঁ পাশে সরিয়ে আনলেন গ্লেন। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল ল্যাণ্ড-রোভার, কয়েক গজ পিছলে গিয়ে থেমে গেল। ওটার মাত্র ফুটখানেক দূর দিয়ে পাশ কাটানোর সময় পিছনের একটা চাকা রাস্তা থেকে সরে গেল। বনবন করে ঘুরতে থাকল শূন্যে। বিপজ্জনক ভঙ্গিতে কাত হয়ে গেল পুরানো জীপটা।

ভারসাম্য হারিয়ে জীপটা ঢালে নেমে যাওয়ার আগেই ঝাঁপ দিল রানা। শক্ত মাটিতে পড়ল কাঁধ, মাথাটা সরিয়ে রেখেছে যাতে বাড়ি না খায়। ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে শরীরটা। থাবা দিয়ে একটা ঝোপ ধরে ফেলল ও।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল আবার। ক্রুদ্ধ সিংহের মত গর্জন করছে যেন জীপের পুরানো ইঞ্জিন। আলগা মাটির ফুলঝুরি ছিটিয়ে আবার মাটিতে কামড় বসাল জীপের চাকা। কয়েক গজ এগিয়ে ব্রেক কষলেন গ্লেন। পিছনে পিছাতে শুরু করেছে ল্যাণ্ড-রোভারটা। জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে রয়ের মাথা ও একটা হাত, হাতে একটা অটোম্যাটিক পিস্তল। নির্দ্বিধায় গুলি আরম্ভ করল ও।

গ্লেনের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'জলদি চলে যান! মেয়েদের বাঁচান! সোজা ফার্মে!'

তর্ক না করার মত যথেষ্ট বুদ্ধি এখনও আছে গ্লেনের ঘটে। জীপটাকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন মোড়ের ওপাশে, বৃষ্টির মধ্যে। চিৎকার করে কিছু বলল রয়। কী বলল, বুঝতে পারল না রানা। তারপর লাফিয়ে নামল রয়, ওর মাথার তিরিশ-চল্লিশ ফুট উপরে রয়েছে। ওর জুতোয় লেগে ঝুরঝুর করে কতগুলো আলগা পাথর এসে পড়ল রানার মাথায়। পিস্তল নিয়ে ঝুঁকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল রয়কে। ল্যাণ্ড-রোভারটা ছুটে যাচ্ছে জীপের পিছনে। গুলি করল রয়। ডাইভ দিয়ে ওলডার-ঝাড়ের ভিতর পড়ল রানা। দু'বার গুলি করেও লাগাতে পারল না রয়।

লাফিয়ে উঠে মাথা নিচু করে ছুটে এসে বার্চের জটলার মধ্যে ঢুকে পড়ল রানা। থামল না। হোঁচট খেতে খেতে ছুটল বৃষ্টির মধ্যে, রয়ের দিকে পিছন করে। হাতে, মুখে ছড়াৎ ছড়াৎ বাড়ি খাচ্ছে ওলডারের ডাল। একটা শৈলশিরার মত জায়গায় রয়েছে। ডান পাশটা খাড়া নেমে গেছে ফিয়র্ডে।

শৈলশিরার সামনে কিছুটা দূরে এক জায়গায় ঘোড়ার খুরের মত দেখতে কয়েক ফুট উঁচু একটা প্রাকৃতিক বেদি তৈরি করেছে কালো পাথর। ছুটে এসে ওটার আড়ালে লুকাল ও। পাথরের গায়ে গাল ঠেকিয়ে দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। গুলি থেকে কিছুটা হলেও আড়াল খুঁজে পেল এখানে।

প্রায় দম আটকে রেখেছে রানা। কান পেতে রেখেছে সামান্যতম শব্দও যাতে না এড়ায়।

কিন্তু রয়ের আসার কোন শব্দই কানে এল না। শুধু ভেজা পাতায় বৃষ্টি পড়ার একটানা পিটির-পিটির, আর পর্বতের উপর থেকে নেমে আসা বাতাসের সোঁ-সোঁ শব্দ।

মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করে আবার উঠে এগোতে শুরু করল ও। অনুমান করল, ফার্ম হাউসটার ঠিক নীচেই রয়েছে এখন। পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আছে গ্র্যানেটের একটা মস্ত টিলা, সেটা দেখেই বুঝতে পারল কোথায় রয়েছে। ওটার পাশ দিয়ে উঠে চলল, যতটা দ্রুত সম্ভব।

এত উপরেও কিছুটা কুয়াশা যেন পাহাড় কামড়ে পড়ে রয়েছে, তবে পাতলা হয়ে এসেছে অনেক। ওকে ঘিরে পাক খাচ্ছে কুয়াশার ভূতুড়ে ফিতেগুলো। বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটাচ্ছে যেন হৃৎপিণ্ডটা। একটা পাথরের তাকে নিজেকে টেনে তুলল ও। ওটা পেরিয়ে উঠে এল টিলার মাথায়। উইলো গাছের একটা জটলা আছে ওখানে। টিলার ওপাশে মাথা তুলে থাকা পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে, ডট জুনোর খামারের পিছন দিকে একটা চারণভূমি।

লম্বা করে দম নিল রানা। তারপর বা বাড়াল। ঠিক এই সময় টিলার গায়ের একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে মাথা তুলল রয়, সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর খুব স্বাভাবিক সহজ কণ্ঠে বলল, 'এই যে, মিস্টার রানা!'

ঘুরতে শুরু করেছে রানা। গুলি করল রয়। রানার ডান কব্জির হাড় ভেঙে দিল বুলেট। খাঁটি পেশাদার লোকটা। ও জানে, গুলি খাওয়া মুমূর্ষু মানুষ মৃত্যুর আগে পাল্টা গুলি চালাতে পারে, কিন্তু কব্জি ভেঙে যাওয়া মানুষ পারে না।

প্রথমে কোন ব্যথাই টের পেল না রানা। শুধু প্রচণ্ড একটা ধাক্কা। তারপর শুরু হলো প্রচণ্ড দম-আটকানো যন্ত্রণা।

পড়ে গেল রানা। মুখ থুবড়ে পড়ে থেকে দম নেয়ার চেষ্টা করছে।

যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল রয়। হাসিটা স্থির হয়ে আছে মুখে। 'অনেকক্ষণ থেকেই দেখতে পাচ্ছি আমি তোমাকে। ওপর থেকে সব কিছুই দেখা যায়, কুয়াশার মধ্যেও।'

কাছে এসে আবার পিস্তল তুলল ও। টিলার ঢালে বেকায়দা ভঙ্গিতে দাঁড়ানো। 'এর মধ্যে নাক গলানো তোমার উচিত হয়নি, রানা। অকারণেই মারা

যাচ্ছ।'

ধমকে উঠল রানা, 'বোকামি কোরো না, রয়। পাথরগুলো কোথায় আমি জানি!'

দ্বিধা করল রয়। পিস্তল নামাল।

বাঁ হাতে মাটি খামচে ধরে এক হাঁটুতে ভর দিয়ে কোনমতে উঠে বসল রানা। মুঠো ভর্তি মাটি তুলে এনেছে। ছুঁড়ে দিল রয়ের চোখে-মুখে, পরমুহূর্তে পা চালাল ওর হাঁটু লক্ষ্য করে। আপনাআপনি একটা হাত ঝট করে উপরে উঠে গেল রয়ের। কোথায় আছে ভুলে গেছে। লাথি খেয়ে এক পা পিছিয়ে গেল। মাটি খুঁজে পেল না ওর পা। চিত হয়ে উল্টে পড়ে গেল। ডিগবাজি খেতে খেতে নীচে চলে যাচ্ছে। নিষ্ঠুর লোকটার আতঙ্কিত তীক্ষ্ণ চিৎকার বৃষ্টিভেজা বাতাসে ভেসে কানে এসে লাগল রানার।

আঠারো

বাঁ হাত আর দাঁতের সাহায্যে ভাঙা কব্জিতে রুমাল বেঁধে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করল রানা। ঝুলিয়ে রাখলে ব্যথাটা আরও বাড়বে। তাই ভাঙা হাতটা ফ্লাইং জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে দৌড়ে উঠতে শুরু করল পাহাড় বেয়ে।

চারণভূমির বেড়া পার হয়ে এসে দক্ষিণ দিকে এগোচ্ছে, এ সময় কানে এল গুলির শব্দ। পর পর আরও দুটো গুলি। কুয়াশা আর বৃষ্টির মধ্যে কেমন ভোঁতা শোনাল শব্দগুলো।

মাথা নিচু করে ছুটতে শুরু করল রানা, ধূসর একটা পাথরের দেয়ালের কিনার ঘেঁষে। খামারের কাছে না এসে আর মাথা তুলল না।

আরেকটা গুলি হলো, গোলাঘরের দোতলার দরজা থেকে। পাটাতনের উপরের ঘর, যেটাতে সেদিন বসেছিল রানা ও রুথ। জবাবে মূল বাড়ি থেকে আরও দুবার গুলি হলো।

দ্রুত পিছিয়ে এল রানা, যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে। ফার্মহাউসটা চোখের আড়ালে চলে যেতেই ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল। পিছন দিক দিয়ে ঢুকতে চায়।

পিছনের দরজা আর চত্বর চোখে পড়ল। নির্জন। প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয়েছে ডান হাতে। কব্জি থেকে হাত বেয়ে উঠে আসছে তীক্ষ্ণ ব্যথা।

মাথা নিচু করে দৌড় দিয়ে চত্বর পেরোল ও যে-কোন মুহূর্তে গুলি খাওয়ার আশঙ্কা করতে করতে। নিরাপদে পিছনের দরজার কাছে পৌঁছুল। ছুটতে ছুটতেই হাত বাড়িয়ে ঠেলা দিয়ে খুলতে যাচ্ছিল পাল্লাটা, কিন্তু তার আগেই খুলে গেল ওটা।

গতি কমানোর আগেই ভিতরে চলে গেল রানা। আরেকটু হলে ধাক্কা খেত রান্নাঘরের পিছনের দেয়ালে। ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই লেগে গেল পাল্লাটা,

ছিটকানি আটকানোর শব্দ হলো।

ঘুরে দাঁড়াল ও। বাঁ হাতে কপালের ঘাম মুছছে। তেজো ডুয়েরোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল দরজার কাছে।

হলে নিয়ে আসা হলো রানাকে। ভাঙা কব্জি নিয়ে বাধা দেয়ার ক্ষমতা হলো না ওর। কাঁচভাঙা একটা জানালার সামনে ঘাপটি মেরে রয়েছে মিচেল। হাতে রিভলভার। ওর পাশে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে মায়া নিভেন। টেবিলে চিত হয়ে পড়ে আছেন ডট জুনো। মাথায় রক্ত। ওঁর পাশে দাঁড়ানো রুথ ও ডিটা।

শান্ত ভঙ্গিতে রানার দিকে তাকাল মিচেল। 'রয় কোথায়?'

'খাড়া ঢাল থেকে পা পিছলে সৈকতে গিয়ে পড়েছে,' জবাব দিল রানা।

আরেকটা বুলেট এসে জানালার আরও কাঁচ ভেঙে ভিতরে ঢুকল। মাটিতে ঝাঁপ দিল সবাই। হামাগুড়ি দিয়ে রুথের কাছে চলে এল রানা। বাঁ হাতে ভাঙা হাতটা ধরে সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'যা পারেন, ব্যবস্থা করুন এটার। এখানে কী ঘটছে?

গলার সিল্কের রুমাল খুলে নিয়ে কব্জিতে শক্ত করে পেঁচিয়ে বাঁধল রুথ। 'ফার্মে এসে গ্লেন আমাদেরকে বাড়িতে ঢোকার কথা বলে গোলাঘরে চলে গেছে। বলে গেছে, পাটাতনের ওপরের ঘরটা থেকে ওদের রোখার চেষ্টা করবে।'

'তারপর?'

'ওরা এল পিছন দিক দিয়ে।'

'গ্লেনের অনুমানকে ভুল প্রমাণ করে,' রানা বলল। 'ডট জুনো?'

'মিচেলকে কাবু করার চেষ্টা করেছিলেন। পেছন থেকে তেজো ডুয়েরো পিস্তলের বাঁট দিয়ে মেরে ওঁকে বেহুঁশ করে ফেলেছে।'

আরও দুটো গুলি ঢুকল ভাঙা জানালা দিয়ে। একটা মেঝেতে দাগ কেটে পিছলে গেল। চেঁচিয়ে উঠল ডিটা।

রানার দিকে তাকাল মিচেল। দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে রিভলভারে গুলি ভরল। গালে রক্ত।

'এ-সব খেলা অনেক হয়েছে,' বলল ও। 'মিস ম্যাককেইন, এদিকে আসুন।'

দ্বিধা করছে রুথ।

তেজোর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল মিচেল।

রুথকে ধাক্কা দিয়ে মিচেলের দিকে ঠেলে দিল তেজো।

রুথের চুল খামচে ধরল মিচেল। মাথাটা পিছনে টেনে নিয়ে গিয়ে কপালে রিভলভারের নল ঠেসে ধরল। 'মিস্টার রানা, বাইরে গিয়ে গ্লেনকে বলুন, দুই মিনিটের মধ্যে নেমে না এলে তাঁর বান্ধবীর মগজ ছিটাব আমি সারা ঘরে।'

কিছু ভাবারও সুযোগ পেল না রানা, টান দিয়ে ওকে দাঁড় করাল তেজো, দরজা খুলল, ধাক্কা মেরে বের করে দিল বাইরে। ঝট করে বসে পড়ল রানা, এক হাঁটুতে ভর দিয়ে, আর ঠিক এই সময় গুলি এসে লাগল দরজাটার চৌকাঠে। চিৎকার করে উঠল রানা। চিনতে পারলেন গ্লেন। আর গুলি করলেন না। ওর নাম ধরে চেঁচাল রানা। হোঁচট খেতে খেতে ছুটল চত্বর ধরে।

গোলাঘরের দরজা দিয়ে ছুটে ভিতরে ঢুকল ও। মাথার উপর পাটাতনের কিনারে এসে দাঁড়ালেন গ্লেন। গায়ে পুরানো পারকা, হাতে উইনচেস্টার, রানার সচরাচর দেখা সেই মাতাল গ্লেন নন তিনি। পাটাতন থেকে নেমে এগিয়ে আসতে লাগলেন। রানার মনে হলো, এ ধরনের দৃশ্যে জীবনে বহুবার অভিনয় করেছেন তিনি। যখন কথা বললেন, সেটাকেও মনে হলো সিনেমার সংলাপ। 'এ অবস্থা কেন তোমার? কী হয়েছিল?'

রয়ের কথা জানাল রানা। 'তবে রয়কে নিয়ে আর ভাবনা নেই, ও এখন অতীত। গ্লেন, আপনাকে যেতে হবে। মিচেল আমাকে বলে পাঠিয়েছে, দুই মিনিটের মধ্যে যদি না যান, রুথের মাথায় গুলি করবে ও।'

মাথা ঝাঁকালেন গ্লেন। অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটল চোখে, যেন বহুদূরে তাকিয়ে আছেন। 'বেশ, চলো। কিন্তু আমরা চত্বরে বেরোলেই যে গুলি করবে না, তার কী নিশ্চয়তা আছে?'

'স্ক্রিপ্টের পরের দৃশ্য পড়লেই সেটা জানা যাবে।'

'হুঁ।' খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন গ্লেন। তিন-চার কদম এগিয়ে রাইফেলটা মাটিতে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'মিচেল, তুমিই জিতলে।'

রানাও বেরিয়ে এসেছে। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে, যে কোন সময় বুলেটের ঝাঁক ছুটে আসবে ওঁকে লক্ষ্য করে। ভাঙা হাতটা জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে, ভাল হাতটা কোমরে রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। এতটা অসহায় জীবনে বোধ করেনি।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল বাড়ির দরজা। রুথকে ঠেলে নিয়ে চত্বরে বেরোল মিচেল।

ওদের পিছনে বেরোল মায়া ও তেজো। ডিটাকে দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয় দাদার সেবায় ব্যস্ত।

চত্বরের মাঝামাঝি এসে থামল দুটো দল—একদিকে রুথ, মিচেল ও তেজো, অন্যদিকে রানা ও গ্লেন। ভারী একধরনের নীরবতা বিরাজ করছে।

প্রথমে কথা বলল মিচেল, 'পাথরগুলো দিয়ে দিন, মিস্টার রানা।'

দ্বিধা করছে রানা।

'দিয়ে দাও, রানা,' গ্লেন বললেন এমন ভঙ্গিতে যেন তিনিই বস।

কোমর থেকে বেল্টটা খুলে নিয়ে বাড়িয়ে দিল রানা।

এক হাতে ঝুলিয়ে নিল ওটা মিচেল। চেহারা শান্ত। 'পেলাম অবশেষে, কিন্তু বহুদিন অপেক্ষা করতে হলো।' রুথকে ছেড়ে দিল ও।

লাফ দিয়ে গ্লেন ও রানার কাছে সরে এল রুথ। পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল মিচেলের দিকে। 'এখন কী করবেন, মিস্টার মিচেল? ডেভ গোল্ডবার্গের অবস্থা করবেন নাকি আমাদেরকে?'

হাসল মিচেল। 'মাই ডিয়ার মিস ম্যাককেইন, আরও অনেকের মতই আমিও নিজের ঘাড়ে অকারণ দোষ নিয়ে অন্যের দোষের ভাগীদার হতে রাজি নই। বেচারা গোল্ডবার্গকে কে খুন করেছে, আমি জানি না, তবে আমি নই, এটুকু বলতে পারি।'

এ মুহূর্তে মিথ্যে বলার দরকার নেই ওর—ভাবছে রানা। ওর দিকে ফিরে তাকাল রুথ। চোখে শূন্য দৃষ্টি। 'তা হলে কে, মিস্টার রানা? কে হতে পারে?'

'একজনই পারে,' রানা জবাব দিল। 'যে ডেভকে জহরতগুলোর কথা জানিয়েছে।'

শোনার সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে গেল যেন মায়া নিভেন। শক্ত হলো চোয়ালের চামড়া। ঝট করে একটা হাত উঠে গেল হাঁ হয়ে যাওয়া মুখে। এক পা পিছিয়ে গেল। 'না না, আমি খুন করিনি!'

'কিন্তু তুমি ছাড়া এমন নির্বুদ্ধিতা আর কারও পক্ষে সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না,' রানা বলল।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কোন জবাব খুঁজে পেল না মায়া, বাঁচিয়ে দিলেন গ্লেন। শান্ত, ক্লান্ত—ভীষণ ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন তিনি, 'আছে, রানা। আমি। রক সিনাত্রার যে চিঠিটা নিয়ে এসেছে রুথ, আমার ওয়ালেটে ভরে রেখেছিলাম, ফ্রেডেরিকসকোস্ট রেস্টুরেন্টে ওয়ালেটটা পড়ে যাওয়ায় মায়া সেটা দেখে ফেলেছিল। ও জেনে গিয়েছিল, আমি শেষ হয়ে গেছি। হিরনটাকে যেদিন দেখতে গেলে তোমরা, সেদিন শিওর হয়ে গেল মায়া, ডেভ ওকে ফাঁকি দিয়েছে। রাতে আমাকে গোলাঘরে নিয়ে যায় ও। আমি ভেবেছিলাম, খড়ের গাদায় সামান্য ফুর্তি করার জন্যে নিয়ে গেছে বুঝি, কিন্তু আসলে তা নয়। নিয়ে গিয়ে আমাকে ওইসব জহরতের গল্প শুনিয়েছে ও, বলেছে, ডেভের কাছ থেকে ওগুলো আমি কেড়ে নিতে পারলে আধা-আধি বখরা হতে পারে।'

'কেড়ে না নিয়ে কেন খুন করলেন ওকে?' গ্লেনের দিকে তাকিয়ে থেকে তাঁর উদ্দেশ্যটা বোঝার চেষ্টা করছে রানা।

'করতে চাইনি। ওর শটগানটা ওর দিকে তাক করে রত্নগুলো দিতে বলেছিলাম। কিন্তু না দিয়ে বোকার মত আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ট্রিগারে চাপ পড়ে যাওয়ায় গুলি বেরিয়ে গেল।'

মিচেলের চেহারাতে অবিশ্বাস।

মাথা নেড়ে মায়া বলল, 'কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

শ্রাগ করলেন গ্লেন। 'কেন হচ্ছে না? তোমাকে নিয়ে আমি তখন বিছানায় ছিলাম, আর সেই সময়ই ঘটনাটা ঘটেছে বলে?'

'তাই তো,' রানা বলল। 'কখন করলেন কাজটা?'

মায়ার দিকে ফিরলেন গ্লেন। 'সরি, এইঞ্জেল, একটা সময় তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। চুপচাপ বেরিয়ে গিয়েছিলাম আমি, ঘণ্টাখানেকের জন্যে। ফিরে এসে দেখি, জাগোনি, মরার মত ঘুমোচ্ছ।'

কথাটা শুনল বটে, কিন্তু চেহারা দেখে রানার মনে হলো, গ্লেনের কথা সে বিশ্বাস করছে না। রানার নিজেরও বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু মহানায়কের মতলবটা বোঝার জন্য তাল দিয়ে গেল।

'ইশ্‌শ্, কেন করলেন এই কাজ, গ্লেন?' বলল রানা। 'এখন বাঁচবেন কীভাবে? কী করে বাঁচাবেন নিজেকে?'

'সত্যিই, সব তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি।' মাথা নাড়তে লাগলেন গ্লেন।

অত বেশি মদ খেলে যা হয় আরকী! 'এভাবে যে সব শেষ হবে, কোনদিন কল্পনাও করিনি। শুরুতে, দারুণ মনে হয়েছিল আইডিয়াটা। মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। কিছুই আর অবশিষ্ট নেই আমার, রানা। রক সিনাত্রার ওই চিঠিটা ছিল আমার মৃত্যু পরোয়ানা। বকেয়া কর আদায়ের জন্যে ক্যালিফোর্নিয়ায় আমার বাড়ি নিলাম করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আমার ছবির চুক্তি বাতিল। আমি একেবারে শেষ হয়ে গেছি। এর মানে কী বুঝতে পারছ না? আর কোনদিন কোনও ছবির অফার পাব না আমি। কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারব না কোনদিন।'

গ্লেনের ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, এমনভাবে বলে যাচ্ছেন, যেন ঘটনাগুলো বাস্তব নয়, ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে স্ক্রিপ্টের মুখস্থ করা সংলাপ বলছেন। যে-কোন মুহূর্তে 'কাট' বলে চেঁচিয়ে উঠবেন পরিচালক। আবার অভিনয়ের জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরবেন তিনি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ারে বিশ্রাম নিতে বসবেন। লাশ হয়ে যাওয়া রক্তাক্ত সাজগোজ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে হাসিমুখে এসে দাঁড়াবে ডেভ। হেসে হেসে কথা বলবে ওঁর সঙ্গে।

বোবা দৃষ্টিতে গ্লেনের দিকে তাকিয়ে আছে রুথ। যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে।

দেখেও যেন দেখলেন না গ্লেন। মিচেলকে বললেন, 'মনে হচ্ছে, তোমার সঙ্গে আমার একটা বিষয়ে মিল হয়ে গেছে। এক সারিতে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। এখান থেকে কী করে পালাবে, ভেবেছ কিছু? তেজো ডুয়েরোর জাহাজে করে?'

মাথা নাড়ল মিচেল। 'অকারণ সময় নষ্ট করছেন আপনি। ওই জাহাজে আর কারও জায়গা হবে না।'

'বোকার স্বর্গে বাস করছ তুমি। রানা, বোকাটাকে বুঝিয়ে বলো।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'উনি ঠিকই বলেছেন, মিচেল। জাহাজে জায়গা থাকলেও লাভ নেই। উনি কেন, জলপথে কেউই পালাতে পারবেন না আপনারা। উপকূলে টহল দেয়া ডেনিশ করভেট তাড়া করে সহজেই ধরে ফেলবে আপনাদের।'

গ্লেনের দিকে ফিরল মিচেল। ভ্রূকুটিতে কুঁচকে গেছে কপাল। 'কিছু একটা ভাবছেন আপনি, নইলে কথাটা তুলতেন না।'

সিগারেট ধরালেন গ্লেন। 'ফিয়র্ডে অটার প্লেনটা আছে এখনও।'

এই প্রথমবারের মত মিচেলের কঠিন হয়ে থাকা ভঙ্গিতে চিড় ধরল। আঁকড়ে ধরল সম্ভাবনাটা। উত্তেজনা ফুটল চেহারায়।

'আপনি প্লেন চালাতে পারেন?'

'ওই খোকাটার মত পারি না,' রানাকে দেখালেন তিনি। 'তবে বেশি দূরে যেতে না হলে, পারব। ধরা যাক, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড পর্যন্ত।'

'নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে নিয়ে যেতে পারবেন?'

'সহজেই। আমি জানি, ট্যাংকে প্রচুর তেল ভরে নিয়েছে রানা। তা ছাড়া পথে অসংখ্য ফিশিং ভিলেজ পড়বে, প্রয়োজন হলে যেখানে নেমে তেল ভরে নিতে পারব। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে মেইন-এ চলে যাব আমরা। পকেটে টাকা থাকলে আমেরিকায় লুকিয়ে থাকার জায়গার অভাব হবে না আমার। সেই টাকাটা কোত্থেকে আসবে? ওই পাথরগুলো থেকে। ধরা যাক, আধা-আধি বখরায় রাজি

হয়ে গেলাম আমরা।'

মিচেলের মনে কী ভাবনা চলছে, দিনের আলোর মত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে যেন রানা। একবার জায়গামত যেতে পারলে গ্লেনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া ওর জন্য একটুও কঠিন হবে না, জানা কথা। তাই আর তর্কাতর্কির মধ্যে না গিয়ে বলল, 'রাজি। আর কিছু?'

'ব্যাংকের অ্যাকাউন্টটা চেক করা দরকার।' সামনের দিকে হাত বাড়ালেন গ্লেন। 'দেখি, বেল্টটা বের করে দিন আমার হাতে।'

দ্বিধা করল মিচেল। হয়তো ভাবল, সঙ্গেই তো যাচ্ছে, উল্টোপাল্টা কিছু করতে পারবে না গ্লেন, তাই বেল্টটা ছুঁড়ে দিল গ্লেনের দিকে। একটা পকেট খুলে দেখেই বন্ধ করে দিলেন তিনি।

ভাঁজ করে বেল্টটা পারকার পকেটে ঢোকালেন গ্লেন। 'আরেকটা কথা, কোন গোলমাল চাই না।' তেজোকে দেখিয়ে বললেন, 'ওই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনটাকে সুযোগ দিলে আমার বন্ধুদের কেটে টুকরো টুকরো করবে, সেটা পছন্দ হবে না আমার। ওকে গিয়ে ল্যাণ্ড-রোভারটা নিয়ে আসতে বলুন।'

'বলছি, মিস্টার রিভোল্টার।' তেজোর দিকে ফিরল মিচেল। 'যাও।'

আচমকা ঝটকা দিয়ে ঘুরে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল রুথ। দৌড়ে গিয়ে দরজার কাছে ওকে ধরলেন গ্লেন। ধস্তাধস্তি শুরু করল রুথ। শক্ত করে ধরে রাখলেন গ্লেন। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে দেয়ালে হেলান দিল রুথ, যেন নেতিয়ে পড়ল। এদিকে পিছন ফিরে আছেন গ্লেন। তাঁর বিশাল দেহের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে রুথ। তিনি কী বলছেন ওকে, এখান থেকে বুঝতে পারল না রানা। তেজো ডুয়েরো ল্যাণ্ড-রোভারটা নিয়ে এলে ঘুরে দাঁড়ালেন গ্লেন। ফিরে এলেন রানাদের কাছে। অঝোরে কাঁদছে রুথ। দুই গাল বেয়ে পানি পড়ছে।

গ্লেনের পথরোধ করল রানা। 'আপনি ভুল করছেন, গ্লেন।' মিচেলকে দেখিয়ে বলল, 'কোনও অলৌকিক কারণে এই কেউটে সাপটা যদি সুযোগমত একটা বুলেট আপনার কপালে না-ও ঢোকায়, কোথায় পালাবেন আপনি? কোথায় লুকাবেন আপনার পৃথিবী বিখ্যাত গ্লেন রিভোল্টারের চেহারাটা? যে দেখবে সে-ই চিনে ফেলবে।'

হেসে উঠলেন গ্লেন। 'এটা অবশ্য ভুল বলোনি, আদর্শবাদী খোকা। তবে লুকানোর জায়গা কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই আছে। সেটা নিয়ে পরে ভাবব।'

ল্যাণ্ড-রোভারে উঠল মিচেল। নিচুস্বরে ওকে কিছু বলল মায়া। রাগত ভঙ্গিতে এক ধাক্কায় ওকে সরিয়ে দিল মিচেল। 'নিজের কবর নিজেই খুঁড়েছ, এখন সেখানে গিয়ে শুয়ে থাকো।'

গ্লেনের দিকে ফিরল মায়া। মরিয়া হয়ে উঠেছে চেহারা। কাতরস্বরে বলল, 'ফর গডস সেক, গ্লেন, তুমি অন্তত আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো না। ও আমাকে নিতে চাইছে না।'

আবার হাসলেন গ্লেন। 'তোমার সাহস আছে, এইঞ্জেল, স্বীকার না করে পারছি না। যাও, ওঠো। সবাই আমরা এখন একই পথের পথিক।'

রানার দিকে ফিরে বিষণ্ন হাসি হাসলেন তিনি। 'কীভাবে যে কী ঘটে যায়, বড়ই অবাক লাগে! তাই না? গোড়া থেকে আবার যদি জীবনটাকে শুরু করতে দেয়া হতো, কত রকম সংশোধন করতে তুমি ভাবতে পারো?'

'অনেক ভুলই করতাম না।'

'আমিও করতাম না,' মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'জীবনে অনেক-অনেক ভুল করেছি। তবে সবচেয়ে বড় ভুল বোধহয় সান্তা বারবারার পিয়ারে নিকিটা ব্রায়ানের সঙ্গে দেখা হওয়াটা। আর হলোই যদি, পালালাম না কেন? দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দেয়া উচিত ছিল আমার।'

রানার মনে হলো, এ-সব দার্শনিক কথাবার্তা অনন্তকাল চালিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু হাতে সময় নেই গ্লেনের। তেজো ডুয়েরোর পাশে প্যাসেঞ্জার সিটে গিয়ে বসলেন। রানার দিকে ফিরে তাকালেন শেষবারের মত। একটা সেকেণ্ডের জন্য রানার মনে হলো, কী যেন বলতে চান তিনি—নীরব কোনও মেসেজ, তারপর হাসলেন, তাঁর সেই বিখ্যাত ভুবন-ভোলানো হাসি। রানার মনের গভীরে কোথায় কী যেন নাড়িয়ে দিল হাসিটা, কেমন যেন লেগে উঠল ওর। তবে এটুকু বুঝল, দীর্ঘকাল ধরে এই হাসি দিয়ে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মনে এমনি আলোড়ন তুলেছেন অসাধারণ প্রতিভাবান ওই অভিনেতা। শুধু শুধু তো আর এত জনপ্রিয় হননি।

তারপর হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি—গর্জন তুলে বৃষ্টির ভিতর চলতে চলতে পথের বাঁকে হারিয়ে গেল ল্যাণ্ড-রোভারটা। ফিরে তাকাল রানা। দরজার কাছে দেয়ালে হেলান দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে বৃষ্টির মতই মুষলধারে কেঁদে চলেছে রুথ।

কাছে এসে আস্তে করে ওর এক হাত ধরে টেনে তুলল রানা। ভেড়ার চামড়ার কোটের উপরের দিকের কয়েকটা বোতাম খোলা। ও উঠে দাঁড়াতেই মানি বেল্টটা মাটিতে পড়ল কোটের ভিতর থেকে।

বোকার মত হাঁ করে সেটার দিকে তাকিয়ে রইল রানা। তারপর ঝুঁকে বাঁ হাতে তুলে নিল। সোজা হয়ে বলল, 'এটা কী?' নিজের কানেই কর্কশ শোনাল কণ্ঠটা।

'হীরা-জহরত,' রুথ বলল। 'বুঝতে পারছেন না? আমাকে বিদায় জানানোর সময় কোটের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে ও।'

ভাঙা হাতের অতিরিক্ত যন্ত্রণা আর রক্তক্ষরণের কারণেই বোধহয় মাথাটা ঠিকমত কাজ করছে না রানার। তাই কিছু বুঝতে পারছে না। মাথা ঝাড়া দিয়ে মগজটা সাফ করার চেষ্টা করল যেন। তারপর বলল, 'কিন্তু কেন এ কাজ করলেন তিনি? কী করতে চলেছেন?'

তারপর হঠাৎ করেই প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে বুঝে ফেলল ও ব্যাপারটা, যেন বাজ পড়ল মাথায়। ল্যাণ্ড-রোভারে বসে শেষ যে মেসেজটা দিতে চেয়েছিলেন তিনি, সেটার মানে বুঝতে পারল এখন।

রানার চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেল রুথ। আতঙ্ক দেখা দিল ওর চোখেও। সে-ও বুঝতে পেরেছে সব। গত কিছুক্ষণ ধরে যে কাণ্ডটা করেছেন

গ্লেন, সেটাই ব্যাখ্যা এর।

বিমূঢ়ের মত মাথা নাড়তে লাগল রুথ। ফ্লাইং জ্যাকেটের ভিতর বেল্টটা ভরে রেখে জিজ্ঞেস করল রানা, 'জীপটা কোথায়?'

'গোলাঘরের পিছনে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দিল রানা। বৃষ্টির মধ্যে পিছন থেকে রুথের ডাক কানে এল, 'যাবেন না, রানা, আমাকে ফেলে যাবেন না! দোহাই আপনার!' ওর কণ্ঠে আতঙ্ক।

জীপটা দেখতে পেল রানা। থমকে দাঁড়াল। নীচে প্রচুর তেল পড়ে আছে। ট্যাংকে গুলির ফুটো। রুথের চিৎকারকে অগ্রাহ্য করে ছুটতে শুরু করল ও। দেয়াল পেরিয়ে এসে নামতে শুরু করল চারণভূমি ধরে।

এমনিতেই অনেক দেরি করে ফেলেছে। এখনও যদি কোনমতে যাওয়া যায় ওঁর কাছে, সে-চেষ্টা করল ও। পাহাড়ের ঢাল, আলগা পাথর, ভেজা রাস্তা, কোন কিছুই বাধা দিয়ে ঠেকাতে পারল না ওকে। ভাঙা হাতের যন্ত্রণাও যেন ভুলে গেছে। একটাই লক্ষ্য, গ্লেনের কাছে পৌঁছতে হবে, যে-কোনভাবেই হোক। গিয়ে ঠিক কী করবে জানে না।

কিন্তু ঢালে জন্মানো উইলো গাছের জটলা পেরোনোর সময়ই বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে ইঞ্জিনের গর্জন কানে এল ওর। গোটা দুই কাশি দিয়ে চালু হয়ে গেছে অটারের ইঞ্জিন। অন্য হাতে পড়ে যেন রাগে গরগর করছে।

গ্র্যানেটের টিলাটার গোড়ায় যখন পৌঁছল, ফিয়র্ডের পানিতে ছুটতে শুরু করেছে প্লেন। ভারী হচ্ছে ইঞ্জিনের শব্দ। যে-কোন মুহূর্তে উড়বে এখন অটার। গাছের ফাঁকে হুড়মুড় শব্দ শুনে ফিরে তাকাল রানা। ঝোপঝাড় মাড়িয়ে রুথকে ছুটে আসতে দেখল ও।

হঠাৎ করেই আইস-ক্যাপের দিক থেকে ধেয়ে এল ঝোড়ো হাওয়া, বৃষ্টিকে মস্ত একটা চাদরের মত কাত করে দিল একপাশে, আর এ-সময় শেষবারের মত অটারটাকে দেখতে পেল রানা। সকালের আকাশে, পাঁচশো ফুট উপরে।

তারপর ঘুরে গেল ওটা। ঘুরবেই, জানে রানা। তারপর উড়ে যাবে ফিয়র্ড পার হয়ে ওই দেয়ালটার দিকে, হাজার ফুট উঁচু পাথরের দেয়ালে গুঁতো খেয়ে বোমার মত বিস্ফোরিত হবে।

শেষ পাঁচটা মিনিটে কেবিনের ভিতর কী ঘটবে, কোনদিন জানতে পারবে না কেউ। মিচেল হয়তো রিভলভারের সমস্ত গুলি গ্লেনের উপর খরচ করে ফেলবে। কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারবে না ও। প্লেনটা গুঁতো খাবেই। যে গৌরবের মধ্যে বেঁচে ছিলেন গ্লেন এতকাল, জীবনটাকে শেষও করে দিতে চান যেন সেই গৌরবের মধ্য দিয়েই।

পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে পড়ল বিস্ফোরণের শব্দ। আগুনের একটা গোলা যেন একটা মুহূর্ত আটকে রইল পর্বতের দেয়ালে, তারপর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ছিটিয়ে পড়তে থাকল চারদিকে। তারপর হঠাৎ করে যেমন এসেছিল, তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেল ঝোড়ো হাওয়া, নেমে এল আবার বৃষ্টির চাদর, চোখের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল ফিয়র্ডের পাথরের দেয়াল। ভয়ঙ্কর

মর্মান্তিক দৃশ্যটা আর চোখে দেখতে হলো না বলে মনে মনে বৃষ্টিকে ধন্যবাদ দিল রানা।

মাটিতে বসে পড়ে গ্লেনের জন্য বিলাপ করে কাঁদতে ইচ্ছে করল রানার। কিন্তু এ মুহূর্তে ওসব ছেলেমানুষী করার উপায় নেই। রুথ দাঁড়িয়ে আছে সামনে। সেই একইভাবে অঝোরে বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশে চোখের পানি ঝরে পড়ছে গাল বেয়ে। আস্তে করে ওর কাঁধে ভাল হাতটা রেখে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল রানা।

'কেন এমন করল ও, রানা? কেন?' ডুকরে কেঁদে উঠল রুথ।

এ ছাড়া আর কী করার ছিল—তিনি ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, ক্যারিয়ার শেষ, পৃথিবীর কোনখানেই আর আত্মমর্যাদা নিয়ে লুকিয়ে থাকার উপায় ছিল না ওঁর, বেঁচে থাকলে শেষ জীবনটা ভীষণ অর্থনৈতিক কষ্টে কাটাতে হতো, তা তিনি পারতেন না বুঝেই গৌরবময় জীবনটা গৌরবের সঙ্গেই শেষ করে দিলেন—এই সত্যি কথাগুলো বলতে গিয়েও বলতে পারল না। বলল, 'আমাদের বাঁচাতে, রুথ। মিচেলকে লিফট দিতে চেয়েছেন আমাদের রক্ষা করার জন্যে, আর কোন কারণ নেই। তিনি জানতেন, মিচেল ওঁকে ছাড়বে না; নিরাপদ জায়গায় যাবার পর ওঁর মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে দেবে। হীরা-জহরতের ভাগ দেয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।'

'আর ডেভ? ডেভের ব্যাপারটা কী?'

'গ্লেন আমাদেরকে মিথ্যে বলেছেন। মিচেল আর রয় মিলেই খুন করেছে ডেভকে। গ্লেনের পক্ষে মায়ার চোখ ফাঁকি দিয়ে ওকে খুন করা সম্ভব ছিল না। আমার মুখ থেকে পেয়েছেন উনি খুনের খবর। আমি তো ভেবেছিলাম, আপনি মিথ্যেটা ধরতে পেরেছেন।'

রানার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রুথ। হাত তুলে চাপা দিল হাঁ হয়ে যাওয়া মুখ। ওর কাঁধে আলতো চাপড় দিয়ে রানা বলল, 'এখন লক্ষ্মী মেয়ের মত ফার্মহাউসে ফিরে যান তো। আমি আসছি।'

দ্বিধা করছে রুথ। কাঁধ ধরে টান দিয়ে ওকে ঘুরিয়ে দিল রানা।

হাঁটতে শুরু করল রুথ। ধীরে ধীরে গাছের জটলার ভিতর দিয়ে ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে। কয়েক গজ গিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখল একবার রানাকে। 'আসবেন তো সত্যি?'

'আসব।'

রুথ অদৃশ্য হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। তারপর টিলাটা পেরিয়ে এসে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল শৈলশিরা ধরে। কালো পাথরে তৈরি ঘোড়ার খুরের আকৃতির বেদিটার কাছে এসে থামল। ফ্লাইং জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করল মানি বেল্টটা। ছোট একটা গর্তে ঢেলে দিল সমস্ত হীরা-চুনি-পান্না। তারপর গর্তের মুখে চ্যাপ্টা একটা পাথর চাপা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কাজগুলো সারতে প্রচুর পরিশ্রম আর কষ্ট করতে হলো ওর, কারণ একহাতে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে অন্য হাতে সব করতে হয়েছে।

তারপর, মানি বেল্টের পকেটগুলো সাধারণ পাথর দিয়ে ভরতে লাগল।

রত্নগুলো রুথের প্রাপ্য, মৃত্যুর আগে গ্রেন এগুলো ওঁকেই দান করে গেছেন। সার্জেন্ট নিরেনসেনের তদন্ত শেষ হয়ে যাবার পর এগুলো রুথকে দিয়ে দেবে রানা। বিক্রি করে প্রচুর টাকা পাবে রুথ। হয়তো সেই টাকা দিয়ে ছবি বানানোর কাজে হাত দেবে ও। গ্রেনের অসমাপ্ত শেষ কাজটা সমাপ্ত হবে। হয়তো তাতে শান্তি পাবে গ্রেনের আত্মা।

সত্যি পাবে তো?

আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল রানা।

***

বুশ পাইলট

গ্রীনল্যান্ডের ফ্রেডেরিকসবার্গে গত তিনটে বছর ধরে বুশ পাইলটের কাজ করছে রানা। বছরে দু'মাস। হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হলো দুজন বীমা কোম্পানির লোক। সঙ্গে অপূর্ব সুন্দরী এক মহিলা, মিসেস মায়া নিভেন। আইস-ক্যাপের বরফে ঢাকা দুর্গম এক লেকে পৌঁছে দেয়ার অনুরোধ করল ওরা রানাকে। একটা প্লেনের ধ্বংসাবশেষের কাছে কবরে শুয়ে আছে মায়ার স্বামী। নিজের চোখে লাশ দেখে শনাক্ত করার জন্য মহিলা মরিয়া। কিন্তু জানেনা, যে-মৃত পাইলটের স্ত্রীর পরিচয়ে এখানে এসেছে সে, সে-ব্যক্তি স্বয়ং মাসুদ রানা। ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাজে একটা জটিল ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ল রানা নিয়তির অমোঘ টানে।